সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

প্রকাশ ১৩১৪
পুনর্মুদ্রণ ১৩২৭, ১৩৪১
সংস্করণ ১৩৪৮ মাঘ
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫২ জ্যৈষ্ঠ
তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬১ শ্রাবণ
পুনর্মুদ্রণ ১৮৭৯ পৌষ : ১৯৫৮ জানুয়ারি

সংযোজনের শেষ তিনটি প্রবন্ধ ব্যতীত
অন্যগুলি এই সংস্করণে নূতন
যোগ করা হইল

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭
মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস। ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাতা ৬
৩'১

সাহিত্যের তাৎপর্য

বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর-একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রঙ আকৃতি ধ্বনি প্রভৃতি আছে তাহা নহে; তাহার সঙ্গে আমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা, আমাদের ভয়-বিস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত— তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানা ভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষ-রূপে আপনার করিয়া লই।

যেমন জঠরে জারক রস অনেকের পর্যাপ্তপরিমাণে না থাকাতে বাহিরের খাদ্যকে তাহারা ভালো করিয়া আপনার শরীরের জিনিস করিয়া লইতে পারে না তেমনি হৃদয়বৃত্তির জারক রস যাহারা পর্যাপ্তরূপে জগতে প্রয়োগ করিতে পারে না তাহারা বাহিরের জগৎটাকে অন্তরের জগৎ, আপনার জগৎ, মানুষের জগৎ করিয়া লইতে পারে না।

এক-একটি জড়প্রকৃতি লোক আছে জগতের খুব অল্প বিষয়েই যাহাদের হৃদয়ের ঔৎসুক্য, তাহারা জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াও অধিকাংশ জগৎ হইতে বঞ্চিত। তাহাদের হৃদয়ের গবাক্ষগুলি সংখ্যায় অল্প এবং বিস্তৃতিতে সংকীর্ণ বলিয়া বিশ্বের মাঝখানে তাহারা প্রবাসী হইয়া আছে।

এমন সৌভাগ্যবান লোকও আছেন যাঁহাদের বিস্ময় প্রেম এবং কল্পনা সর্বত্র সজাগ, প্রকৃতির কক্ষে কক্ষে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ, লোকালয়ের নানা আন্দোলন তাঁহাদের চিত্তবীণাকে নানা রাগিণীতে স্পন্দিত করিয়া রাখে।

বাহিরের বিশ্ব ইঁহাদের মনের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির নানা রসে, নানা রঙে, নানা ছাঁচে, নানা রকম করিয়া তৈরি হইয়া উঠিতেছে।

ভাবুকের মনের এই জগৎটি বাহিরের জগতের চেয়ে মানুষের বেশি আপনার। তাহা হৃদয়ের সাহায্যে মানুষের হৃদয়ের পক্ষে বেশি সুগম হইয়া উঠে। তাহা আমাদের চিত্তের প্রভাবে যে বিশেষত্ব লাভ করে তাহাই মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপাদেয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, বাহিরের জগতের সঙ্গে মানবের জগতের প্রভেদ আছে। কোন্‌টা সাদা, কোন্‌টা কালো, কোন্‌টা বড়ো, কোন্‌টা ছোটো, মানবের জগৎ সেই খবরটুকুমাত্র দেয় না। কোন্‌টা প্রিয়, কোন্‌টা অপ্রিয়, কোন্‌টা সুন্দর, কোন্‌টা অসুন্দর, কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ, মানুষের জগৎ সেই কথাটা নানা সুরে বলে।

এই-যে মানুষের জগৎ ইহা আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে বহিয়া আসিতেছে। এই প্রবাহ পুরাতন এবং নিত্যনূতন। নব নব ইন্দ্রিয় নব নব হৃদয়ের ভিতর দিয়া এই সনাতন স্রোত চিরদিনই নবীভূত হইয়া চলিয়াছে।

কিন্তু ইহাকে পাওয়া যায় কেমন করিয়া? ইহাকে ধরিয়া রাখা যায় কী উপায়ে? এই অপরূপ মানস-জগৎকে রূপ দিয়া পুনর্বার বাহিরে প্রকাশ করিতে না পারিলে ইহা চিরদিনই সৃষ্ট এবং চিরদিনই নষ্ট হইতে থাকে।

কিন্তু এ জিনিস নষ্ট হইতে চায় না। হৃদয়ের জগৎ আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল। তাই চিরকালই মানুষের মধ্যে সাহিত্যের আবেগ।

সাহিত্যের বিচার করিবার সময় দুইটা জিনিস দেখিতে হয়। প্রথম, বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি; দ্বিতীয়, তাহা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হইয়াছে কতটা।

সকল সময় এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না। যেখানে থাকে সেখানেই সোনায় সোহাগা।

কবির কল্পনাসচেতন হৃদয় যতই বিশ্বব্যাপী হয় ততই তাঁহার রচনায় গভীরতায় আমাদের পরিতৃপ্তি বাড়ে। ততই মানববিশ্বের সীমা বিস্তারিত হইয়া আমাদের চিরন্তন বিহারক্ষেত্র বিপুলতা লাভ করে।

কিন্তু রচনাশক্তির নৈপুণ্যও সাহিত্যে মহামূল্য। কারণ, যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে শক্তি প্রকাশিত হয় তাহা অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ হইলেও এই শক্তিটি একেবারে নষ্ট হয় না। ইহা ভাষার মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে, সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহাতে মানবের প্রকাশক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। এই ক্ষমতাটি লাভের জন্য মানুষ চিরদিন ব্যাকুল। যে কৃতিগণের সাহায্যে মানুষের এই ক্ষমতা পরিপুষ্ট হইতে থাকে মানুষ তাঁহাদিগকে যশস্বী করিয়া ঋণশোধের চেষ্টা করে।

যে মানসজগৎ হৃদয়ভাবের উপকরণে অন্তরের মধ্যে সৃষ্ট হইয়া উঠিতেছে তাহাকে বাহিরে প্রকাশ করিবার উপায় কী ?

তাহাকে এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হইবে যাহাতে হৃদয়ের ভাব উদ্রিক্ত হয়।

হৃদয়ের ভাব উদ্রেক করিতে সাজ সরঞ্জাম অনেক লাগে।

পুরুষ-মানুষের আপিসের কাপড় সাদাসিধা ; তাহা যতই বাহুল্য-বর্জিত হয় ততই কাজের উপযোগী হয়। মেয়েদের বেশভূষা, লজ্জাশরম, ভাবভঙ্গি সমস্ত সভ্যসমাজেই প্রচলিত।

মেয়েদের কাজ হৃদয়ের কাজ। তাহাদিগকে হৃদয় দিতে হয় ও হৃদয় আকর্ষণ করিতে হয় ; এইজন্য তাহাদিগকে নিতান্ত সোজাসুজি, সাদাসিধা, ছাঁটাছোঁটা হইলে চলে না। পুরুষদের যথাযথ হওয়া আবশ্যক, কিন্তু মেয়েদের সুন্দর হওয়া চাই। পুরুষের ব্যবহার মোটের উপর সুস্পষ্ট হইলেই ভালো, কিন্তু মেয়েদের ব্যবহারে অনেক আবরণ আভাস-ইঙ্গিত থাকা চাই।

সাহিত্যও আপন চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য অলংকারের, রূপকের,

ছন্দের, আভাসের, ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করে। দর্শন-বিজ্ঞানের মতো নিরলংকার হইলে তাহার চলে না।

অপরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়-তাকে রক্ষা করিতে হয়। নারীর যেমন শ্রী এবং হ্রী সাহিত্যের অনির্বচনীয়তাটিও সেইরূপ। তাহা অনুকরণের অতীত। তাহা অলংকারকে অতিক্রম করিয়া উঠে, তাহা অলংকারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না।

ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিস মিশাইয়া থাকে, চিত্র এবং সংগীত।

কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়। সাহিত্যে এই ছবি আঁকার সীমা নাই। উপমা-তুলনা-রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়। 'দেখিবারে আঁখি-পাখি ধায়' এই এক কথায় বলরামদাস কী না বলিয়াছেন ? ব্যাকুল দৃষ্টির ব্যাকুলতা কেবলমাত্র বর্ণনায় কেমন করিয়া ব্যক্ত হইবে ? দৃষ্টি পাখির মতো উড়িয়া ছুটিয়াছে, এই ছবিটুকুতে প্রকাশ করিবার বহুতর ব্যাকুলতা মুহূর্তে শান্তিলাভ করিয়াছে।

এ ছাড়া ছন্দে শব্দে বাক্যবিন্যাসে সাহিত্যকে সংগীতের আশ্রয় তো গ্রহণ করিতেই হয়। যাহা কোনোমতে বলিবার জো নাই এই সংগীত দিয়াই তাহা বলা চলে। অর্থবিশ্লেষ করিয়া দেখিলে যে কথাটা যৎসামান্য এই সংগীতের দ্বারাই তাহা অসামান্য হইয়া উঠে। কথার মধ্যে বেদনা এই সংগীতই সঞ্চার করিয়া দেয়।

অতএব চিত্র এবং সংগীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতিদান করে। চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ।

কিন্তু কেবল মানুষের হৃদয়ই যে সাহিত্যে ধরিয়া রাখিবার জিনিস তাহা নহে। মানুষের চরিত্রও এমন একটি সৃষ্টি যাহা জড়সৃষ্টির ন্যায়

আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আয়ত্তগম্য নহে। তাহাকে দাঁড়াইতে বলিলে দাঁড়ায় না। তাহা মানুষের পক্ষে পরম ঔৎসুক্যজনক, কিন্তু তাহাকে পশুশালার পশুর মতো বাঁধিয়া খাঁচার মধ্যে পুরিয়া ঠাহর করিয়া দেখিবার সহজ উপায় নাই।

এই ধরাবাঁধার অতীত বিচিত্র মানবচরিত্র, সাহিত্য ইহাকেও অন্তরলোক হইতে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কারণ, মানবচরিত্র স্থির নহে, সুসংগত নহে; তাহার অনেক অংশ, অনেক স্তর; তাহার সদর-অন্দরে অবারিত গতিবিধি সহজ নয়। তা ছাড়া তাহার লীলা এত সূক্ষ্ম, এত অভাবনীয়, এত আকস্মিক যে, তাহাকে পূর্ণ আকারে আমাদের হৃদয়গম্য করা অসাধারণ ক্ষমতার কাজ। ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাসগণ এই কাজ করিয়া আসিয়াছেন।

এইবার আমাদের সমস্ত আলোচ্য বিষয়কে এক কথায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয়, সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় এবং মানবচরিত্র।

কিন্তু, মানবচরিত্র এটুকুও যেন বাহুল্য বলা হইল। বস্তুত বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষারচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।

ভগবানের আনন্দ প্রকৃতির মধ্যে, মানবচরিত্রের মধ্যে, আপনাকে আপনি সৃষ্টি করিতেছে। মানুষের হৃদয়ও সাহিত্যে আপনাকে সৃজন করিবার, ব্যক্ত করিবার, চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টার অন্ত নাই, ইহা বিচিত্র। কবিগণ মানবহৃদয়ের এই চিরন্তন চেষ্টার উপলক্ষমাত্র।

ভগবানের আনন্দসৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত; মানবহৃদয়ের আনন্দসৃষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি। এই জগৎসৃষ্টির আনন্দগীতের ঝংকার আমাদের হৃদয়বীণাতন্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে; সেই-যে মানসসংগীত, ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে

সেই-যে সৃষ্টির আবেগ,সাহিত্য তাহারই বিকাশ। বিশ্বের নিশ্বাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কী রাগিণী বাজাইতেছে সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে, তাহা দৈববাণী। বহিঃসৃষ্টি যেমন তাহার ভালোমন্দ তাহার অসম্পূর্ণতা লইয়া চিরদিন ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে, এই বাণীও তেমনি দেশে দেশে, ভাষায় ভাষায়, আমাদের অন্তর হইতে বাহির হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে।

অগ্রহায়ণ ১৩১০

সাহিত্যের সামগ্রী

একেবারে খাঁটিভাবে নিজের আনন্দের জন্যই লেখা সাহিত্য নহে। অনেকে কবিত্ব করিয়া বলেন যে, পাখি যেমন নিজের উল্লাসেই গান করে, লেখকের রচনার উচ্ছ্বাসও সেইরূপ আত্মগত, পাঠকেরা যেন তাহা আড়ি পাতিয়া শুনিয়া থাকেন।

পাখির গানের মধ্যে পক্ষিসমাজের প্রতি যে কোনো লক্ষ নাই, এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। না থাকে তো না'ই রহিল, তাহা লইয়া তর্ক করা বৃথা, কিন্তু লেখকের প্রধান লক্ষ্য পাঠকসমাজ।

তা বলিয়াই যে সেটাকে কৃত্রিম বলিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। মাতার স্তন্য একমাত্র সন্তানের জন্য, তাই বলিয়াই তাহাকে স্বতঃস্ফূর্ত বলিবার কোনো বাধা দেখি না।

নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস, সাহিত্যে এই দুটো বাজে কথা কোনো কোনো মহলে চলিত আছে। যে কাঠ জ্বলে নাই তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশেরই মতো নীরব হইয়া থাকে তাহাকেও কবি বলা সেইরূপ। প্রকাশই কবিত্ব, মনের তলার মধ্যে কী আছে বা না আছে তাহা আলোচনা করিয়া বাহিরের লোকের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কথায় বলে 'মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ'; ভাণ্ডারে কী জমা আছে তাহা আন্দাজে হিসাব করিয়া বাহিরের লোকের কোনো সুখ নাই, তাহাদের পক্ষে মিষ্টান্নটা হাতে হাতে পাওয়া আবশ্যক।

সাহিত্যে আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসও সেই রকমের একটা কথা। রচনা রচয়িতার নিজের জন্য নহে ইহাই ধরিয়া লইতে হইবে, এবং সেইটে ধরিয়া লইয়াই বিচার করিতে হইবে।

আমাদের মনের ভাবের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই এই, সে নানা

মনের মধ্যে নিজেকে অনুভূত করিতে চায়। প্রকৃতিতে আমরা দেখি, ব্যাপ্ত হইবার জন্য, টিকিয়া থাকিবার জন্য, প্রাণীদের মধ্যে সর্বদা একটা চেষ্টা চলিতেছে। যে জীব সন্তানের দ্বারা আপনাকে যত বহুগুণিত করিয়া যত বেশি জায়গা জুড়িতে পারে তাহার জীবনের অধিকার তত বেশি বাড়িয়া যায়, নিজের অস্তিত্বকে সে যেন তত অধিক সত্য করিয়া তোলে।

মানুষের মনোভাবের মধ্যেও সেই রকমের একটা চেষ্টা আছে। তফাতের মধ্যে এই যে, প্রাণের অধিকার দেশে ও কালে, মনোভাবের অধিকার মনে এবং কালে। মনোভাবের চেষ্টা বহু কাল ধরিয়া বহু মনকে আয়ত্ত করা।

এই একান্ত আকাঙ্ক্ষায় কত প্রাচীন কাল ধরিয়া কত ইঙ্গিত, কত ভাষা, কত লিপি, কত পাথরে খোদাই, ধাতুতে ঢালাই, চামড়ায় বাঁধাই— কত গাছের ছালে, পাতায়, কাগজে, কত তূলিতে, খোন্তায়, কলমে, কত আঁকজোক, কত প্রয়াস— বাঁ দিক হইতে ডাহিনে, ডাহিন দিক হইতে বাঁয়ে, উপর হইতে নীচে, এক সার হইতে অন্য সারে! কী? না, আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি, আমি যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা মরিবে না; তাহা মন হইতে মনে, কাল হইতে কালে চিন্তিত হইয়া, অনুভূত হইয়া, প্রবাহিত হইয়া চলিবে। আমার বাড়িঘর, আমার আসবাব-পত্র, আমার শরীর মন, আমার সুখদুঃখের সামগ্রী, সমস্তই যাইবে; কেবল আমি যাহা ভাবিয়াছি, যাহা বোধ করিয়াছি, তাহা চিরদিন মানুষের ভাবনা, মানুষের বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া সজীব সংসারের মাঝখানে বাঁচিয়া থাকিবে।

মধ্য এসিয়ায় গোবি-মরুভূমির বালুকাস্তূপের মধ্য হইতে যখন বিলুপ্ত মানবসমাজের বিস্মৃত প্রাচীনকালের জীর্ণ পুঁথি বাহির হইয়া পড়ে তখন তাহার সেই অজানা ভাষার অপরিচিত অক্ষরগুলির মধ্যে কী একটি বো প্রকাশ পায়! কোন্ কালের কোন্ সজীব চিত্তের চেষ্টা আজ আমা

মনের মধ্যে প্রবেশলাভের জন্য আঁকুবাঁকু করিতেছে! যে লিখিয়াছিল সে নাই, যে লোকালয়ে লেখা হইয়াছিল তাহাও নাই; কিন্তু মানুষের মনের ভাবটুকু মানুষের সুখদুঃখের মধ্যে লালিত হইবার জন্য যুগ হইতে যুগান্তরে আসিয়া আপনার পরিচয় দিতে পারিতেছে না, দুই বাহু বাড়াইয়া মুখের দিকে চাহিতেছে।

জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক আপনার যে কথাগুলিকে চিরকালের শ্রুতিগোচর করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাদিগকে তিনি পাহাড়ের গায়ে খুদিয়া দিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, পাহাড় কোনোকালে মরিবে না, সরিবে না, অনন্তকালের পথের ধারে অচল হইয়া দাঁড়াইয়া নব নব যুগের পথিকদের কাছে এক কথা চিরদিন ধরিয়া আবৃত্তি করিতে থাকিবে। পাহাড়কে তিনি কথা কহিবার ভার দিয়াছিলেন।

পাহাড় কালাকালের কোনো বিচার না করিয়া তাঁহার ভাষা বহন করিয়া আসিয়াছে। কোথায় অশোক, কোথায় পাটলিপুত্র, কোথায় ধর্মজাগ্রত ভারতবর্ষের সেই গৌরবের দিন! কিন্তু পাহাড় সেদিনকার সেই কথা-কয়টি বিস্মৃত অক্ষরে অপ্রচলিত ভাষায় আজও উচ্চারণ করিতেছে। কতদিন অরণ্যে রোদন করিয়াছে! অশোকের সেই মহাবাণীও কত শত বৎসর মানবহৃদয়কে বোবার মতো কেবল ইশারায় আহ্বান করিয়াছে! পথ দিয়া রাজপুত গেল, পাঠান গেল, মোগল গেল, বর্গির তরবারি বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্রবেগে দিগ্‌দিগন্তে প্রলয়ের কশাঘাত করিয়া গেল— কেহ তাহার ইশারায় সাড়া দিল না। সমুদ্রপারের যে ক্ষুদ্র দ্বীপের কথা অশোক কখনো কল্পনাও করেন নাই, তাঁহার শিল্পীরা পাষাণ-ফলকে যখন তাঁহার অনুশাসন উৎকীর্ণ করিতেছিল তখন যে দ্বীপের অরণ্যচারী 'ড্রুয়িদ'গণ আপনাদের পূজার আবেগ ভাষাহীন প্রস্তরস্তূপে স্তম্ভিত করিয়া তুলিতেছিল, বহু সহস্র বৎসর পরে সেই দ্বীপ হইতে একটি বিদেশী আসিয়া কালান্তরের সেই মূক ইঙ্গিতপাশ হইতে তাহার

ভাষাকে উদ্ধার করিয়া লইলেন। রাজচক্রবর্তী অশোকের ইচ্ছা এত শতাব্দী-পরে একটি বিদেশীর সাহায্যে সার্থকতা লাভ করিল। সে ইচ্ছা আর কিছুই নহে, তিনি যত বড়ো সম্রাট্‌ই হউন, তিনি কী চান কী না চান, তাঁহার কাছে কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ, তাহা পথের পথিককেও জানাইতে হইবে। তাঁহার মনের ভাব এত যুগ ধরিয়া সকল মানুষের মনের আশ্রয় চাহিয়া পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। রাজচক্রবর্তীর সেই একাগ্র আকাঙ্ক্ষার দিকে পথের লোক কেহ বা চাহিতেছে, কেহ বা না চাহিয়া চলিয়া যাইতেছে।

তাই বলিয়া অশোকের অনুশাসনগুলিকে আমি যে সাহিত্য বলিতেছি তাহা নহে। উহাতে এইটুকু প্রমাণ হইতেছে, মানবহৃদয়ের একটা প্রধান আকাঙ্ক্ষা কী। আমরা যে মূর্তি গড়িতেছি, ছবি আঁকিতেছি, কবিতা লিখিতেছি, পাথরের মন্দির নির্মাণ করিতেছি, দেশে বিদেশে চিরকাল ধরিয়া অবিশ্রাম এই-যে একটা চেষ্টা চলিতেছে, ইহা আর-কিছুই নয়, মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে।

যাহা চিরকালীন মানুষের হৃদয়ে অমর হইতে চেষ্টা করে সাধারণত তাহা আমাদের ক্ষণকালীন প্রয়োজন ও চেষ্টা হইতে নানা প্রকারের পার্থক্য অবলম্বন করে। আমরা সাংবৎসরিক প্রয়োজনের জন্যই ধান যব গম প্রভৃতি ওষধির বীজ বপন করিয়া থাকি, কিন্তু অরণ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাই যদি তবে বনস্পতির বীজ সংগ্রহ করিতে হয়।

সাহিত্যে সেই চিরস্থায়িত্বের চেষ্টাই মানুষের প্রিয় চেষ্টা। সেইজন্য দেশহিতৈষী সমালোচকেরা যতই উত্তেজনা করেন যে, সারবান সাহিত্যের অভাব হইতেছে, কেবল নাটক নভেল কাব্যে দেশ ছাইয়া যাইতেছে, তবু লেখকদের হুঁশ হয় না। কারণ, সারবান সাহিত্যে উপস্থিত প্রয়োজন মিটে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় সাহিত্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা বেশি।

যাহা জ্ঞানের কথা তাহা প্রচার হইয়া গেলেই তাহার উদ্দেশ্য সফল

হইয়া শেষ হইয়া যায়। মানুষের জ্ঞান সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কারের দ্বারা পুরাতন আবিষ্কার আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। কাল যাহা পণ্ডিতের অগম্য ছিল আজ তাহা অর্বাচীন বালকের কাছেও নূতন নহে। যে সত্য নূতন বেশে বিপ্লব আনয়ন করে সেই সত্য পুরাতন বেশে বিস্ময়মাত্র উদ্রেক করে না। আজ যে-সকল তত্ত্ব মূঢ়ের নিকটে পরিচিত কোনো কালে যে তাহা পণ্ডিতের নিকটেও বিস্তর বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহাই লোকের কাছে আশ্চর্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু হৃদয়ভাবের কথা প্রচারের দ্বারা পুরাতন হয় না।

জ্ঞানের কথা একবার জানিলে আর জানিতে হয় না। আগুন গরম, সূর্য গোল, জল তরল, ইহা একবার জানিলেই চুকিয়া যায়; দ্বিতীয়বার কেহ যদি তাহা আমাদের নূতন শিক্ষার মতো জানাইতে আসে তবে ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন হয়। কিন্তু ভাবের কথা বারবার অনুভব করিয়া শ্রান্তিবোধ হয় না। সূর্য যে পূর্বদিকে ওঠে এ কথা আর আমাদের মন আকর্ষণ করে না; কিন্তু সূর্যোদয়ের যে সৌন্দর্য ও আনন্দ তাহা জীবসৃষ্টির পর হইতে আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে অম্লান আছে। এমন-কি, অনুভূতি যত প্রাচীন কাল হইতে যত লোকপরম্পরার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসে ততই তাহার গভীরতা-বৃদ্ধি হয়, ততই তাহা আমাদিগকে সহজে আবিষ্ট করিতে পারে।

অতএব চিরকাল যদি মানুষ আপনার কোনো জিনিস মানুষের কাছে উজ্জ্বল নবীন ভাবে অমর করিয়া রাখিতে চায় তবে তাহাকে ভাবের কথাই আশ্রয় করিতে হয়। এইজন্য সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়।

তাহা ছাড়া যাহা জ্ঞানের জিনিস তাহা এক ভাষা হইতে আর-এক ভাষায় স্থানান্তর করা চলে। মূল রচনা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া অন্য রচনার মধ্যে নিবিষ্ট করিলে অনেক সময় তাহার উজ্জ্বলতাবৃদ্ধি হয়।

তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইলেন। রাজচক্রবর্তী অশোকের ইচ্ছা এত শতাব্দী-পরে একটি বিদেশীর সাহায্যে সার্থকতা লাভ করিল। সে ইচ্ছা আর কিছুই নহে, তিনি যত বড়ো সম্রাট্ই হউন, তিনি কী চান কী না চান, তাঁহার কাছে কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ, তাহা পথের পথিককেও জানাইতে হইবে। তাঁহার মনের ভাব এত যুগ ধরিয়া সকল মানুষের মনের আশ্রয় চাহিয়া পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। রাজচক্রবর্তীর সেই একাগ্র আকাঙ্ক্ষার দিকে পথের লোক কেহ বা চাহিতেছে, কেহ বা না চাহিয়া চলিয়া যাইতেছে।

তাই বলিয়া অশোকের অনুশাসনগুলিকে আমি যে সাহিত্য বলিতেছি তাহা নহে। উহাতে এইটুকু প্রমাণ হইতেছে, মানবহৃদয়ের একটা প্রধান আকাঙ্ক্ষা কী। আমরা যে মূর্তি গড়িতেছি, ছবি আঁকিতেছি, কবিতা লিখিতেছি, পাথরের মন্দির নির্মাণ করিতেছি, দেশে বিদেশে চিরকাল ধরিয়া অবিশ্রাম এই-যে একটা চেষ্টা চলিতেছে, ইহা আর-কিছুই নয়, মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে।

যাহা চিরকালীন মানুষের হৃদয়ে অমর হইতে চেষ্টা করে সাধারণত তাহা আমাদের ক্ষণকালীন প্রয়োজন ও চেষ্টা হইতে নানা প্রকারের পার্থক্য অবলম্বন করে। আমরা সাংবৎসরিক প্রয়োজনের জন্যই ধান যব গম প্রভৃতি ওষধির বীজ বপন করিয়া থাকি, কিন্তু অরণ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাই যদি তবে বনস্পতির বীজ সংগ্রহ করিতে হয়।

সাহিত্যে সেই চিরস্থায়িত্বের চেষ্টাই মানুষের প্রিয় চেষ্টা। সেইজন্য দেশহিতৈষী সমালোচকেরা যতই উত্তেজনা করেন যে, সারবান সাহিত্যের অভাব হইতেছে, কেবল নাটক নভেল কাব্যে দেশ ছাইয়া যাইতেছে, তবু লেখকদের হুঁশ হয় না। কারণ, সারবান সাহিত্যে উপস্থিত প্রয়োজন মিটে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় সাহিত্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা বেশি।

যাহা জ্ঞানের কথা তাহা প্রচার হইয়া গেলেই তাহার উদ্দেশ্য সফল

হইয়া শেষ হইয়া যায়। মানুষের জ্ঞান সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কারের দ্বারা পুরাতন আবিষ্কার আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। কাল যাহা পণ্ডিতের অগম্য ছিল আজ তাহা অর্বাচীন বালকের কাছেও নূতন নহে। যে সত্য নূতন বেশে বিপ্লব আনয়ন করে সেই সত্য পুরাতন বেশে বিস্ময়মাত্র উদ্রেক করে না। আজ যে-সকল তত্ত্ব মূঢ়ের নিকটে পরিচিত কোনো কালে যে তাহা পণ্ডিতের নিকটেও বিস্তর বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহাই লোকের কাছে আশ্চর্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু হৃদয়ভাবের কথা প্রচারের দ্বারা পুরাতন হয় না।

জ্ঞানের কথা একবার জানিলে আর জানিতে হয় না। আগুন গরম, সূর্য গোল, জল তরল, ইহা একবার জানিলেই চুকিয়া যায়; দ্বিতীয়বার কেহ যদি তাহা আমাদের নূতন শিক্ষার মতো জানাইতে আসে তবে ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন হয়। কিন্তু ভাবের কথা বারবার অনুভব করিয়া শ্রান্তিবোধ হয় না। সূর্য যে পূর্বদিকে ওঠে এ কথা আর আমাদের মন আকর্ষণ করে না; কিন্তু সূর্যোদয়ের যে সৌন্দর্য ও আনন্দ তাহা জীবসৃষ্টির পর হইতে আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে অম্লান আছে। এমন-কি, অনুভূতি যত প্রাচীন কাল হইতে যত লোকপরম্পরার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসে ততই তাহার গভীরতা-বৃদ্ধি হয়, ততই তাহা আমাদিগকে সহজে আবিষ্ট করিতে পারে।

অতএব চিরকাল যদি মানুষ আপনার কোনো জিনিস মানুষের কাছে উজ্জ্বল নবীন ভাবে অমর করিয়া রাখিতে চায় তবে তাহাকে ভাবের কথাই আশ্রয় করিতে হয়। এইজন্য সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়।

তাহা ছাড়া যাহা জ্ঞানের জিনিস তাহা এক ভাষা হইতে আর-এক ভাষায় স্থানান্তর করা চলে। মূল রচনা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া অন্য রচনার মধ্যে নিবিষ্ট করিলে অনেক সময় তাহার উজ্জ্বলতাবৃদ্ধি হয়।

২

তাহার বিষয়টি লইয়া নানা লোকে নানা ভাষায় নানা রকম করিয়া প্রচার করিতে পারে; এইরূপেই তাহার উদ্দেশ্য যথার্থভাবে সফল হইয়া থাকে।

কিন্তু ভাবের বিষয় সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তাহা যে মূর্তিকে আশ্রয় করে তাহা হইতে আর বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।

জ্ঞানের কথাকে প্রমাণ করিতে হয়, আর ভাবের কথাকে সঞ্চার করিয়া দিতে হয়। তাহার জন্য নানাপ্রকার আভাস-ইঙ্গিত, নানাপ্রকার ছলাকলার দরকার হয়। তাহাকে কেবল বুঝাইয়া বলিলেই হয় না, তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হয়।

এই কলাকৌশলপূর্ণ রচনা ভাবের দেহের মতো। এই দেহের মধ্যে ভাবের প্রতিষ্ঠায় সাহিত্যকারের পরিচয়। এই দেহের প্রকৃতি ও গঠন -অনুসারেই তাহার আশ্রিত ভাব মানুষের কাছে আদর পায়, ইহার শক্তি-অনুসারেই তাহা হৃদয়ে ও কালে ব্যাপ্তিলাভ করিতে পারে।

প্রাণের জিনিস দেহের উপরে একান্ত নির্ভর করিয়া থাকে। জলের মতো তাহাকে এক পাত্র হইতে আর-এক পাত্রে ঢালা যায় না। দেহ এবং প্রাণ পরস্পর পরস্পরকে গৌরবান্বিত করিয়া একাত্ম হইয়া বিরাজ করে।

ভাব, বিষয়, তত্ত্ব সাধারণ মানুষের। তাহা একজন যদি বাহির না করে তো কালক্রমে আর-একজন বাহির করিবে। কিন্তু রচনা লেখকের সম্পূর্ণ নিজের। তাহা একজনের যেমন হইবে আর-একজনের তেমন হইবে না। সেইজন্য রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থরূপে বাঁচিয়া থাকে; ভাবের মধ্যে নহে, বিষয়ের মধ্যে নহে।

অবশ্য, রচনা বলিতে গেলে ভাবের সহিত ভাবপ্রকাশের উপায় দুই সম্মিলিতভাবে বুঝায়; কিন্তু বিশেষ করিয়া উপায়টাই লেখকের।

দিঘি বলিতে জল এবং খনন-করা আধার দুই একসঙ্গে বুঝায়। কিন্তু

কীর্তি কোন্‌টা? জল মানুষের সৃষ্টি নহে, তাহা চিরন্তন। সেই জলকে বিশেষভাবে সর্বসাধারণের ভোগের জন্য সুদীর্ঘকাল রক্ষা করিবার যে উপায় তাহাই কীর্তিমান মানুষের নিজের। ভাব সেইরূপ মনুষ্য-সাধারণের, কিন্তু তাহাকে বিশেষ মূর্তিতে সর্বলোকের বিশেষ আনন্দের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায়রচনাই লেখকের কীর্তি।

অতএব দেখিতেছি, ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা। অঙ্গার-জিনিসটা জলে স্থলে বাতাসে নানা পদার্থে সাধারণভাবে সাধারণের আছে; গাছপালা তাহাকে নিগূঢ় শক্তিবলে বিশেষ আকারে প্রথমত নিজের করিয়া লয়, এবং সেই উপায়েই তাহা সুদীর্ঘকাল বিশেষভাবে সর্বসাধারণের ভোগের দ্রব্য হইয়া উঠে। শুধু যে তাহা আহার এবং উত্তাপের কাজে লাগে তাহা নহে; তাহা হইতে সৌন্দর্য ছায়া স্বাস্থ্য বিকীর্ণ হইতে থাকে।

অতএব দেখা যাইতেছে, সাধারণের জিনিসকে বিশেষভাবে নিজের করিয়া, সেই উপায়েই তাহাকে পুনশ্চ বিশেষভাবে সাধারণের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।

তা যদি হয়, তবে জ্ঞানের জিনিস সাহিত্য হইতে আপনি বাদ পড়িয়া যায়। কারণ, ইংরাজিতে যাহাকে ট্রুথ বলে এবং বাংলাতে যাহাকে আমরা সত্য নাম দিয়াছি, অর্থাৎ যাহা আমাদের বুদ্ধির অধিগম্য বিষয়, তাহাকে ব্যক্তিবিশেষের নিজত্ববর্জিত করিয়া তোলাই একান্ত দরকার। সত্য সর্বাংশেই ব্যক্তিনিরপেক্ষ, শুভ্রনিরঞ্জন। মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আমার কাছে একরূপ, অন্যের কাছে অন্যরূপ নহে। তাহার উপরে বিচিত্র হৃদয়ের নূতন নূতন রঙের ছায়া পড়িবার জো নাই।

যে-সকল জিনিস অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে সুর রঙ ইঙ্গিত প্রার্থনা করে, যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না,

তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী। তাহা আকারে প্রকারে, ভাবে ভাষায়, সুরে ছন্দে মিলিয়া তবেই বাঁচিতে পারে; তাহা মানুষের একান্ত আপনার; তাহা আবিষ্কার নহে, অনুকরণ নহে, তাহা সৃষ্টি। সুতরাং তাহা একবার প্রকাশিত হইয়া উঠিলে তাহার রূপান্তর অবস্থান্তর করা চলে না; তাহার প্রত্যেক অংশের উপরে তাহার সমগ্রতা একান্তভাবে নির্ভর করে। যেখানে তাহার ব্যত্যয় দেখা যায় সেখানে সাহিত্য-অংশে তাহা হেয়।

কার্তিক ১৩১০

সাহিত্যের বিচারক

ঘরে বসিয়া আনন্দে যখন হাসি এবং দুঃখে যখন কাঁদি তখন এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, আরও একটু বেশি করিয়া হাসা দরকার বা কান্নাটা ওজনে কম পড়িয়াছে। কিন্তু পরের কাছে যখন আনন্দ বা দুঃখ দেখানো আবশ্যক হইয়া পড়ে তখন মনের ভাবটা সত্য হইলেও বাহিরের প্রকাশটা সম্পূর্ণ তাহার অনুযায়ী না হইতে পারে।

এমন-কি, মা'ও যখন সশব্দ বিলাপে পল্লীর নিদ্রাতন্দ্রা দূর করিয়া দেয় তখন সে যে শুদ্ধমাত্র পুত্রশোক প্রকাশ করে তাহা নয়, পুত্রশোকের গৌরব প্রকাশ করিতেও চায়। নিজের কাছে দুঃখসুখ প্রমাণ করিবার প্রয়োজন হয় না; পরের কাছে তাহা প্রমাণ করিতে হয়। সুতরাং শোকপ্রকাশের জন্য যেটুকু কান্না স্বাভাবিক শোকপ্রমাণের জন্য তাহার চেয়ে সুর চড়াইয়া না দিলে চলে না।

ইহাকে কৃত্রিমতা বলিয়া উড়াইয়া দিলে অন্যায় হইবে। শোকপ্রমাণ শোকপ্রকাশের একটা স্বাভাবিক অঙ্গ। আমার ছেলের মূল্য যে কেবল আমারই কাছে বেশি, তাহার বিচ্ছেদ যে কতখানি মর্মান্তিক ব্যাপার তাহা পৃথিবীর আর-কেহই যে বুঝিবে না, তাহার অভাবসত্ত্বেও পৃথিবীর আর সকলেই যে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দচিত্তে আহার নিদ্রা ও আপিস-যাতায়াতে প্রবৃত্ত থাকিবে, শোকাতুর মাতাকে তাহার পুত্রের প্রতি জগতের এই অবজ্ঞা আঘাত করিতে থাকে। তখন সে নিজের শোকের প্রবলতার দ্বারা এই ক্ষতির প্রাচুর্যকে বিশ্বের কাছে ঘোষণা করিয়া তাহার পুত্রকে যেন গৌরবান্বিত করিতে চায়।

যে অংশে শোক নিজের সে অংশে তাহার একটি স্বাভাবিক সংযম থাকে, যে অংশে তাহা পরের কাছে ঘোষণা তাহা অনেক সময়েই সংগতির সীমা লঙ্ঘন করে। পরের অসাড় চিত্তকে নিজের শোকের দ্বারা বিচলিত

করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছায় তাহার চেষ্টা অস্বাভাবিক উদ্যম অবলম্বন করে।

কেবল শোক নহে, আমাদের অধিকাংশ হৃদয়ভাবেরই এই দুইটা দিকই আছে; একটা নিজের জন্য, একটা পরের জন্য। আমার হৃদয়-ভাবকে সাধারণের হৃদয়ভাব করিতে পারিলে তাহার একটা সান্ত্বনা একটা গৌরব আছে। 'আমি যাহাতে বিচলিত তুমি তাহাতে উদাসীন' ইহা আমাদের কাছে ভালো লাগে না।

কারণ, নানা লোকের কাছে প্রমাণিত না হইলে সত্যতার প্রতিষ্ঠা হয় না। আমিই যদি আকাশকে হলদে দেখি, আর দশজনে না দেখে, তবে তাহাতে আমার ব্যাধিই সপ্রমাণ হয়। সেটা আমারই দুর্বলতা।

আমার হৃদয়বেদনায় পৃথিবীর যত বেশি লোক সমবেদনা অনুভব করিবে ততই তাহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমি যাহা একান্তভাবে অনুভব করিতেছি তাহা যে আমার দুর্বলতা, আমার ব্যাধি, আমার পাগলামি নহে, তাহা যে সত্য, তাহা সর্বসাধারণের হৃদয়ের মধ্যে প্রমাণিত করিয়া আমি বিশেষভাবে সান্ত্বনা ও সুখ পাই।

যাহা নীল তাহা দশ জনের কাছে নীল বলিয়া প্রচার করা কঠিন নহে; কিন্তু যাহা আমার কাছে সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, তাহা দশজনের কাছে সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় বলিয়া প্রতীত করা দুরূহ। সে অবস্থায় নিজের ভাবকে কেবলমাত্র প্রকাশ করিয়াই খালাস পাওয়া যায় না; নিজের ভাবকে এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হয় যাহাতে পরের কাছেও তাহা যথার্থ বলিয়া অনুভূত হইতে পারে।

সুতরাং এইখানেই বাড়াবাড়ি হইবার সম্ভাবনা। দূর হইতে যে জিনিসটা দেখাইতে হয় তাহা কতকটা বড়ো করিয়া দেখানো আবশ্যক। সেটুকু বড়ো সত্যের অনুরোধেই করিতে হয়। নহিলে জিনিসটা যে পরিমাণে ছোটো দেখায় সেই পরিমাণেই মিথ্যা দেখায়। বড়ো করিয়াই

তাহাকে সত্য করিতে হয়।

আমার সুখদুঃখ আমার কাছে অব্যবহিত, তোমার কাছে তাহা অব্যবহিত নয়। আমি হইতে তুমি দূরে আছ। সেই দূরত্বটুকু হিসাব করিয়া আমার কথা তোমার কাছে কিছু বড়ো করিয়াই বলিতে হয়।

সত্যরক্ষাপূর্বক এই বড়ো করিয়া তুলিবার ক্ষমতায় সাহিত্যকারের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। যেমনটি ঠিক তেমনি লিপিবদ্ধ করা সাহিত্য নহে।

কারণ, প্রকৃতিতে যাহা দেখি তাহা আমার কাছে প্রত্যক্ষ, আমার ইন্দ্রিয় তাহার সাক্ষ্য দেয়। সাহিত্যে যাহা দেখায় তাহা প্রাকৃতিক হইলেও তাহা প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং সাহিত্যে সেই প্রত্যক্ষতার অভাব পূরণ করিতে হয়।

প্রাকৃত সত্যে এবং সাহিত্যসত্যে এইখানেই তফাত আরম্ভ হয়। সাহিত্যের মা যেমন করিয়া কাঁদে প্রাকৃত মা তেমন করিয়া কাঁদে না। তাই বলিয়া সাহিত্যের মা'র কান্না মিথ্যা নহে। প্রথমত, প্রাকৃত রোদন এমন প্রত্যক্ষ যে তাহার বেদনা আকারে-ইঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরে, চারি দিকের দৃশ্যে এবং শোকঘটনার নিশ্চয় প্রমাণে আমাদের প্রতীতি ও সমবেদনা উদ্রেক করিয়া দিতে বিলম্ব করে না। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃত মা আপনার শোক সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিতে পারে না, সে ক্ষমতা তাহার নাই, সে অবস্থাও তাহার নয়।

এইজন্যই সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আর্শি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোনো কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে। প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষকে আমরা প্রতীতি করি, সাহিত্যে এবং ললিতকলায় অপ্রত্যক্ষ আমাদের কাছে প্রতীয়মান। অতএব এ স্থলে একটি অপরটির আর্শি হইয়া কোনো কাজ করিতে পারে না।

এই প্রত্যক্ষতার অভাব-বশত সাহিত্যে ছন্দোবন্ধ-ভাষাভঙ্গির নানা-

প্রকার কল-বল আশ্রয় করিতে হয়। এইরূপে রচনার বিষয়টি বাহিরে কৃত্রিম হইয়া অন্তরে প্রাকৃত অপেক্ষা অধিকতর সত্য হইয়া উঠে।

এখানে 'অধিকতর সত্য' এই কথাটা ব্যবহার করিবার বিশেষ তাৎপর্য আছে। মানুষের ভাবসম্বন্ধে প্রাকৃত সত্য জড়িতমিশ্রিত, ভগ্নখণ্ড, ক্ষণস্থায়ী। সংসারের ঢেউ ক্রমাগতই ওঠাপড়া করিতেছে, দেখিতে দেখিতে একটার ঘাড়ে আর-একটা আসিয়া পড়িতেছে, তাহার মধ্যে প্রধান-অপ্রধানের বিচার নাই— তুচ্ছ ও অসামান্য গায়ে গায়ে ঠেলাঠেলি করিয়া বেড়াইতেছে। প্রকৃতির এই বিরাট রঙ্গশালায় যখন মানুষের ভাবাভিনয় আমরা দেখি তখন আমরা স্বভাবতই অনেক বাদসাদ দিয়া বাছিয়া লইয়া, আন্দাজের দ্বারা অনেকটা ভর্তি করিয়া, কল্পনার দ্বারা অনেকটা গড়িয়া তুলিয়া থাকি। আমাদের একজন পরমাত্মীয়ও তাঁহার সমস্তটা লইয়া আমাদের কাছে পরিচিত নহেন। আমাদের স্মৃতি নিপুণ সাহিত্যরচয়িতার মতো তাঁহার অধিকাংশই বাদ দিয়া ফেলে। তাঁহার ছোটোবড়ো সমস্ত অংশই যদি ঠিক সমান অপক্ষপাতের সহিত আমাদের স্মৃতি অধিকার করিয়া থাকে তবে এই স্তূপের মধ্যে আসল চেহারাটি মারা পড়ে ও সবটা রক্ষা করিতে গেলে আমাদের পরমাত্মীয়কে আমরা যথার্থভাবে দেখিতে পাই না। পরিচয়ের অর্থই এই যে, যাহা বর্জন করিবার তাহা বর্জন করিয়া যাহা গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ করা।

একটু বাড়াইতেও হয়। আমাদের পরমাত্মীয়কেও আমরা মোটের উপরে অল্পই দেখিয়া থাকি। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ আমাদের অগোচর। আমরা তাঁহার ছায়া নহি, আমরা তাঁহার অন্তর্যামীও নই। তাঁহার অনেকখানিই যে আমরা দেখিতে পাই না, সেই শূন্যতার উপরে আমাদের কল্পনা কাজ করে। ফাঁকগুলি পুরাইয়া লইয়া আমরা মনের মধ্যে একটা পূর্ণ ছবি আঁকিয়া তুলি। যে লোকের সম্বন্ধে আমাদের কল্পনা খেলে না, যাহার ফাঁক আমাদের কাছে ফাঁক থাকিয়া যায়, যাহার

প্রত্যক্ষগোচর অংশই আমাদের কাছে বর্তমান, অপ্রত্যক্ষ অংশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট অগোচর, তাহাকে আমরা জানি না, অল্পই জানি। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই এইরূপ আমাদের কাছে ছায়া, আমাদের কাছে অসত্যপ্রায়। তাহাদের অনেককেই আমরা উকিল বলিয়া জানি, ডাক্তার বলিয়া জানি, দোকানদার বলিয়া জানি— মানুষ বলিয়া জানি না। অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে যে বহির্বিষয়ে তাহাদের সংস্রব সেইটেকেই সর্বাপেক্ষা বড়ো করিয়া জানি, তাহাদের মধ্যে তদপেক্ষা বড়ো যাহা আছে তাহা আমাদের কাছে কোনো আমল পায় না।

সাহিত্য যাহা আমাদিগকে জানাইতে চায় তাহা সম্পূর্ণরূপে জানায় ; অর্থাৎ স্থায়ীকে রক্ষা করিয়া, অবান্তরকে বাদ দিয়া, ছোটোকে ছোটো করিয়া, বড়োকে বড়ো করিয়া, ফাঁককে ভরাট করিয়া, আলগাকে জমাট করিয়া দাঁড় করায়। প্রকৃতির অপক্ষপাত প্রাচুর্যের মধ্যে মন যাহা করিতে চায় সাহিত্য তাহাই করিতে থাকে। মন প্রকৃতির আর্শি নহে, সাহিত্যও প্রকৃতির আর্শি নহে। মন প্রাকৃতিক জিনিসকে মানসিক করিয়া লয় ; সাহিত্য সেই মানসিক জিনিসকে সাহিত্যিক করিয়া তুলে।

দুয়ের কার্যপ্রণালী প্রায় একই রকম। কেবল দুয়ের মধ্যে কয়েকটা বিশেষ কারণে তফাত ঘটিয়াছে। মন যাহা গড়িয়া তোলে তাহা নিজের আবশ্যকের জন্য, সাহিত্য যাহা গড়িয়া তোলে তাহা সকলের আনন্দের জন্য। নিজের জন্য একটা মোটামুটি নোট করিয়া রাখিলেও চলে, সকলের জন্য আগাগোড়া সুসম্বদ্ধ করিয়া তুলিতে হয় এবং তাহাকে এমন জায়গায় এমন আলোকে এমন করিয়া ধরিতে হয় যাহাতে সম্পূর্ণভাবে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। মন সাধারণত প্রকৃতির মধ্য হইতে সংগ্রহ করে, সাহিত্য মনের মধ্য হইতে সঞ্চয় করে। মনের জিনিসকে বাহিরে ফলাইয়া তুলিতে গেলে বিশেষভাবে সৃজনশক্তির আবশ্যক হয়। এইরূপে প্রকৃতি হইতে মনে ও মন হইতে সাহিত্যে যাহা প্রতিফলিত হইয়া উঠে

তাহা অনুকরণ হইতে বহুদূরবর্তী।

প্রকৃত সাহিত্যে আমরা আমাদের কল্পনাকে, আমাদের সুখদুঃখকে, শুদ্ধ বর্তমান কাল নহে, চিরন্তন কালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহি। সুতরাং সেই সুবিশাল প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রের সহিত তাহার পরিমাণসামঞ্জস্য করিতে হয়। ক্ষণকালের মধ্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে যখন চিরকালের জন্য গড়িয়া তোলা যায় তখন ক্ষণকালের মাপকাঠি লইয়া কাজ চলে না। এই কারণে প্রচলিত কালের সহিত, সংকীর্ণ সংসারের সহিত, উচ্চসাহিত্যের পরিমাণের প্রভেদ থাকিয়া যায়।

অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।

জগতের সহিত মনের যে সম্বন্ধ মনের সহিত সাহিত্যকারের প্রতিভার সেই সম্বন্ধ। এই প্রতিভাকে বিশ্বমানবমন নাম দিলে ক্ষতি নাই। জগৎ হইতে মন আপনার জিনিস সংগ্রহ করিতেছে, সেই মন হইতে বিশ্বমানব-মন পুনশ্চ নিজের জিনিস নির্বাচন করিয়া নিজের জন্য গড়িয়া লইতেছে।

বুঝিতেছি কথাটা বেশ ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে। আর-একটু পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। কৃতকার্য হইব কি না জানি না।

আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যে দুইটা অংশের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। একটা অংশ আমার নিজত্ব, আর-একটা অংশ আমার মানবত্ব। আমার ঘরটা যদি সচেতন হইত তবে সে নিজের ভিতরকার খণ্ডাকাশ ও তাহারই সহিত পরিব্যাপ্ত মহাকাশ এই দুটাকে ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিত। আমাদের ভিতরকার নিজত্ব ও মানবত্ব সেই প্রকার। যদি দুয়ের মধ্যে দুর্ভেদ্য দেয়াল তোলা থাকে তবে আত্মা অন্ধকূপের মধ্যে বাস করে।

প্রকৃত সাহিত্যকারের অন্তঃকরণে যদি তাহার নিজত্ব ও মানবত্বের

মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে তবে তাহা কল্পনার কাচের শাসির স্বচ্ছ ব্যবধান। তাহার মধ্য দিয়া পরস্পরের চেনা-পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটে না। এমন-কি, এই কাচ দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণের কাচের কাজ করিয়া থাকে ; ইহা অদৃশ্যকে দৃশ্য, দূরকে নিকট করে।

সাহিত্যকারের সেই মানবত্বই সৃজনকর্তা। লেখকের নিজত্বকে সে আপনার করিয়া লয়, ক্ষণিককে সে অমর করিয়া তোলে, খণ্ডকে সে সম্পূর্ণতা দান করে।

জগতের উপরে মনের কারখানা বসিয়াছে এবং মনের উপরে বিশ্ব-মনের কারখানা— সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।

পূর্বেই বলিয়াছি, মনোরাজ্যের কথা আসিয়া পড়িলে সত্যতাবিচার করা কঠিন হইয়া পড়ে। কালোকে কালো প্রমাণ করা সহজ, কারণ অধিকাংশের কাছেই তাহা নিশ্চয় কালো ; কিন্তু ভালোকে ভালো প্রমাণ করা তেমন সহজ নহে, কারণ এখানে অধিকাংশের একমত সাক্ষ্য সংগ্রহ করা কঠিন।

এখানে অনেকগুলি মুশকিলের কথা আসিয়া পড়ে। অধিকাংশের কাছেই যাহা ভালো তাহাই কি সত্য ভালো, না, বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের কাছে যাহা ভালো তাহাই সত্য ভালো ?

যদি বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যায় তবে প্রাকৃতবস্তুসম্বন্ধে এ কথা নিশ্চয় বলিতে হয় যে, অধিকাংশের কাছে যাহা কালো তাহাই সত্য কালো। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, এ সম্বন্ধে মতভেদের সম্ভাবনা এত অল্প যে অধিক সাক্ষ্য সংগ্রহ করিবার কোনো প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু ভালো যে ভালোই এবং কত ভালো তাহা লইয়া মতের এত অনৈক্য ঘটিয়া থাকে যে, সে সম্বন্ধে কিরূপ সাক্ষ্য লওয়া উচিত তাহা স্থির করা কঠিন হয়।

বিশেষ কঠিন এইজন্য, সাহিত্যকারদের শ্রেষ্ঠ চেষ্টা কেবল বর্তমান

কালের জন্য নহে। চিরকালের মনুষ্যসমাজই তাঁহাদের লক্ষ্য। যাহা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের জন্য লিখিত তাহার অধিকাংশ সাক্ষী ও বিচারক বর্তমান কাল হইতে কেমন করিয়া মিলিবে?

ইহা প্রায়ই দেখা যায় যে, যাহা তৎসাময়িক ও তৎস্থানিক তাহাই অধিকাংশ লোকের কাছে সর্বপ্রধান আসন অধিকার করে। কোনো-একটি বিশেষ সময়ের সাক্ষিসংখ্যা গণনা করিয়া সাহিত্যের বিচার করিতে গেলে অবিচার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এইজন্য বর্তমান কালকে অতিক্রম করিয়া সর্বকালের দিকেই সাহিত্যকে লক্ষনিবেশ করিতে হয়।

কালে কালে মানুষের বিচিত্র শিক্ষা ভাব ও অবস্থার পরিবর্তন-সত্ত্বেও যে-সকল রচনা আপন মহিমা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে তাহাদেরই অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া গেছে। মন আমাদের সহজগোচর নয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেখিলে অবিশ্রাম গতির মধ্যে তাহার নিত্যানিত্য সংগ্রহ করিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। এইজন্য সুবিপুল কালের পরিদর্শনশালার মধ্যেই মানুষের মানসিক বস্তুর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়; ইহা ছাড়া নিশ্চয় অবধারণের চূড়ান্ত উপায় নাই।

কিন্তু কাজ চলিবার মতো উপায় না থাকিলে সাহিত্যে অরাজকতা উপস্থিত হইত। হাইকোর্টের আপিল-আদালতে যে জজ-আদালতের সমস্ত বিচারই পর্যস্ত হইয়া যায় তাহা নহে। সাহিত্যেও সেইরূপ জজ-আদালতের কাজ বন্ধ থাকিতে পারে না। আপিলের শেষমীমাংসা অতিদীর্ঘকালসাপেক্ষ; ততক্ষণ মোটামুটি বিচার একরকম পাওয়া যায় এবং অবিচার পাইলেও উপায় নাই।

যেমন সাহিত্যের স্বাধীন রচনায় এক একজনের প্রতিভা সর্বকালের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে, সর্বকালের আসন অধিকার করে, তেমনি বিচারের প্রতিভাও আছে; এক-একজনের পরখ করিবার শক্তিও স্বভাবতই অসামান্য হইয়া থাকে। যাহা ক্ষণিক, যাহা সংকীর্ণ, তাহা

তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে পারে না; যাহা ধ্রুব, যাহা চিরন্তন, এক মুহূর্তেই তাহা তাঁহারা চিনিতে পারেন। সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয়লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন; স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।

আবার ব্যাবসাদার বিচারকও আছে। তাহাদের পুঁথিগত বিদ্যা। তাহারা সারস্বতপ্রাসাদের দেউড়িতে বসিয়া হাঁকডাক, তর্জনগর্জন, ঘুষ ও ঘুষির কারবার করিয়া থাকে; অন্তঃপুরের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই। তাহারা অনেক সময়েই গাড়িজুড়ি ও ঘড়ির চেন দেখিয়াই ভোলে। কিন্তু বীণাপাণির অনেক অন্তঃপুরচারী আত্মীয় বিরলবেশে দীনের মতো মা'র কাছে যায় এবং তিনি তাহাদিগকে কোলে লইয়া মস্তকাঘ্রাণ করেন। তাহারা কখনো-কখনো তাঁহার শুভ্র অঞ্চলে কিছু-কিছু ধূলিক্ষেপও করে; তিনি তাহা হাসিয়া ঝাড়িয়া ফেলেন। এই-সমস্ত ধুলামাটি সত্ত্বেও দেবী যাহাদিগকে আপনার বলিয়া কোলে তুলিয়া লন দেউড়ির দরোয়ান-গুলা তাহাদিগকে চিনিবে কোন্ লক্ষণ দেখিয়া? তাহারা পোষাক চেনে, তাহারা মানুষ চেনে না। তাহারা উৎপাত করিতে পারে, কিন্তু বিচার করিবার ভার তাহাদের উপর নাই। সারস্বতদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার ভার যাঁহাদের উপরে আছে তাঁহারাও নিজে সরস্বতীর সন্তান; তাঁহারা ঘরের লোক, ঘরের লোকের মর্যাদা বোঝেন।

আশ্বিন ১৩১০

সৌন্দর্যবোধ

প্রথম-বয়সে ব্রহ্মচর্যপালন করিয়া নিয়মে সংযমে জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, ভারতবর্ষের এই প্রাচীন উপদেশের কথা তুলিতে গেলে অনেকের মনে এই তর্ক উঠিবে, এ যে বড়ো কঠোর সাধনা। ইহার দ্বারা নাহয় খুব একটা শক্ত মানুষ তৈরি করিয়া তুলিলে, নাহয় বাসনার দড়িদড়া ছিঁড়িয়া মস্ত একজন সাধুপুরুষ হইয়া উঠিলে, কিন্তু এ সাধনায় রসের স্থান কোথায়? কোথায় গেল সাহিত্য, চিত্র, সংগীত? মানুষকে যদি পূরা করিয়া তুলিতে হয় তবে সৌন্দর্যচর্চাকে ফাঁকি দেওয়া চলে না।

এ তো ঠিক কথা। সৌন্দর্য তো চাই। আত্মহত্যা তো সাধনার বিষয় হইতে পারে না, আত্মার বিকাশই সাধনার লক্ষ্য। বস্তুত শিক্ষাকালে ব্রহ্মচর্যপালন শুষ্কতার সাধনা নয়। ক্ষেত্রকে মরুভূমি করিয়া তুলিবার জন্য চাষা খাটিয়া মরে না। চাষা যখন লাঙল দিয়া মাটি বিদীর্ণ করে, মই দিয়া ঢেলা দলিয়া গুঁড়া করিতে থাকে, নিড়ানি দিয়া সমস্ত ঘাস ও গুল্ম উপড়াইয়া ক্ষেত্রটাকে একেবারে শূন্য করিয়া ফেলে, তখন আনাড়ি লোকের মনে হইতে পারে, জমিটার উপর উৎপীড়ন চলিতেছে। কিন্তু এমনি করিয়াই ফল ফলাইতে হয়। তেমনি যথার্থভাবে রসগ্রহণের অধিকারী হইতে গেলে গোড়ায় কঠিন চাষেরই দরকার। রসের পথেই পথ ভুলাইবার অনেক উপসর্গ আছে। সে পথে সমস্ত বিপদ এড়াইয়া পূর্ণতালাভ করিতে যে চায় নিয়মসংযম তাহারই বেশি আবশ্যক। রসের জন্যই এই নীরসতা স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

মানুষের দুর্ভাগ্য এই যে, উপলক্ষের দ্বারা লক্ষ্য প্রায়ই চাপা পড়ে; সে গান শিখিতে চায়, ওস্তাদি শিখিয়া বসে; ধনী হইতে চায়, টাকা জমাইয়া কৃপাপাত্র হইয়া ওঠে; দেশের হিত চায়, কমিটিতে রেজোল্যুশন পাস করিয়াই নিজেকে কৃতার্থ মনে করে।

তেমনি নিয়মসংযমটাই চরম লক্ষ্যের সমস্ত জায়গা জুড়িয়া বসিয়া আছে, এ আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। নিয়মটাকেই যাহারা লাভ, যাহারা পুণ্য মনে করে, তাহারা নিয়মের লোভে একেবারে লুব্ধ হইয়া উঠে। নিয়মলোলুপতা ষড়্‌রিপুর জায়গায় সপ্তম রিপু হইয়া দেখা দেয়।

এটা মানুষের জড়ত্বের একটা লক্ষণ। সঞ্চয় করিতে শুরু করিলে মানুষ আর থামিতে চায় না। বিলাতের কথা শুনিতে পাই, সেখানে কত লোক পাগলের মতো কেবল দেশ-বিদেশের ছাপ-মারা ডাকের টিকিট সংগ্রহ করিতেছে, সেজন্য সন্ধানের এবং খরচের অন্ত নাই। এইরূপ সংগ্রহবায়ুদ্বারা খেপিয়া উঠিয়া কেহ বা চীনের বাসন, কেহ বা পুরাতন জুতা সংগ্রহ করিয়া মরিতেছে। উত্তরমেরুর ঠিক কেন্দ্রস্থানটিতে গিয়া কোনোমতে একটা ধ্বজা পুঁতিয়া আসিতে হইবে, সেও এমনি একটা ব্যাপার। সেখানে বরফের ক্ষেত্র ছাড়া আর-কিছু নাই, কিন্তু মন নিবৃত্ত হইতেছে না— কে সেই মেরুমরুর কেন্দ্রবিন্দুটির কত মাইল কাছে যাইতেছে তাহারই অঙ্ক-পাতের নেশা পাইয়া বসিয়াছে। পাহাড়ে যে যত ফুট উচ্চে উঠিয়াছে সে ততটাকেই একটা লাভ বলিয়া গণ্য করিতেছে; এই শূন্য লাভের জন্য নিজে মরিতেছে এবং কত অনিচ্ছুক মজুরদিগকে জোর করিয়া মারিতেছে, তবু থামিতে চাহিতেছে না।

অপব্যয় এবং ক্লেশ যতই বেশি প্রয়োজনহীন, সঞ্চয় ও পরিণামহীন জয়লাভের গৌরবও তত বেশি বলিয়া বোধ হয়। নিয়মসাধনার লোভও ক্লেশের পরিমাণ খতাইয়া আনন্দভোগ করে। কঠিন শয্যায় শুইয়া যদি শুরু করা যায় তবে মাটিতে বিছানা পাতিয়া, পরে একখানিমাত্র কম্বল বিছাইয়া, পরে কম্বল ছাড়িয়া শুধু মাটিতে শুইবার লোভ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে থাকে। কৃচ্ছ্রসাধনটাকেই লাভ মনে করিয়া শেষকালে আত্মঘাতে আসিয়া দাঁড়ি টানিতে হয়। ইহা আর-কিছু নয়, নিবৃত্তিকেই একটা প্রচণ্ড প্রবৃত্তি করিয়া তোলা, গলার ফাঁস ছিঁড়িবার চেষ্টাতেই গলায় ফাঁস

আঁটিয়া মরা।

অতএব কেবলমাত্র নিয়ম পালন করাটাকেই যদি লোভের জিনিস করিয়া তোলা যায় তবে কঠোরতার চাপ কেবলই বাড়াইয়া তুলিয়া স্বভাব হইতে সৌন্দর্যবোধকে একেবারে পিষিয়া বাহির করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ণতালাভের প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়া সংযমচর্চাকেও যদি ঠিক-মত সংযত করিয়া রাখিতে পারি তবে মনুষ্যত্বের কোনো উপাদানই আঘাত পায় না, বরঞ্চ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

কথাটা এই যে, ভিত-মাত্রই শক্ত হইয়া থাকে, না হইলে তাহা আশ্রয় দিতে পারে না। যা-কিছু ধারণ করিয়া থাকে, যাহা আকৃতিদান করে, তাহা কঠিন। মানুষের শরীর যতই নরম হোক-না কেন, যদি শক্ত হাড়ের উপরে তাহার পত্তন না হইত তবে সে একটা পিণ্ড হইয়া থাকিত, তাহার চেহারা খুলিতই না। তেমনি জ্ঞানের ভিত্তিটাও শক্ত,আনন্দের ভিত্তিটাও শক্ত। জ্ঞানের ভিত্তি যদি শক্ত না হইত তবে তো সে কেবল খাপছাড়া স্বপ্ন হইত, আর আনন্দের ভিত্তি যদি শক্ত না হইত তবে তাহা নিতান্তই পাগলামি মাৎলামি হইয়া উঠিত।

এই-যে শক্ত ভিত্তি ইহাই সংযম। ইহার মধ্যে বিচার আছে, বল আছে, ত্যাগ আছে; ইহার মধ্যে নির্মম দৃঢ়তা আছে। ইহা দেবতার মতো এক হাতে বর দেয়, আর-এক হাতে সংহার করে। এই সংযম গড়িবার বেলাও যেমন দৃঢ় ভাঙিবার বেলাও তেমনি কঠিন। সৌন্দর্যকে পূরামাত্রায় ভোগ করিতে গেলে এই সংযমের প্রয়োজন; নতুবা প্রবৃত্তি অসংযত থাকিলে শিশু ভাতের থালা লইয়া যেমন অন্নব্যঞ্জন কেবল গায়ে মাখিয়া মাটিতে ছড়াইয়া বিপরীত কাণ্ড করিয়া তোলে, অথচ অল্পই তাহার পেটে যায়, ভোগের সামগ্রী লইয়া আমাদের সেই দশা হয়; আমরা কেবল তাহা গায়েই মাখি, লাভ করিতে পারি না।

সৌন্দর্যসৃষ্টি করাও অসংযত কল্পনাবৃত্তির কর্ম নহে। সমস্ত ঘরে

আগুন লাগাইয়া দিয়া কেহ সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায় না। একটুতেই আগুন হাতের বাহির হইয়া যায় বলিয়াই ঘর আলো করিতে আগুনের উপরে দখল রাখা চাই। প্রবৃত্তি-সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। প্রবৃত্তিকে যদি একে-বারে পুরামাত্রায় জ্বলিয়া উঠিতে দিই তবে যে সৌন্দর্যকে কেবল রাঙাইয়া তুলিবার জন্য তাহার প্রয়োজন তাহাকে জ্বালাইয়া ছাই করিয়া তবে সে ছাড়ে; ফুলকে তুলিতে গিয়া তাহাকে ছিঁড়িয়া ধুলায় লুটাইয়া দেয়।

এ কথা সত্য, সংসারে আমাদের ক্ষুধিত প্রবৃত্তি যেখানে পাত পাড়িয়া বসে তাহার কাছাকাছি প্রায়ই একটা সৌন্দর্যের আয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়। ফল যে কেবল আমাদের পেট ভরায় তাহা নহে, তাহা স্বাদে গন্ধে দৃশ্যে সুন্দর। কিছুমাত্র সুন্দর যদি নাও হইত তবু আমরা তাহাকে পেটের দায়েই খাইতাম। আমাদের এতবড়ো একটা গরজ থাকা সত্ত্বেও কেবল পেট ভরাইবার দিক হইতে নয়, সৌন্দর্যভোগের দিক হইতেও সে আমাদিগকে আনন্দ দিতেছে। এটা আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত লাভ।

জগতে সৌন্দর্য বলিয়া এই-যে আমাদের একটা উপরি-পাওনা ইহা আমাদের মনকে কোন্ দিকে চালাইতেছে? ক্ষুধাতৃপ্তির ঝোঁকটাই যাহাতে একেশ্বর হইয়া না ওঠে, যাহাতে আমাদের মন হইতে তাহার ফাঁস একটু আলগা হয়, সৌন্দর্যের সেই চেষ্টা দেখিতে পাই। চণ্ডী ক্ষুধা অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিতেছে, তোমাকে খাইতেই হইবে— ইহার উপরে আর কোনো কথা নাই। অমনি সৌন্দর্যলক্ষ্মী হাসিমুখে সুধাবর্ষণ করিয়া অত্যুগ্র প্রয়োজনের চোখ-রাঙানিকে আড়াল করিয়া দিতেছেন, পেটের জ্বালাকে নীচের তলায় রাখিয়া উপরের মহালে আনন্দভোজের মনোহর আয়োজন করিতেছেন। অনিবার্য প্রয়োজনের মধ্যে মানুষের একটা অবমাননা আছে; কিন্তু সৌন্দর্য নাকি প্রয়োজনের বাড়া, এইজন্য সে আমাদের অপমান দূর করিয়া দেয়। সৌন্দর্য আমাদের ক্ষুধাতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই

সর্বদা একটা উচ্চতর সুর লাগাইতেছে বলিয়াই, যাহারা একদিন অসংযত বর্বর ছিল তাহারা আজ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, যে কেবল ইন্দ্রিয়েরই দোহাই মানিত সে আজ প্রেমের বশ মানিয়াছে। আজ ক্ষুধা লাগিলেও আমরা পশুর মতো, রাক্ষসের মতো, যেমন-তেমন করিয়া খাইতে বসিতে পারি না; শোভনতাটুকু রক্ষা না করিলে আমাদের খাইবার প্রবৃত্তিই চলিয়া যায়। অতএব এখন আমাদের খাইবার প্রবৃত্তিই একমাত্র নহে, শোভনতা তাহাকে নরম করিয়া আনিয়াছে। আমরা ছেলেকে লজ্জা দিয়া বলি, ছি ছি, অমন লোভীর মতো খাইতে আছে! সেরূপ খাওয়া দেখিতে কুশ্রী। সৌন্দর্য আমাদের প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া আনিয়াছে। জগতের সঙ্গে আমাদের কেবলমাত্র প্রয়োজনের সম্বন্ধ না রাখিয়া আনন্দের সম্বন্ধ পাতাইয়াছে। প্রয়োজনের সম্বন্ধে আমাদের দৈন্য, আমাদের দাসত্ব; আনন্দের সম্বন্ধেই আমাদের মুক্তি।

তবেই দেখা যাইতেছে, পরিণামে সৌন্দর্য মানুষকে সংযমের দিকেই টানিতেছে। মানুষকে সে এমন একটি অমৃত দিতেছে যাহা পান করিয়া মানুষ ক্ষুধার রূঢ়তাকে দিনে দিনে জয় করিতেছে। অসংযমকে অমঙ্গল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে যাহার মনে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় সে তাহাকে অসুন্দর বলিয়া ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিতে চাহিতেছে।

সৌন্দর্য যেমন আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে শোভনতার দিকে, সংযমের দিকে, আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে, সংযমও তেমনি আমাদের সৌন্দর্য-ভোগের গভীরতা বাড়াইয়া দিতেছে। স্তব্ধভাবে নিবিষ্ট হইতে না জানিলে আমরা সৌন্দর্যের মর্মস্থান হইতে রস উদ্ধার করিতে পারি না। একপরায়ণা সতী স্ত্রীই তো প্রেমের যথার্থ সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে পারে, স্বৈরিণী তো পারে না। সতীত্ব সেই চাঞ্চল্যবিহীন সংযম যাহার দ্বারা গভীরভাবে প্রেমের নিগূঢ় রস লাভ করা সম্ভব হয়। আমাদের সৌন্দর্য-প্রিয়তার মধ্যেও যদি সেই সতীত্বের সংযম না থাকে তবে কী হয়? সে

কেবলই সৌন্দর্যের বাহিরে বাহিরে চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায় ; মত্ততাকেই আনন্দ বলিয়া ভুল করে ; যাহাকে পাইলে সে একেবারে সব ছাড়িয়া স্থির হইয়া বসিতে পারিত তাহাকে পায় না। যথার্থ সৌন্দর্য সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ, লোলুপ ভোগীর কাছে নহে। যে লোক পেটুক সে ভোজনের রসজ্ঞ হইতে পারে না।

পৌষ্যরাজা ঋষিকুমার উতঙ্ককে কহিলেন, যাও, অন্তঃপুরে যাও, সেখানে মহিষীকে দেখিতে পাইবে। উতঙ্ক অন্তঃপুরে গেলেন, কিন্তু মহিষীকে দেখিতে পাইলেন না। অশুচি হইয়া কেহ সতীকে দেখিতে পাইত না ; উতঙ্ক তখন অশুচি ছিলেন।

বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের সমস্ত মহিমার অন্তঃপুরে যে সতীলক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন তিনিও আমাদের সম্মুখেই আছেন, কিন্তু শুচি না হইলে দেখিতে পাইব না। যখন বিলাসে হাবুডুবু খাই, ভোগের নেশায় মাতিয়া বেড়াই, তখন বিশ্বজগতের আলোকবসনা সতীলক্ষ্মী আমাদের দৃষ্টি হইতে অন্তর্ধান করেন।

এ কথা ধর্মনীতিপ্রচারের দিক হইতে বলিতেছি না ; আনন্দের দিক হইতে, যাহাকে ইংরেজিতে আর্ট্‌ বলে তাহারই তরফ হইতে বলিতেছি। আমাদের শাস্ত্রেও বলে, কেবল ধর্মের জন্য নয়, সুখের জন্যও সংযত হইবে। সুখার্থী সংযতো ভবেৎ। অর্থাৎ, ইচ্ছার যদি চরিতার্থতা চাও তবে ইচ্ছাকে শাসনে রাখো, যদি সৌন্দর্যভোগ করিতে চাও তবে ভোগলালসাকে দমন করিয়া শুচি হইয়া শান্ত হও। প্রবৃত্তিকে যদি দমন করিতে না জানি তবে প্রবৃত্তিরই চরিতার্থতাকে আমরা সৌন্দর্যবোধের চরিতার্থতা বলিয়া ভুল করি, যাহা চিত্তের জিনিস তাহাকে দুই হাতে করিয়া দলিয়া মনে করি যেন তাহাকে পাইলাম। এইজন্যই বলিয়াছি, সৌন্দর্যবোধ ঠিকমত -উদ্‌বোধনের জন্য ব্রহ্মচর্যের সাধনই আবশ্যক।

যাঁহাদের চোখে ধুলা দেওয়া শক্ত তাঁহারা হঠাৎ সন্দিগ্ধ হইয়া বলিয়া

উঠিবেন, এ যে একেবারে কবিত্ব আসিয়া পড়িল। তাঁহারা বলিবেন, সংসারে তো আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, যে-সকল কলাকুশল গুণী সৌন্দর্যসৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা অনেকেই সংযমের দৃষ্টান্ত রাখিয়া যান নাই। তাঁহাদের জীবনচরিতটা পাঠ্য নহে।

অতএব কবিত্ব রাখিয়া এই বাস্তব সত্যটার আলোচনা করা দরকার।

আমার বক্তব্য এই যে, বাস্তবকে আমরা এত বেশি বিশ্বাস করি কেন? কারণ, সে প্রত্যক্ষগোচর। কিন্তু অনেক স্থলেই মানুষের সম্বন্ধে আমরা যাহাকে বাস্তব বলি তাহার বেশির ভাগই আমাদের অপ্রত্যক্ষ। একটুখানি দেখিতে পাই বলিয়া মনে করি সবটাই যেন দেখিতে পাইলাম, এইজন্য মানুষ-ঘটিত বাস্তব বৃত্তান্ত লইয়া একজন যাহা'ক সাদা বলে আর-একজন তাহাকে মেটে বলিলেও বাঁচিতাম, তাহাকে একেবারে কালো বলিয়া বসে। নেপোলিয়নকে কেহ বলে দেবতা, কেহ বলে দানব। আকবরকে কেহ বলে উদার প্রজাহিতৈষী, কেহ বলে তাঁহার হিন্দুপ্রজার পক্ষে তিনিই যত নষ্টের গোড়া। কেহ বলেন বর্ণভেদেই আমাদের হিন্দু-সমাজ রক্ষা করিয়াছে, কেহ বলে বর্ণভেদের প্রথাই আমাদিগকে একেবারে মাটি করিয়া দিল। অথচ উভয় পক্ষেই বাস্তব সত্যের দোহাই দেয়।

বস্তুত মানুষ-ঘটিত ব্যাপারে একই জায়গায় আমরা অনেক উল্টা কাণ্ড দেখিতে পাই। মানুষের দেখা-অংশের মধ্যে যে-সকল বৈপরীত্য প্রকাশ পায় মানুষের না-দেখা অংশের মধ্যেই নিশ্চয় তাহার একটা নিগূঢ় সমন্বয় আছে; অতএব আসল সত্যটা যে প্রত্যক্ষের উপরেই ভাসিয়া বেড়াইতেছে তাহা নহে, অপ্রত্যক্ষের মধ্যেই ডুবিয়া আছে—এইজন্যই তাহাকে লইয়া এত তর্ক, এত দলাদলি এবং এইজন্যই একই ইতিহাসকে দুই বিরুদ্ধ পক্ষে ওকালৎনামা দিয়া থাকে।

জগতের কলানিপুণ গুণীদের সম্বন্ধেও যেখানে আমরা উল্টা কাণ্ড দেখিতে পাই সেখানেও বাস্তব সত্যের বড়াই করিয়া হঠাৎ কিছু বিরুদ্ধ

কথা বলিয়া বসা যায় না। সৌন্দর্যসৃষ্টি দুর্বলতা হইতে, চঞ্চলতা হইতে অসংযম হইতে ঘটিতেছে, এটা যে একটা অত্যন্ত বিরুদ্ধ কথা। বাস্তব সত্য সাক্ষ্য দিলেও আমরা বলিব, নিশ্চয় সকল সাক্ষীকে হাজির পাওয়া যায় নাই; আসল সাক্ষীটি পালাইয়া বসিয়া আছে। যদি দেখি কোনো ডাকাতের দল খুবই উন্নতি করিতেছে তবে সেই বাস্তব সত্যের সহায়ে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, দস্যুবৃত্তিই উন্নতির উপায়। তখন এই কথা বিনা প্রমাণেই বলা যাইতে পারে যে, দস্যুদের আপাতত যেটুকু উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহার মূল কারণ নিজেদের মধ্যে ঐক্য, অর্থাৎ দলের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ধর্মরক্ষা; আবার এই উন্নতি যখন নষ্ট হইবে তখন এই ঐক্যকেই নষ্ট হইবার কারণ বলিয়া বসিব না তখন বলিব অন্যের প্রতি অধর্মাচরণই তাহাদের পতনের কারণ। যদি দেখি একই লোক বাণিজ্যে প্রচুর টাকা করিয়া ভোগে তাহা উড়াইয়া দিয়াছেন তবে এ কথা বলিব না যে, যাহারা টাকা নষ্ট করিতে পারে টাকা উপার্জনের পন্থা তাহারাই জানে; বরং এই কথাই বলিব, টাকা রোজগার করিবার ব্যাপারে এই লোকটি হিসাবী ছিলেন, সেখানে তাঁর সংযম ও বিবেচনা-শক্তি সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক বেশি ছিল, আর টাকা উড়াইবার বেলা তাঁহার উড়াইবার ঝোঁক হিসাবের বুদ্ধিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

কলাবান্ গুণীরাও যেখানে বস্তুত গুণী সেখানে তাঁহারা তপস্বী; সেখানে যথেচ্ছাচার চলিতে পারে না, সেখানে চিত্তের সাধন ও সংযম আছেই। অল্প লোকই এমন পুরাপুরি বলিষ্ঠ যে তাঁহাদের ধর্মবোধকে ষোলো আনা কাজে লাগাইতে পারেন। কিছু-না-কিছু ভ্রষ্টতা আসিয়া পড়ে। কারণ, আমরা সকলেই হীনতা হইতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি, চরমে আসিয়া দাঁড়াই নাই। কিন্তু জীবনে আমরা যে-কোনো স্থায়ী বড়ো জিনিস গড়িয়া তুলি, তাহা আমাদের অন্তরের ধর্মবুদ্ধির সাহায্যেই ঘটে, ভ্রষ্টতার সাহায্যে নহে। গুণী ব্যক্তিরাও যেখানে তাঁহাদের কলারচনা স্থাপন

করিয়াছেন সেখানে তাঁহাদের চরিত্রই দেখাইয়াছেন, যেখানে তাঁহাদের জীবনকে নষ্ট করিয়াছেন সেখানে চরিত্রের অভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সেখানে, তাঁহাদের মনের ভিতরে ধর্মের যে একটি সুন্দর আদর্শ আছে রিপুর টানে তাহার বিরুদ্ধে গিয়া পীড়িত হইয়াছেন। গড়িয়া তুলিতে সংযম দরকার হয়, নষ্ট করিতে অসংযম। ধারণা করিতে সংযম চাই, আর মিথ্যা বুঝিতেই অসংযম।

এখানে কথা উঠিবে, তবেই তো একই মানুষের মধ্যে সৌন্দর্য-বিকাশের ক্ষমতা ও চরিত্রের অসংযম একত্রই থাকিতে পারে, তবে তো দেখি বাঘে গোরুতে এক ঘাটেই জল খায়।

বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায় না বটে, কিন্তু সে কখন ? যখন বাঘও পূর্ণতা পাইয়া উঠিয়াছে, গোরুও পূর্ণ গোরু হইয়াছে। শিশু অবস্থায় উভয়ে একসঙ্গে খেলা করিতে পারে ; বড়ো হইলে বাঘও ঝাঁপ দিয়া পড়ে, গোরুও দৌড় দিতে চেষ্টা করে।

তেমনি সৌন্দর্যবোধের যথার্থ পরিণতভাব কখনোই প্রবৃত্তির বিক্ষোভ চিত্তের অসংযমের সঙ্গে এক ক্ষেত্রে টিঁকিতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের বিরোধী।

যদি বল কেন বিরোধী, তাহার কারণ আছে। বিশ্বামিত্র বিধাতার সঙ্গে আড়াআড়ি করিয়া একটা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেটা তাঁহার ক্রোধের সৃষ্টি, দম্ভের সৃষ্টি ; সুতরাং সেই জগৎ বিধাতার জগতের সঙ্গে মিশ খাইল না, তাহাকে স্পর্ধা করিয়া আঘাত করিতে লাগিল, খাপছাড়া সৃষ্টিছাড়া হইয়া রহিল, চরাচরের সঙ্গে সুর মিলাইতে পারিল না— অবশেষে পীড়া দিয়া পীড়া পাইয়া সেটা মরিল।

আমাদের প্রবৃত্তি উগ্র হইয়া উঠিলে বিধাতার জগতের বিরুদ্ধে নিজে যেন সৃষ্টি করিতে থাকে। তখন চারি দিকের সঙ্গে তাহার আর মিল খায় না। আমাদের ক্রোধ, আমাদের লোভ নিজের চারি দিকে এমন-সকল

বিকার উৎপাদন করে যাহাতে ছোটোই বড়ো হইয়া উঠে, বড়োই ছোটো হইয়া যায়; যাহা ক্ষণকালের তাহাকেই চিরকালের বলিয়া মনে হয়, যাহা চিরকালের তাহা চোখেই পড়ে না। যাহার প্রতি আমাদের লোভ জন্মে তাহাকে আমরা এমনি অসত্য করিয়া গড়িয়া তুলি যে, জগতের বড়ো বড়ো সত্যকে সে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়, চন্দ্রসূর্যতারাকে সে ম্লান করিয়া দেয়। ইহাতে আমাদের সৃষ্টি বিধাতার সঙ্গে বিরোধ করিতে থাকে।

মনে করো নদী চলিতেছে; তাহার প্রত্যেক ঢেউ স্বতন্ত্র হইয়া মাথা তুলিলেও তাহারা সকলে মিলিয়া সেই এক সমুদ্রের দিকে গান করিতে করিতে চলিতেছে। কেহ কাহাকেও বাধা দিতেছে না। কিন্তু ইহার মধ্যে যদি কোথাও পাক পড়িয়া যায় তবে সেই ঘূর্ণা এক জায়গাতেই দাঁড়াইয়া উন্মত্তের মতো ঘুরিতে থাকে, চলিবার বাধা দিয়া ডুবাইবার চেষ্টা করে; সমস্ত নদীর যে গতি, যে অভিপ্রায়, তাহাতে ব্যাঘাত জন্মাইয়া সে স্থিরত্বও লাভ করে না, অগ্রসর হইতেও পারে না।

আমাদের কোনো-একটা প্রবৃত্তি উন্মত্ত হইয়া উঠিলে সেও আমাদিগকে নিখিলের প্রবাহ হইতে টানিয়া লইয়া একটা বিন্দুর উপরেই ঘুরাইয়া মারিতে থাকে। আমাদের চিত্ত সেই একটা কেন্দ্রের চারি দিকেই বাঁধা পড়িয়া তাহার মধ্যে আপনার সমস্ত বিসর্জন করিতে ও অন্যের সমস্ত নষ্ট করিতে চায়। এই উন্মত্ততার মধ্যে এক দল লোক এক রকমের সৌন্দর্য দেখে। এমন-কি, আমার মনে হয় য়ুরোপীয় সাহিত্যে এই পাক-খাওয়া প্রবৃত্তির ঘূর্ণিনৃত্যের প্রলয়োৎসব, যাহার কোনো পরিণাম নাই, যাহার কোথাও শান্তি নাই, তাহাতেই যেন বেশি সুখ পাইয়াছে। কিন্তু ইহাকে আমরা শিক্ষার সম্পূর্ণতা বলিতে পারি না, ইহা স্বভাবের বিকৃতি। সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে দেখিলে যাহাকে হঠাৎ মনোহর বলিয়া বোধ হয় নিখিলের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই তাহার সৌন্দর্যের বিরোধ চোখে ধরা পড়ে। মদের বৈঠকে মাতাল জগৎ-সংসারকে ভুলিয়া গিয়া নিজেদের সভাকে

বৈকুণ্ঠপুরী বলিয়া মনে করে, কিন্তু অপ্রমত্ত দর্শক চারি দিকের সংসারের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই তাহার বীভৎসতা বুঝিতে পারে। আমাদের প্রবৃত্তিরও উৎপাত যখন ঘটে তখন সে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তিলাভ করিলেও বৃহৎ বিশ্বের মাঝখানে তাহাকে ধরিয়া দেখিলেই তাহার কুশ্রীতা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এমনি করিয়া স্থিরভাবে যে ব্যক্তি বড়োর সঙ্গে ছোটোকে, সমগ্রের সঙ্গে প্রত্যেককে মিলাইয়া দেখিতে না জানে, সে উত্তেজনাকেই আনন্দ ও বিকৃতিকেই সৌন্দর্য বলিয়া ভ্রম করে। এইজন্যই সৌন্দর্যবোধকে পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইলে চিত্তের শান্তি চাই ; তাহা অসংযমের দ্বারা হইবার জো নাই।

সৌন্দর্যবোধের সম্পূর্ণতা কোন্ দিকে চলিয়াছে তাহাই দেখা যাক।

ইহা দেখা গেছে, বর্বরজাতি যাহাকে সুন্দর বলিয়া আদর করে সভ্য-জাতি তাহাকে দূরে ফেলিয়া দেয়। ইহার প্রধান কারণ, বর্বরের মন যেটুকু ক্ষেত্রের মধ্যে আছে সভ্য লোকের মন সেটুকু ক্ষেত্রের মধ্যে নাই। ভিতরে ও বাহিরে, দেশে ও কালে সভ্যজাতির জগৎটাই যে বড়ো এবং তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অত্যন্ত বিচিত্র। এইজন্যই বর্বরের জগতে ও সভ্যের জগতে বস্তুর মাপ এবং ওজন এক হইতেই পারে না।

ছবি সম্বন্ধে যে ব্যক্তি আনাড়ি সে একটা পটের উপরে খুব খানিকটা রঙচঙ বা গোলগাল আকৃতি দেখিলেই খুশি হইয়া ওঠে। ছবিকে সে বড়ো ক্ষেত্রে রাখিয়া দেখিতেছে না। এখানে তাহার ইন্দ্রিয়ের রাশ টানিয়া ধরিবে এমন কোনো উচ্চতর বিচারবুদ্ধি নাই। গোড়াতেই যাহা তাহাকে আহ্বান করে তাহারই কাছে সে আপনাকে ধরা দিয়া বসে। রাজবাড়ির দেউড়ির দরোয়ানজির চাপরাস ও চাপদাড়ি দেখিয়া তাহাকেই সর্বপ্রধান ব্যক্তি মনে করিয়া সে অভিভূত হইয়া পড়ে, দেউড়ি পার হইয়া সভায় যাইবার কোনো প্রয়োজন সে অনুভব করিতেই পারে না। কিন্তু যে লোক এতবড়ো গ্রাম্য নহে সে এত সহজে ভোলে না। সে জানে,

দরোয়ানের মহিমাটা হঠাৎ খুব বেশি করিয়া চোখে পড়ে বটে, কারণ চোখে পড়ার বেশি মহিমা যে তাহার নাই। রাজার মহিমা কেবলমাত্র চোখে পড়িবার বিষয় নহে, তাহাকে মন দিয়াও দেখিতে হয়। এইজন্য রাজার মহিমার মধ্যে একটা শক্তি শান্তি ও গাম্ভীর্য আছে।

অতএব যে ব্যক্তি সমজদার ছবিতে সে একটা রঙচঙের ঘটা দেখিলেই অভিভূত হইয়া পড়ে না। সে মুখ্যের সঙ্গে গৌণের, মাঝখানের সঙ্গে চারি পাশের, সম্মুখের সঙ্গে পিছনের একটা সামঞ্জস্য খুঁজিতে থাকে। রঙচঙে চোখ ধরা পড়ে, কিন্তু সামঞ্জস্যের সুষমা দেখিতে মনের প্রয়োজন। তাহাকে গভীরভাবে দেখিতে হয়, এইজন্য তাহার আনন্দ গভীরতর।

এই কারণে অনেক গুণী দেখা যায়, বাহিরের ক্ষুদ্র লালিত্যকে যাঁহারা আমল দিতে চান না; তাঁহাদের সৃষ্টির মধ্যে যেন একটা কঠোরতা আছে। তাঁহাদের ধ্রুপদের মধ্যে খেয়ালের তান নাই। হঠাৎ তাহার বাহিরের রিক্ততা দেখিয়া ইতর লোকে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহে; অথচ সেই নির্মল রিক্ততার গভীরতর ঐশ্বর্যই বিশিষ্ট লোকের চিত্তকে বৃহৎ আনন্দ দান করে।

তবেই দেখা যাইতেছে, শুধু চোখের দৃষ্টি নহে, তাহার পিছনে মনের দৃষ্টি যোগ না দিলে সৌন্দর্যকে বড়ো করিয়া দেখা যায় না। এই মনের দৃষ্টি লাভ করা বিশেষ শিক্ষার কর্ম।

মনেরও আবার অনেক স্তর আছে। কেবল বুদ্ধিবিচার দিয়া আমরা যতটুকু দেখিতে পাই তাহার সঙ্গে হৃদয়ভাব যোগ দিলে ক্ষেত্র আরও বাড়িয়া যায়, ধর্মবুদ্ধি যোগ দিলে আরও অনেক দূর চোখে পড়ে, অধ্যাত্ম-দৃষ্টি খুলিয়া গেলে দৃষ্টিক্ষেত্রের আর সীমা পাওয়া যায় না।

অতএব যে দেখাতে আমাদের মনের বড়ো অংশ অধিকার করে সেই দেখাতেই আমরা বেশি তৃপ্তি পাই। ফুলের সৌন্দর্যের চেয়ে মানুষের মুখ আমাদিগকে বেশি টানে, কেননা, মানুষের মুখে শুধু আকৃতির সুষমা নয়,

তাহাতে চেতনার দীপ্তি, বুদ্ধির স্ফূর্তি, হৃদয়ের লাবণ্য আছে; তাহা আমাদের চৈতন্যকে বুদ্ধিকে হৃদয়কে দখল করিয়া বসে। তাহা আমাদের কাছে শীঘ্র ফুরাইতে চায় না।

আবার মানুষের মধ্যে যাঁহারা নরোত্তম, ধরাতলে যাঁহারা ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপের প্রকাশ, তাঁহারা আমাদের মনে এতদূর পর্যন্ত টান দেন সেখানে আমরা নিজেরাই নাগাল পাই না। এইজন্য যে রাজপুত্র মানুষের দুঃখমোচনের উপায়চিন্তা করিতে রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন তাঁহার মনোহারিতা মানুষকে কত কাব্য কত চিত্র -রচনায় লাগাইয়াছে তাহার সীমা নাই।

এইখানে সন্দিগ্ধ লোকেরা বলিবেন, সৌন্দর্য হইতে যে ধর্মনীতির কথা আসিয়া পড়িল! দুটোতে ঘোলাইয়া দিবার দরকার কী? যাহা ভালো তাহা ভালো এবং যাহা সুন্দর তাহা সুন্দর। ভালো আমাদের মনকে এক রকম করিয়া টানে, সুন্দর আমাদের মনকে আর-এক রকম করিয়া টানে; উভয়ের আকর্ষণপ্রণালীর বিভিন্নতা আছে বলিয়াই ভাষায় দুটোকে দুই নাম দিয়া থাকে। যাহা ভালো তাহার প্রয়োজনীয়তা আমাদিগকে মুগ্ধ করে, আর যাহা সুন্দর তাহা যে কেন মুগ্ধ করে সে আমরা জানি না।

এ সম্বন্ধে আমার বলিবার একটা কথা এই যে, মঙ্গল আমাদের ভালো করে বলিয়াই যে তাহাকে আমরা ভালো বলি ইহা বলিলে সবটা বলা হয় না। যথার্থ যে মঙ্গল তাহা আমাদের প্রয়োজনসাধন করে এবং তাহা সুন্দর; অর্থাৎ প্রয়োজনসাধনের ঊর্ধ্বেও তাহার একটা অহেতুক আকর্ষণ আছে। নীতিপণ্ডিতেরা জগতের প্রয়োজনের দিক হইতে নীতি-উপদেশ দিয়া মঙ্গলপ্রচার করিতে চেষ্টা করেন এবং কবিরা মঙ্গলকে তাহার অনির্বচনীয় সৌন্দর্যমূর্তিতে লোকের কাছে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

বস্তুত মঙ্গল যে সুন্দর সে আমাদের প্রয়োজনসাধন করে বলিয়া নহে। ভাত আমাদের কাজে লাগে, কাপড় আমাদের কাজে লাগে, ছাতাজুতা

আমাদের কাজে লাগে ; ভাত-কাপড় ছাতা-জুতা আমাদের মনে সৌন্দর্যের পুলক সঞ্চার করে না। কিন্তু লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে সঙ্গে বনে গেলেন এই সংবাদে আমাদের মনের মধ্যে বীণার তারে যেন একটা সংগীত বাজাইয়া তোলে। ইহা সুন্দর ভাষাতেই, সুন্দর ছন্দেই, সুন্দর করিয়া সাজাইয়া স্থায়ী করিয়া রাখিবার বিষয়। ছোটো ভাই বড়ো ভাইয়ের সেবা করিলে সমাজের হিত হয় বলিয়া যে এ কথা বলিতেছি তাহা নহে, ইহা সুন্দর বলিয়াই। কেন সুন্দর ? কারণ, মঙ্গলমাত্রেরই সমস্ত জগতের সঙ্গে একটা গভীরতম সামঞ্জস্য আছে, সকল মানুষের মনের সঙ্গে তাহার নিগূঢ় মিল আছে। সত্যের সঙ্গে মঙ্গলের সেই পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেই তাহার সৌন্দর্য আর আমাদের অগোচর থাকে না। করুণা সুন্দর, ক্ষমা সুন্দর, প্রেম সুন্দর ; শতদল পদ্মের সঙ্গে, পূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় ; শতদল পদ্মের মতো, পূর্ণিমার চাঁদের মতো নিজের মধ্যে এবং চারি দিকের জগতের মধ্যে তাহার একটি বিরোধহীন সুষমা আছে ; সে নিখিলের অনুকূল এবং নিখিল তাহার অনুকূল। আমাদের পুরাণে লক্ষ্মী কেবল সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্যের দেবী নহেন, তিনি মঙ্গলের দেবী। সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ।

সৌন্দর্যে ও মঙ্গলে যে জায়গায় মিল আছে সে জায়গাটা বিচার করিয়া দেখা যাক।

আমরা প্রথমে দেখাইয়াছি, সৌন্দর্য প্রয়োজনের বাড়া। এইজন্য তাহাকে আমরা ঐশ্বর্য বলিয়া মানি। এইজন্য তাহা আমাদিগকে নিছক স্বার্থসাধনের দারিদ্র্য হইতে প্রেমের মধ্যে মুক্তি দেয়।

মঙ্গলের মধ্যে আমরা সেই ঐশ্বর্য দেখি। যখন দেখি, কোনো বীরপুরুষ ধর্মের জন্য স্বার্থ ছাড়িয়াছেন, প্রাণ দিয়াছেন, তখন এমন একটা আশ্চর্য পদার্থ আমাদের চোখে পড়ে যাহা আমাদের সুখদুঃখের চেয়ে বেশি, আমাদের স্বার্থের চেয়ে বড়ো, আমাদের প্রাণের চেয়ে মহৎ। মঙ্গল নিজের

এই ঐশ্বর্যের জোরে ক্ষতি ও ক্লেশকে ক্ষতি ও ক্লেশ বলিয়া গণ্যই করে না। স্বার্থের ক্ষতিতে তাহার ক্ষতি হইবার জো নাই। এইজন্য সৌন্দর্য যেমন আমাদিগকে স্বেচ্ছাকৃত ত্যাগে প্রবৃত্ত করে, মঙ্গলও সেইরূপ করে। সৌন্দর্যও জগদ্‌ব্যাপারের মধ্যে ঈশ্বরের ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করে, মঙ্গলও মানুষের জীবনের মধ্যে তাহাই করিয়া থাকে। মঙ্গল, সৌন্দর্যকে শুধু চোখের দেখা নয়, শুধু বুদ্ধির বোঝা নয়, তাহাকে আরও ব্যাপক আরও গভীর করিয়া মানুষের কাছে আনিয়া দিয়াছে; তাহা ঈশ্বরের সামগ্রীকে অত্যন্তই মানুষের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুত মঙ্গল মানুষের নিকটবর্তী অন্তরতম সৌন্দর্য; এইজন্যই তাহাকে আমরা অনেক সময় সহজে সুন্দর বলিয়া বুঝিতে পারি না, কিন্তু যখন বুঝি তখন আমাদের প্রাণ বর্ষার নদীর মতো ভরিয়া উঠে। তখন আমরা তাহার চেয়ে রমণীয় আর-কিছুই দেখি না।

ফুল পাতা, প্রদীপের মালা এবং সোনারুপার থালি দিয়া যদি ভোজের জায়গা সাজাইতে পারো সে তো ভালোই; কিন্তু নিমন্ত্রিত যদি যজ্ঞকর্তার কাছ হইতে সমাদর না পায়, হৃদ্যতা না পায়, তবে সে-সমস্ত ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য তাহার কাছে রোচে না— কারণ, এই হৃদ্যতাই অন্তরের ঐশ্বর্য, অন্তরের প্রাচুর্য। হৃদ্যতার মিষ্টহাস্য মিষ্টবাক্য মিষ্টব্যবহার এমন সুন্দর যে তাহা কলার পাতাকেও সোনার থালার চেয়ে বেশি মূল্য দেয়। সকলের কাছেই যে দেয় এ কথাও বলিতে পারি না। বহু-আড়ম্বরের ভোজে অপমান স্বীকার করিয়াও প্রবেশ করিতে প্রস্তুত এমন লোকও অনেক দেখা যায়। কেন দেখা যায়? কারণ, ভোজের বড়ো-তাৎপর্য বৃহৎ-সৌন্দর্য সে বোঝে না। বস্তুত খাওয়াটা বা সজ্জাটাই ভোজের প্রধান অঙ্গ নহে। কুঁড়ির পাপড়িগুলি যেমন নিজের মধ্যেই কুঞ্চিত তেমনি স্বার্থরত মানুষের শক্তি নিজের দিকেই চিরদিন সংকুচিত, একদিন তাহার বাঁধন ঢিলা করিয়া তাহাকে পরাভিমুখ করিবামাত্র ফোটা ফুলের মতো বিশ্বের দিকে

তাহার মিলনমাধুর্যময় অতি সুন্দর বিস্তার ঘটে; যজ্ঞের সেই ভিতর-দিকটার গভীরতর মঙ্গলসৌন্দর্য যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ দেখিতে পায় না তাহার কাছে ভোজ্যপেয়ের প্রাচুর্য ও সাজসজ্জার আড়ম্বরই বড়ো হইয়া উঠে। তাহার অসংযত প্রবৃত্তি, তাহার দানদক্ষিণা-পানভোজনের অতিমাত্র লোভ, যজ্ঞের উদার মাধুর্যকে ভালো করিয়া দেখিতে দেয় না।

শাস্ত্র বলে: শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। ক্ষমাই শক্তিমানের ভূষণ। কিন্তু ক্ষমাপ্রকাশের মধ্যেই শক্তির সৌন্দর্য -অনুভব তো সকলের কর্ম নহে। বরঞ্চ সাধারণ মূঢ় লোকেরা শক্তির উপদ্রব দেখিলেই তাহার প্রতি শ্রদ্ধা-বোধ করে। লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ। কিন্তু সাজসজ্জার চেয়ে এই লজ্জার সৌন্দর্য কে দেখিতে পায়? যে ব্যক্তি সৌন্দর্যকে সংকীর্ণ করিয়া দেখে না। সংকীর্ণ প্রকাশের তরঙ্গভঙ্গ যখন বিস্তীর্ণ প্রকাশের মধ্যে শান্ত হইয়া গেছে তখন সেই বড়ো সৌন্দর্যকে দেখিতে হইলে উচ্চভূমি হইতে প্রশস্তভাবে দেখা চাই। তেমন করিয়া দেখার জন্য মানুষের শিক্ষা চাই, গাম্ভীর্য চাই, অন্তরের শান্তি চাই।

আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা গর্ভিণী নারীর সৌন্দর্যবর্ণনায় কোথাও কুণ্ঠাপ্রকাশ করেন নাই। য়ুরোপের কবি এখানে একটা লজ্জা ও দীনতা বোধ করেন। বস্তুত গর্ভিণী রমণীর যে কান্তি সেটাতে চোখের উৎসব তেমন নাই। নারীত্বের চরম সার্থকতালাভ যখন আসন্ন হইয়া আসে তখন তাহারই প্রতীক্ষা নারীমূর্তিকে গৌরবে ভরিয়া তোলে। এই দৃশ্যে চোখের বিলাসে যেটুকু কম পড়ে মনের ভক্তিতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পূরণ করিয়া দেয়। সমস্ত বৃষ্টি ঝরিয়া পড়িয়া শরতের যে হাল্কা মেঘ বিনা কারণে গায়ে হাওয়া লাগাইয়া উড়িয়া বেড়ায় তাহার উপরে যখন অস্ত-সূর্যের আলো পড়ে তখন রঙের ছটায় চোখ ধাঁদিয়া যায়। কিন্তু আষাঢ়ের যে নূতন ঘনমেঘ পয়স্বিনী কালো গাভীটির মতো আসন্ন বৃষ্টির ভারে একেবারে মন্থর হইয়া পড়িয়াছে, যাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজলতার মধ্যে বর্ণ-

বৈচিত্র্যের চাপল্য কোথাও নাই, সে আমাদের মনকে চারি দিক হইতে এমন করিয়া ঘনাইয়া ধরে যে কোথাও যেন কিছু ফাঁক রাখে না। ধরণীর তাপশান্তি, শস্যক্ষেত্রের দৈন্যনিবৃত্তি, নদীসরোবরের কৃশতা-মোচনের উদার আশ্বাস তাহার স্নিগ্ধ নীলিমার মধ্যে যে মাখানো; মঙ্গলময় পরিপূর্ণতার গম্ভীর মাধুর্যে সে স্তব্ধ হইয়া থাকে। কালিদাস তো বসন্তের বাতাসকে বিরহী যক্ষের দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করিতে পারিতেন। এ কার্যে তাহার হাত-যশ আছে বলিয়া লোকে রটনা করে; বিশেষত উত্তরে যাইতে হইলে দক্ষিনা-বাতাসকে কিছুমাত্র উজানে যাইতে হইত না। কিন্তু কবি প্রথম আষাঢ়ের নূতন মেঘকেই পছন্দ করিলেন; সে যে জগতের তাপ নিবারণ করে, সে কি শুধু প্রণয়ীর বার্তা প্রণয়িনীর কানের কাছে প্রলপিত করিবে? সে যে সমস্ত পথটার নদীগিরিকাননের উপর বিচিত্র পূর্ণতার সঞ্চার করিতে করিতে যাইবে। কদম্ব ফুটিবে, জম্বুকুঞ্জ ভরিয়া উঠিবে, বলাকা উড়িয়া চলিবে, ভরা নদীর জল ছল্‌ছল্‌ করিয়া তাহার কূলের বেত্রবনে আসিয়া ঠেকিবে এবং জনপদবধূর ভ্রূবিলাসহীন প্রীতিস্নিগ্ধ লোচনের দৃষ্টিপাতে আষাঢ়ের আকাশ যেন আরও জুড়াইয়া যাইবে। বিরহীর বার্তাপ্রেরণকে সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলব্যাপারের সঙ্গে পদে পদে গাঁথিয়া গাঁথিয়া তবে কবির সৌন্দর্যরসপিপাসু চিত্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছে।

কুমারসম্ভবের কবি অকালবসন্তের আকস্মিক উৎসবে পুষ্পশরের মোহ-বর্ষণের মধ্যে হরপার্বতীর মিলনকে চূড়ান্ত করিয়া তোলেন নাই। স্ত্রীপুরুষের উন্মত্ত সংঘাত হইতে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল সেই প্রলয়াগ্নিতে আগে তিনি শান্তিধারা বর্ষণ করিয়াছেন, তবে তো মিলনের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন। কবি গৌরীর প্রেমের সর্বাপেক্ষা কমনীয় মূর্তি তপস্যার অগ্নির দ্বারাই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন। সেখানে বসন্তের পুষ্পসম্পদ ম্লান, কোকিলের মুখরতা স্তব্ধ। অভিজ্ঞান-শকুন্তলেও প্রেয়সী যেখানে জননী হইয়াছেন, বাসনার চাঞ্চল্য যেখানে বেদনার তপস্যায়

গাম্ভীর্যলাভ করিয়াছে, যেখানে অনুতাপের সঙ্গে ক্ষমা আসিয়া মিলিয়াছে, সেইখানেই রাজদম্পতির মিলন সার্থক হইয়াছে। প্রথম মিলনে প্রলয়, দ্বিতীয় মিলনেই পরিত্রাণ। এই দুই কাব্যেই শান্তির মধ্যে, মঙ্গলের মধ্যে, যেখানেই কবি সৌন্দর্যের সম্পূর্ণতা দেখাইয়াছেন সেখানেই তাঁহার তূলিকা বর্ণবিরল, তাঁহার বীণা অপ্রমত্ত।

বস্তুত সৌন্দর্য যেখানেই পরিণতিলাভ করিয়াছে সেখানেই সে আপনার প্রগল্‌ভতা দূর করিয়া দিয়াছে। সেখানেই ফুল আপনার বর্ণ-গন্ধের বাহুল্যকে ফলের গূঢ়তর মাধুর্যে পরিণত করিয়াছে; সেই পরিণতিতেই সৌন্দর্যের সহিত মঙ্গল একান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সৌন্দর্য ও মঙ্গলের এই সম্মিলন যে দেখিয়াছে সে ভোগবিলাসের সঙ্গে সৌন্দর্যকে কখনোই জড়াইয়া রাখিতে পারে না। তাহার জীবন-যাত্রার উপকরণ সাদাসিধা হইয়া থাকে; সেটা সৌন্দর্যবোধের অভাব হইতে হয় না, প্রকর্ষ হইতেই হয়। অশোকের প্রমোদ-উদ্যান কোথায় ছিল? তাঁহার রাজবাটীর ভিতের কোনো চিহ্নও তো দেখিতে পাই না। কিন্তু অশোকের রচিত স্তূপ ও স্তম্ভ বুদ্ধগয়ায় বোধিবটমূলের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার শিল্পকলাও সামান্য নহে। যে পুণ্যস্থানে ভগবান্ বুদ্ধ মানবের দুঃখনিবৃত্তির পথ আবিষ্কার করিয়াছেন রাজচক্রবর্তী অশোক সেইখানেই, সেই পরমমঙ্গলের স্মরণক্ষেত্রেই, কলাসৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নিজের ভোগকে এই পূজার অর্ঘ্য তিনি এমন করিয়া দেন নাই। এই ভারতবর্ষে কত দুর্গম গিরিশিখরে, কত নির্জন সমুদ্রতীরে, কত দেবালয় কত কলাশোভন পুণ্যকীর্তি দেখিতে পাই, কিন্তু হিন্দু-রাজাদের বিলাসভবনের স্মৃতিচিহ্ন কোথায় গেল? রাজধানী-নগর ছাড়িয়া অরণ্যপর্বতে এই-সমস্ত সৌন্দর্যস্থাপনের কারণ কী? কারণ আছে। সেখানে মানুষ নিজের সৌন্দর্যসৃষ্টির দ্বারা নিজের চেয়ে বড়োর প্রতিই বিস্ময়পূর্ণ ভক্তি প্রকাশ করিয়াছে। মানুষের রচিত সৌন্দর্য দাঁড়াইয়া

আপনার চেয়ে বড়ো সৌন্দর্যকে দুই হাত তুলিয়া অভিবাদন করিতেছে; নিজের সমস্ত মহত্ত্ব দিয়া নিজের চেয়ে মহত্তরকেই নীরবে প্রচার করিতেছে। মানুষ এই-সকল কারুপরিপূর্ণ নিস্তব্ধ ভাষার দ্বারা বলিয়াছে, দেখো, চাহিয়া দেখো, যিনি সুন্দর তাঁহাকে দেখো, যিনি মহান্ তাঁহাকে দেখো। সে এ কথা বলিতে চাহে নাই যে, আমি কতবড়ো ভোগী সেইটে দেখিয়া লও। সে বলে নাই, জীবিত অবস্থায় আমি যেখানে বিহার করিতাম সেখানে চাও, মৃত অবস্থায় আমি যেখানে মাটিতে মিশাইয়াছি সেখানেও আমার মহিমা দেখো। জানি না, প্রাচীন হিন্দু রাজারা নিজেদের প্রমোদভবনকে তেমন করিয়া অলংকৃত করিতেন কিনা, অন্তত ইহা নিশ্চয় যে হিন্দুজাতি সেগুলিকে সমাদর করিয়া রক্ষা করে নাই; যাহাদের গৌরব-প্রচারের জন্য তাহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাদের সঙ্গেই আজ সে-সমস্ত ধুলায় মিশাইয়াছে। কিন্তু মানুষের শক্তি মানুষের ভক্তি যেখানে নিজের সৌন্দর্যরচনাকে ভগবানের মঙ্গলরূপের বামপার্শ্বে বসাইয়া ধন্য হইয়াছে সেখানে সেই মিলনমন্দিরগুলিকে অতিদুর্গম স্থানেও আমরা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। মঙ্গলের সঙ্গেই সৌন্দর্যের, বিষ্ণুর সঙ্গেই লক্ষ্মীর মিলন পূর্ণ। সকল সভ্যতার মধ্যেই এই ভাবটি প্রচ্ছন্ন আছে। একদিন নিশ্চয় আসিবে যখন সৌন্দর্য ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা বদ্ধ, ঈর্ষার দ্বারা বিদ্ধ, ভোগের দ্বারা জীর্ণ হইবে না; শান্তি ও মঙ্গলের মধ্যে নির্মলভাবে স্ফূর্তি পাইবে। সৌন্দর্যকে আমাদের বাসনা হইতে, লোভ হইতে, স্বতন্ত্র করিয়া না দেখিতে পাইলে তাহাকে পূর্ণভাবে দেখা হয় না। সেই অশিক্ষিত অসংযত অসম্পূর্ণ দেখায় আমরা যাহা দেখি তাহাতে আমাদিগকে তৃপ্তি দেয় না, তৃষ্ণাই দেয়; খাদ্য দেয় না, মদ খাওয়াইয়া আহারের স্বাস্থ্যকর অভিরুচি পর্যন্ত নষ্ট করিতে থাকে।

এই আশঙ্কাবশতই নীতিপ্রচারকেরা সৌন্দর্যকে দূর হইতে নমস্কার করিতে উপদেশ দেন। পাছে লোকসান হয় বলিয়া লাভের পথ মাড়াইতেই

নিষেধ করেন। কিন্তু যথার্থ উপদেশ এই যে, সৌন্দর্যের পূর্ণ অধিকার পাইব বলিয়াই সংযমসাধন করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য সেইজন্যই, পরিণামে শুষ্কতালাভের জন্য নহে।

সাধনার কথা যখন উঠিল তখন প্রশ্ন হইতে পারে, এ সাধনার সিদ্ধি কী? ইহার শেষ কোন্‌খানে? আমাদের অন্যান্য কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি, কিন্তু সৌন্দর্যবোধ কিসের জন্য আমাদের মনে স্থান পাইয়াছে?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে সৌন্দর্যবোধের রাস্তাটা কোন্ দিকে চলিয়াছে সে কথাটার আর-একবার সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

সৌন্দর্যবোধ যখন শুদ্ধমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়ের সহায়তা লয় তখন যাহাকে আমরা সুন্দর বলিয়া বুঝি তাহা খুবই স্পষ্ট, তাহা দেখিবামাত্রই চোখে ধরা পড়ে। সেখানে আমাদের সম্মুখে এক দিকে সুন্দর ও আর-এক দিকে অসুন্দর এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব একেবারে সুনির্দিষ্ট। তার পরে বুদ্ধিও যখন সৌন্দর্যবোধের সহায় হয় তখন সুন্দর-অসুন্দরের ভেদটা দূরে গিয়া পড়ে। তখন যে জিনিস আমাদের মনকে টানে সেটা হয়তো চোখ মেলিবামাত্রই দৃষ্টিতে পড়িবার যোগ্য বলিয়া মনে না হইতেও পারে। আরম্ভের সহিত শেষের, প্রধানের সহিত অপ্রধানের, এক অংশের সহিত অন্য অংশের গূঢ়তর সামঞ্জস্য দেখিয়া যেখানে আমরা আনন্দ পাই সেখানে আমরা চোখ-ভুলানো সৌন্দর্যের দাসখত তেমন করিয়া আর মানি না। তার পরে কল্যাণবুদ্ধি যেখানে যোগ দেয় সেখানে আমাদের মনের অধিকার আরও বাড়িয়া যায়, সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্ব আরও ঘুচিয়া যায়। সেখানে কল্যাণী সতী সুন্দর হইয়া দেখা দেন, কেবল রূপসী নহে। যেখানে ধৈর্য-বীর্য ক্ষমা-প্রেম আলো ফেলে সেখানে রঙচঙের আয়োজন আড়ম্বরের কোনো প্রয়োজনই আমরা বুঝি না। কুমারসম্ভব কাব্যে ছদ্মবেশী মহাদেব

তাপসী উমার নিকট শংকরের রূপ গুণ বয়স বিভবের নিন্দা করিলেন, তখন উমা কহিলেন : মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতম্‌। তাঁহার প্রতি আমার মন একমাত্র ভাবের রসে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং আনন্দের জন্য আর-কোনো উপকরণের প্রয়োজনই নাই। ভাবরসে সুন্দর-অসুন্দরের কঠিন বিচ্ছেদ দূরে চলিয়া যায়।

তবু মঙ্গলের মধ্যেও একটা দ্বন্দ্ব আছে। মঙ্গলের বোধ ভালোমন্দের একটা সংঘাতের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু এমনতরো দ্বন্দ্বের মধ্যে কিছুর পরিসমাপ্তি হইতে পারে না। পরিণাম এক বৈ দুই নহে। নদী যতক্ষণ চলে ততক্ষণ তাহার দুই কূলের প্রয়োজন হয়, কিন্তু যেখানে তাহার চলা শেষ হয় সেখানে একমাত্র অকূল সমুদ্র। নদীর চলার দিকটাতে দ্বন্দ্ব, সমাপ্তির দিকটাতে দ্বন্দ্বের অবসান। আগুন জ্বালাইবার সময় দুই কাঠে ঘষিতে হয়, শিখা যখন জ্বলিয়া উঠে তখন দুই কাঠের ঘর্ষণ বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের সৌন্দর্যবোধও সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের সুখকর ও অসুখকর, জীবনের মঙ্গলকর ও অমঙ্গলকর, এই দুয়ের ঘর্ষণের দ্বন্দ্বে স্ফুলিঙ্গ বিক্ষেপ করিতে করিতে একদিন যদি পূর্ণভাবে জ্বলিয়া উঠে তবে তাহার সমস্ত আংশিকতা ও আলোড়ন নিরস্ত হয়।

তখন কী হয়? তখন দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া গিয়া সমস্তই সুন্দর হয়, তখন সত্য ও সুন্দর একই কথা হইয়া উঠে। তখনই বুঝিতে পারি, সত্যের যথার্থ উপলব্ধিমাত্রই আনন্দ, তাহাই চরম সৌন্দর্য।

এই চঞ্চল সংসারে আমরা সত্যের আস্বাদ কোথায় পাই? যেখানে আমাদের মন বসে। রাস্তার লোক আসিতেছে যাইতেছে, তাহারা আমাদের কাছে ছায়া, তাহাদের উপলব্ধি আমাদের কাছে নিতান্ত ক্ষীণ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আমাদের আনন্দ নাই। বন্ধুর সত্য আমাদের কাছে গভীর, সেই সত্য আমাদের মনকে আশ্রয় দেয়; বন্ধুকে যতখানি সত্য বলিয়া জানি সে আমাদিগকে ততখানি আনন্দ দেয়। যে দেশ

আমার নিকট ভূবৃত্তান্তের অন্তর্গত একটা নামমাত্র সে দেশের লোক সে দেশের জন্য প্রাণ দেয়। তাহারা দেশকে অত্যন্ত সত্যরূপে জানিতে পারে বলিয়াই তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারে। মূঢ়ের কাছে যে বিদ্যা বিভীষিকা বিদ্বানের কাছে তাহা পরমানন্দের জিনিস, বিদ্বান তাহা লইয়া জীবন কাটাইয়া দিতেছে। তবেই দেখা যাইতেছে, যেখানেই আমাদের কাছে সত্যের উপলব্ধি সেইখানেই আমরা আনন্দকে দেখিতে পাই। সত্যের অসম্পূর্ণ উপলব্ধিই আনন্দের অভাব। কোনো সত্যে যেখানে আমাদের আনন্দ নাই সেখানে আমরা সেই সত্যকে জানি মাত্র, তাহাকে পাই না। যে সত্য আমার কাছে নিরতিশয় সত্য তাহাতেই আমার প্রেম, তাহাতেই আমার আনন্দ।

এইরূপে বুঝিলে সত্যের অনুভূতি ও সৌন্দর্যের অনুভূতি এক হইয়া দাঁড়ায়।

মানবের সমস্ত সাহিত্য সংগীত ললিতকলা জানিয়া এবং না জানিয়া এই দিকেই চলিতেছে। মানুষ তাহার কাব্যে চিত্রে শিল্পে সত্যমাত্রকেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে। পূর্বে যাহা চোখে পড়িত না বলিয়া আমাদের কাছে অসত্য ছিল কবি তাহাকে আমাদের দৃষ্টির সামনে আনিয়া আমাদের সত্যের রাজ্যের, আনন্দের রাজ্যের, সীমানা বাড়াইয়া দিতেছেন। সমস্ত তুচ্ছকে অনাদৃতকে মানুষের সাহিত্য প্রতিদিন সত্যের গৌরবে আবিষ্কার করিয়া কলাসৌন্দর্যে চিহ্নিত করিতেছে। যে কেবলমাত্র পরিচিত ছিল তাহাকে বন্ধু করিয়া তুলিতেছে। যাহা কেবলমাত্র চোখে পড়িত তাহার উপরে মনকে টানিতেছে।

আধুনিক কবি বলিয়াছেন: Truth is beauty, beauty truth। আমাদের শুভ্রবসনা কমলালয়া দেবী সরস্বতী একাধারে Truth এবং Beauty মূর্তিমতী। উপনিষদ্‌ও বলিতেছেন: আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌-বিভাতি। যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার

অমৃতরূপ। আমাদের পদতলের ধূলি হইতে আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত সমস্তই truth এবং beauty, সমস্তই আনন্দরূপমমৃতম্।

সত্যের এই আনন্দরূপ অমৃতরূপ দেখিয়া সেই আনন্দকে ব্যক্ত করাই কাব্যসাহিত্যের লক্ষ্য। সত্যকে যখন শুধু আমরা চোখে দেখি, বুদ্ধিতে পাই, তখন নয়, কিন্তু যখন তাহাকে হৃদয় দিয়া পাই তখনই তাহাকে সাহিত্যে প্রকাশ করিতে পারি। তবে কি সাহিত্য কলাকৌশলের সৃষ্টি নহে, তাহা কেবল হৃদয়ের আবিষ্কার? ইহার মধ্যে সৃষ্টিরও একটা ভাগ আছে। সেই আবিষ্কারের বিস্ময়কে, সেই আবিষ্কারের আনন্দকে হৃদয় আপনার ঐশ্বর্যদ্বারা ভাষায় বা ধ্বনিতে বা বর্ণে চিহ্নিত করিয়া রাখে; ইহাতেই সৃষ্টিনৈপুণ্য; ইহাই সাহিত্য, ইহাই সংগীত, ইহাই চিত্রকলা।

মরুভূমির বালুময় বিস্তারের মাঝখানে দাঁড়াইয়া মানুষ তাহাকে দুই পিরামিডের বিস্ময়চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছে। নির্জন দ্বীপের সমুদ্র-তটকে মানুষ পাহাড়ের গায়ে কারুকৌশলপূর্ণ গুহা খুদিয়া চিহ্নিত করিয়াছে, বলিয়াছে ইহা আমার হৃদয়কে তৃপ্ত করিল— এই চিহ্নই বোম্বাইয়ের হস্তিগুহা। পূর্বমুখে দাঁড়াইয়া মানুষ সমুদ্রের মধ্যে সূর্যোদয়ের মহিমা দেখিল, অমনি বহুশতক্রোশ দূর হইতে পাথর আনিয়া সেখানে আপনার করজোড়ের চিহ্ন রাখিয়া দিল; তাহাই কনারকের মন্দির। সত্যকে যেখানে মানুষ নিবিড়রূপে অর্থাৎ আনন্দরূপে অমৃতরূপে উপলব্ধি করিয়াছে সেইখানেই আপনার একটা চিহ্ন কাটিয়াছে। সেই চিহ্নই কোথাও বা মূর্তি, কোথাও বা মন্দির, কোথাও বা তীর্থ, কোথাও বা রাজধানী। সাহিত্যও এই চিহ্ন। বিশ্বজগতের যে-কোনো ঘাটেই মানুষের হৃদয় আসিয়া ঠেকিতেছে সেইখানেই সে ভাষা দিয়া একটা স্থায়ী তীর্থ বাঁধাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। এমনি করিয়া বিশ্বতটের সকল স্থানকেই সে মানবযাত্রীর হৃদয়ের পক্ষে ব্যবহারযোগ্য উত্তরণযোগ্য করিয়া তুলিতেছে। এমনি করিয়া মানুষ জলে স্থলে আকাশে, শরতে বসন্তে বর্ষায়,

ধর্মে কর্মে ইতিহাসে অপরূপ চিহ্ন কাটিয়া কাটিয়া সত্যের সুন্দর মূর্তির প্রতি মানুষের হৃদয়কে নিয়ত আহ্বান করিতেছে। দেশে দেশে কালে কালে এই চিহ্ন, এই আহ্বান, কেবলই বিস্তৃত হইয়া চলিতেছে। জগতে সর্বত্রই মানুষ সাহিত্যের দ্বারা হৃদয়ের এই চিহ্নগুলি যদি না কাটিত তবে জগৎ আমাদের কাছে আজ কত সংকীর্ণ হইয়া থাকিত তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। আজ এই চোখে-দেখা কানে-শোনা জগৎ যে বহুলপরিমাণে আমাদের হৃদয়ের জগৎ হইয়া উঠিয়াছে ইহার প্রধান কারণ, মানুষের সাহিত্য হৃদয়ের আবিষ্কারচিহ্নে জগৎকে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

সত্য যে পদার্থপুঞ্জের স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য, সত্য যে কার্যকারণ-পরম্পরা, সে কথা জানাইবার অন্য শাস্ত্র আছে। কিন্তু সাহিত্য জানাইতেছে, সত্যই আনন্দ, সত্যই অমৃত। সাহিত্য উপনিষদের এই মন্ত্রকে অহরহ ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে: রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। তিনিই রস; এই রসকে পাইয়াই মানুষ আনন্দিত হয়।

পৌষ ১৩১৩

বিশ্বসাহিত্য

আমাদের অন্তঃকরণে যত-কিছু বৃত্তি আছে সে কেবল সকলের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য। এই যোগের দ্বারাই আমরা সত্য হই, সত্যকে পাই। নহিলে আমি আছি বা কিছু আছে, ইহার অর্থ ই থাকে না।

জগতে সত্যের সঙ্গে আমাদের এই-যে যোগ ইহা তিন প্রকারের। বুদ্ধির যোগ, প্রয়োজনের যোগ, আর আনন্দের যোগ।

ইহার মধ্যে বুদ্ধির যোগকে একপ্রকার প্রতিযোগিতা বলা যাইতে পারে। সে যেন ব্যাধের সঙ্গে শিকারের যোগ। সত্যকে বুদ্ধি যেন প্রতিপক্ষের মতো নিজের রচিত একটা কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া জেরা করিয়া করিয়া তাহার পেটের কথা টুকরা-টুকরা ছিনিয়া বাহির করে। এইজন্য সত্য সম্বন্ধে বুদ্ধির একটা অহংকার থাকিয়া যায়। সে যে পরিমাণে সত্যকে জানে সেই পরিমাণে আপনার শক্তিকে অনুভব করে।

তার পরে প্রয়োজনের যোগ। এই প্রয়োজনের অর্থাৎ কাজের যোগে সত্যের সঙ্গে আমাদের শক্তির একটা সহযোগিতা জন্মে। এই গরজের সম্বন্ধে সত্য আরও বেশি করিয়া আমাদের কাছে আসে। কিন্তু তবু তাহার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য ঘোচে না। ইংরেজ সওদাগর যেমন একদিন নবাবের কাছে মাথা নিচু করিয়া ভেট দিয়া কাজ আদায় করিয়া লইয়াছিল এবং কৃতকার্য হইয়া শেষকালে নিজেই সিংহাসনে চড়িয়া বসিয়াছে, তেমনি সত্যকে ব্যবহারে লাগাইয়া কাজ উদ্ধার করিয়া শেষকালে মনে করি, আমরাই যেন জগতের বাদশাগিরি পাইয়াছি! তখন আমরা বলি, প্রকৃতি আমাদের দাসী, জল বায়ু অগ্নি আমাদের বিনা বেতনের চাকর।

তার পরে আনন্দের যোগ। এই সৌন্দর্যের বা আনন্দের যোগে সমস্ত পার্থক্য ঘুচিয়া যায়; সেখানে আর অহংকার থাকে না; সেখানে নিতান্ত ছোটোর কাছে, দুর্বলের কাছে, আপনাকে একেবারে সঁপিয়া দিতে

আমাদের কিছুই বাধে না। সেখানে মথুরার রাজা বৃন্দাবনের গোয়ালিনীর কাছে আপনার রাজমর্যাদা লুকাইবার আর পথ পায় না। যেখানে আমাদের আনন্দের যোগ সেখানে আমাদের বুদ্ধির শক্তিকেও অনুভব করি না, কর্মের শক্তিকেও অনুভব করি না, সেখানে শুদ্ধ আপনাকেই অনুভব করি ; মাঝখানে কোনো আড়াল বা হিসাব থাকে না।

এক কথায়, সত্যের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ আমাদের ইস্কুল, প্রয়োজনের যোগ আমাদের আপিস, আনন্দের যোগ আমাদের ঘর। ইস্কুলেও আমরা সম্পূর্ণভাবে থাকি না, আপিসেও আমরা সম্পূর্ণরূপে ধরা দিই না, ঘরেই আমরা বিনা বাধায় নিজের সমস্তটাকে ছাড়িয়া দিয়া বাঁচি। ইস্কুল নিরলংকার, আপিস নিরাভরণ, আর ঘরকে কত সাজসজ্জায় সাজাইয়া থাকি।

এই আনন্দের যোগ ব্যাপারখানা কী ? না, পরকে আপনার করিয়া জানা, আপনাকে পরের করিয়া জানা। যখন তেমন করিয়া জানি তখন কোনো প্রশ্ন থাকে না। এ কথা আমরা কখনো জিজ্ঞাসা করি না যে, আমি আমাকে কেন ভালোবাসি। আমার আপনার অনুভূতিতেই যে আনন্দ। সেই আমার অনুভূতিকে অন্যের মধ্যেও যখন পাই তখন এ কথা আর জিজ্ঞাসা করিবার কোনো প্রয়োজনই হয় না যে, তাহাকে আমার কেন ভালো লাগিতেছে।

যাজ্ঞবল্ক্য গার্গিকে বলিয়াছিলেন—

> নবা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।
> আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি॥
> নবা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি।
> আত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি॥

পুত্রকে চাহি বলিয়াই যে পুত্র প্রিয় হয় তাহা নহে, আত্মাকে চাহি বলিয়াই পুত্র প্রিয় হয়— বিত্তকে চাহি বলিয়াই যে বিত্ত প্রিয় হয় তাহা নহে,

আত্মাকে চাহি বলিয়াই বিত্ত প্রিয় হয়— ইত্যাদি। এ কথার অর্থ এই, যাহার মধ্যে আমি নিজেকেই পূর্ণতর বলিয়া বুঝিতে পারি আমি তাহাকেই চাই। পুত্র আমার অভাব দূর করে, তাহার মানে, আমি পুত্রের মধ্যে আমাকে আরও পাই। তাহার মধ্যে আমি যেন আমিতর হইয়া উঠি। এইজন্য সে আমার আত্মীয়; আমার আত্মাকে আমার বাহিরেও সে সত্য করিয়া তুলিয়াছে। নিজের মধ্যে যে সত্যকে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে অনুভব করিয়া প্রেম অনুভব করি পুত্রের মধ্যেও সেই সত্যকে সেইমতোই অত্যন্ত অনুভব করাতে আমার সেই প্রেম বাড়িয়া উঠে। সেইজন্য একজন মানুষ যে কী তাহা জানিতে গেলে সে কী ভালোবাসে তাহা জানিতে হয়। ইহাতেই বুঝা যায়, এই বিশ্বজগতে কিসের মধ্যে সে আপনাকে লাভ করিয়াছে, কত দূর পর্যন্ত সে আপনাকে ছড়াইয়া দিয়াছে। যেখানে আমার প্রীতি নাই সেখানেই আমার আত্মা তাহার গণ্ডির সীমা-রেখায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

শিশু বাহিরে আলো দেখিলে বা কিছু-একটা চলাফেরা করিতেছে দেখিলে আনন্দে হাসিয়া উঠে, কলরব করে। সে এই আলোকে এই চাঞ্চল্যে আপনারই চেতনাকে অধিকতর করিয়া পায়, এইজন্যই তাহার আনন্দ।

কিন্তু ইন্দ্রিয়বোধ ছাড়াও ক্রমে যখন তাহার চেতনা হৃদয়মনের নানা স্তরে ব্যাপ্ত হইতে থাকে তখন শুধু এতটুকু আন্দোলনে তাহার আনন্দ হয় না। একেবারে হয় না তাহা নহে, অল্প হয়।

এমনি করিয়া মানুষের বিকাশ যতই বড়ো হয় সে ততই বড়ো রকম করিয়া আপনার সত্যকে অনুভব করিতে চায়।

এই-যে নিজের অন্তরাত্মাকে বাহিরে অনুভব করা, এটা প্রথমে মানুষের মধ্যেই মানুষ অতি সহজে এবং সম্পূর্ণরূপে করিতে পারে। চোখের দেখায়, কানের শোনায়, মনের ভাবায়, কল্পনার খেলায়, হৃদয়ের নানান

টানে মানুষের মধ্যে সে স্বভাবতই নিজেকে পুরাপুরি আদায় করে। এইজন্য মানুষকে জানিয়া, মানুষকে টানিয়া, মানুষের কাজ করিয়া, সে এমন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। এইজন্যই দেশে এবং কালে যে মানুষ যত বেশি মানুষের মধ্যে আপনার আত্মাকে মিলাইয়া নিজেকে উপলব্ধি ও প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন তিনি ততই মহৎ মানুষ। তিনি যথার্থই মহাত্মা। সমস্ত মানুষেরই মধ্যে আমার আত্মার সার্থকতা, এ যে ব্যক্তি কোনো-না-কোনো সুযোগে কিছু-না-কিছু বুঝিতে না পারিয়াছে তাহার ভাগ্যে মনুষ্যত্বের ভাগ কম পড়িয়া গেছে। সে আত্মাকে আপনার মধ্যে জানাতেই আত্মাকে ছোটো করিয়া জানে।

সকলের মধ্যেই নিজেকে জানা— আমাদের মানবাত্মার এই-যে একটা স্বাভাবিক ধর্ম, স্বার্থ তাহার একটা বাধা, অহংকার তাহার একটা বাধা; সংসারে এই-সকল নানা বাধায় আমাদের আত্মার সেই স্বাভাবিক গতিস্রোত খণ্ডখণ্ড হইয়া যায়; মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ সৌন্দর্যকে আমরা অবাধে দেখিতে পাই না।

কিন্তু জানি, কেহ কেহ তর্ক করিবেন, মানবাত্মার যেটা স্বাভাবিক ধর্ম সংসারে তাহার এত লাঞ্ছনা কেন? যেটাকে তুমি বাধা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছ, যাহা স্বার্থ, যাহা অহংকার, তাহাকেই বা স্বাভাবিক ধর্ম না বলিবে কেন?

বস্তুত অনেকে তাহা বলিয়াও থাকে। কেননা, স্বভাবের চেয়ে স্বভাবের বাধাটাই বেশি করিয়া চোখে পড়ে। দুই-চাকার গাড়িতে মানুষ যখন প্রথম চড়া অভ্যাস করে তখন চলার চেয়ে পড়াটাই তাহার ভাগ্যে বেশি ঘটে। সেই সময়ে কেহ যদি বলে, লোকটা চড়া অভ্যাস করিতেছে না, পড়াই অভ্যাস করিতেছে, তবে তাহা লইয়া তর্ক করা মিথ্যা। সংসারে স্বার্থ এবং অহংকারের ধাক্কা তো পদে পদেই দেখিতে পাই, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়াও মানুষের নিগূঢ় স্বধর্মরক্ষার চেষ্টা অর্থাৎ সকলের

সঙ্গে মিলিবার চেষ্টা যদি না দেখিতে পাই, যদি পড়াটাকেই স্বাভাবিক বলিয়া তকরার করি, তবে সে নিতান্তই কলহ করা হয়।

বস্তুত যে ধর্ম আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক তাহাকে স্বাভাবিক বলিয়া জানিবার জন্যই, তাহাকে তাহার পুরা দমে কাজ জোগাইবার জন্যই, তাহাকে বাধা দিতে হয়। সেই উপায়েই সে নিজেকে সচেতনভাবে জানে, এবং তাহার চৈতন্য যতই পূর্ণ হয় তাহার আনন্দও ততই নিবিড় হইতে থাকে। সকল বিষয়েই এইরূপ।

এই যেমন বুদ্ধি। কার্যকারণের সম্বন্ধ ঠিক করা বুদ্ধির একটা ধর্ম। সহজপ্রত্যক্ষ জিনিসের মধ্যে সে যতক্ষণ তাহা সহজেই করে ততক্ষণ সে নিজেকে যেন পুরাপুরি দেখিতেই পায় না। কিন্তু বিশ্বজগতে কার্যকারণের সম্বন্ধগুলি এতই গোপনে তলাইয়া আছে যে, তাহা উদ্ধার করিতে বুদ্ধিকে নিয়তই প্রাণপণে খাটিতে হইতেছে। এই বাধা কাটাইবার খাটুনিতেই বুদ্ধি বিজ্ঞানদর্শনের মধ্যে নিজেকে খুব নিবিড় করিয়া অনুভব করে; তাহাতেই তাহার গৌরব বাড়ে। বস্তুত ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলে বিজ্ঞান দর্শন আর কিছুই নহে, বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধির নিজেকেই উপলব্ধি। সে নিজের নিয়ম যেখানে দেখে সেখানে সেই পদার্থকে এবং নিজেকে একত্র করিয়া দেখে। ইহাকেই বলে বুঝিতে পারা। এই দেখাতেই বুদ্ধির আনন্দ। নহিলে আপেল-ফল যে কারণে মাটিতে পড়ে সূর্য সেই কারণেই পৃথিবীকে টানে, এ কথা বাহির করিয়া মানুষের এত খুশি হইবার কোনো কারণ ছিল না। টানে তো টানে, আমার তাহাতে কী? আমার তাহাতে এই, জগৎচরাচরের এই ব্যাপক ব্যাপারকে আমার বুদ্ধির মধ্যে পাইলাম, সর্বত্রই আমার বুদ্ধিকে অনুভব করিলাম। আমার বুদ্ধির সঙ্গে ধূলি হইতে সূর্যচন্দ্রতারা সবটা মিলিল। এমনি করিয়া অন্তহীন জগৎরহস্য মানুষের বুদ্ধিকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া মানুষের কাছে তাহাকে বেশি করিয়া প্রকাশ করিতেছে, নিখিলচরাচরের সঙ্গে মিলাইয়া আবার তাহা

মানুষকে ফিরাইয়া দিতেছে। সমস্তের সঙ্গে এই বুদ্ধির মিলনই জ্ঞান। এই মিলনেই আমাদের বোধশক্তির আনন্দ।

তেমনি সমস্ত মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনার মনুষ্যত্বের মিলনকে পাওয়াই মানবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম এবং তাহাতেই তাহার যথার্থ আনন্দ। এই ধর্মকে পূর্ণচেতন-রূপে পাইবার জন্যই অন্তরে বাহিরে কেবলই বিরোধ ও বাধার ভিতর দিয়াই তাহাকে চলিতে হয়। এইজন্যই স্বার্থ এত প্রবল, আত্মাভিমান এত অটল, সংসারের পথ এত দুর্গম। এই সমস্ত বাধার ভিতর দিয়া যেখানে মানবের ধর্ম সমুজ্জ্বল হইয়া পূর্ণসুন্দররূপে সবলে নিজেকে প্রকাশ করে সেখানে বড়ো আনন্দ। সেখানে আমরা আপনাকেই বড়ো করিয়া পাই।

মহাপুরুষের জীবনী এইজন্যই আমরা পড়িতে চাই। তাঁহাদের চরিত্রে আমাদের নিজের বাধাযুক্ত আচ্ছন্ন প্রকৃতিকেই মুক্ত ও প্রসারিত দেখিতে পাই। ইতিহাসে আমরা আমাদেরই স্বভাবকে নানা লোকের মধ্যে নানা দেশে নানা কালে নানা ঘটনায় নানা পরিমাণে ও নানা আকারে দেখিয়া রস পাইতে থাকি। তখন আমি স্পষ্ট করিয়া বুঝি বা না বুঝি, মনের মধ্যে স্বীকার করিতে থাকি সকল মানুষকে লইয়াই আমি এক— সেই ঐক্য যতটা মাত্রায় আমি ঠিকমত অনুভব করিব ততটা মাত্রায় আমার মঙ্গল, আমার আনন্দ।

কিন্তু জীবনীতে ও ইতিহাসে আমরা সমস্তটা আগাগোড়া স্পষ্ট দেখিতে পাই না। তাহাও অনেক বাধায় অনেক সংশয়ে ঢাকা পড়িয়া আমাদের কাছে দেখা দেয়। তাহার মধ্য দিয়াও আমরা মানুষের যে পরিচয় পাই তাহা খুব বড়ো, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই পরিচয়কে আবার আমাদের মনের মতো করিয়া, তাহাকে আমাদের সাধ মিটাইয়া সাজাইয়া, চির-কালের মতো ভাষায় ধরিয়া রাখিবার জন্য আমাদের অন্তরের একটা চেষ্টা আছে। তেমনি করিতে পারিলে তবেই সে যেন বিশেষ করিয়া আমার

হইল। তাহার মধ্যে সুন্দর ভাষায় সুরচিত নৈপুণ্যে আমার প্রীতিকে প্রকাশ করিতেই সে মানুষের হৃদয়ের সামগ্রী হইয়া উঠিল। সে আর এই সংসারের আনাগোনার স্রোতে ভাসিয়া গেল না।

এমনি করিয়া, বাহিরের যে-সকল অপরূপ প্রকাশ, তাহা সূর্যোদয়ের ছটা হউক বা মহৎ চরিত্রের দীপ্তি হউক বা নিজের অন্তরের আবেগ হউক, যাহা-কিছু ক্ষণে ক্ষণে আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিতেছে হৃদয় তাহাকে নিজের একটা সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত করিয়া আপনার বলিয়া তাহাকে আঁকড়িয়া রাখে। এমনি করিয়া সেই-সকল উপলক্ষ্যে সে আপনাকেই বিশেষ করিয়া প্রকাশ করে।

সংসারে মানুষ যে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে সেই প্রকাশের দুইটি মোটা ধারা আছে। একটা ধারা মানুষের কর্ম, আর-একটা ধারা মানুষের সাহিত্য। এই দুই ধারা একেবারে পাশাপাশি চলিয়াছে। মানুষ আপনার কর্মরচনায় এবং ভাবরচনায় আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছে। ইহারা উভয়ে উভয়কে পূরণ করিতে করিতে চলিয়াছে। এই দুয়ের মধ্য দিয়াই ইতিহাসে ও সাহিত্যে মানুষকে পুরাপুরি জানিতে হইবে।

কর্মক্ষেত্রে মানুষ তাহার দেহ মন হৃদয়ের সমস্ত শক্তি ও অভিজ্ঞতা লইয়া গৃহ সমাজ রাজ্য ও ধর্মসম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতেছে। এই গড়ার মধ্যে মানুষ যাহা জানিয়াছে, যাহা পাইয়াছে, যাহা চায়, সমস্তই প্রকাশ পাইতেছে। এমনি করিয়া মানুষের প্রকৃতি জগতের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়া নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া সকলের মাঝখানে আপনাকে দাঁড় করাইয়া তুলিতেছে। এমনি করিয়া, যাহা ভাবের মধ্যে ঝাপসা হইয়া ছিল ভবের মধ্যে তাহা আকারে জন্ম লইতেছে, যাহা একের মধ্যে ক্ষীণ হইয়া ছিল তাহা অনেকের মধ্যে নানা-অঙ্গ-বিশিষ্ট বড়ো ঐক্য পাইতেছে। এইরূপে ক্রমে এমন হইয়া উঠিতেছে যে প্রত্যেক স্বতন্ত্র মানুষ এই বহুদিনের ও বহুজনের গড়া ঘর সমাজ রাজ্য ও ধর্মসম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া ছাড়া

নিজেকে স্পষ্ট করিয়া পূরা করিয়া প্রকাশ করিতেই পারে না। এই সমস্তটাই মানুষের কাছে মানুষের প্রকাশরূপ হইয়া উঠিয়াছে। এমন অবস্থা না হইলে তাহাকে আমরা সভ্যতা অর্থাৎ পূর্ণমনুষ্যত্ব বলিতেই পারি না। রাজ্যেই বলো, সমাজেই বলো, যে ব্যাপারে আমরা এক-একজন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, একের সঙ্গে সকলের যোগ নাই, সেইখানেই আমরা অসভ্য। এইজন্য সভ্যসমাজে রাজ্যে আঘাত লাগিলে সেই রাজ্যের প্রত্যেক লোকের বৃহৎ কলেবরটাতে আঘাত লাগে; সমাজ কোনো দিকে সংকীর্ণ হইলে সেই সমাজের প্রত্যেক লোকের আত্মবিকাশ আচ্ছন্ন হইতে থাকে। মানুষের সংসারক্ষেত্রের এই-সমস্ত রচনা যে পরিমাণে উদার হয় সেই পরিমাণে সে আপনার মনুষ্যত্বকে অবাধে প্রকাশ করিতে পারে। যে পরিমাণে সেখানে সংকোচ আছে প্রকাশের অভাবে মানুষ সেই পরিমাণে সেখানে দীন হইয়া থাকে; কারণ, সংসার কাজের উপলক্ষ্য করিয়া মানুষকে প্রকাশেরই জন্য এবং প্রকাশই একমাত্র আনন্দ।

কিন্তু কর্মক্ষেত্রে মানুষ এই-যে আপনাকেই প্রকাশ করে এখানে প্রকাশ করাটাই তাহার আসল লক্ষ্য নয়, ওটা কেবল গৌণফল। গৃহিণী ঘরের কাজের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু প্রকাশ করাটাই তাঁহার মনের স্পষ্ট উদ্দেশ্য নয়। গৃহকর্মের ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার নানা অভিপ্রায় সাধন করেন; সেই-সকল অভিপ্রায় কাজের উপর হইতে ঠিকরাইয়া আসিয়া তাঁহার প্রকৃতিকে আমাদের কাছে বাহির করিয়া দেয়।

কিন্তু সময় আছে যখন মানুষ মুখ্যতই আপনাকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে। মনে করো, যেদিন ঘরে বিবাহ সেদিন এক দিকে বিবাহের কাজটা সারিবার জন্য আয়োজন চলিতে থাকে, আবার অন্য দিকে শুধু কাজ সারা নহে, হৃদয়কে জানাইয়া দিবারও প্রয়োজন ঘটে; সেদিন ঘরের লোক ঘরের মঙ্গলকে ও আনন্দকে সকলের কাছে ঘোষণা না করিয়া

দিয়া থাকিতে পারে না। ঘোষণার উপায় কী? বাঁশি বাজে, দীপ জ্বলে, ফুলপাতার মালা দিয়া ঘর সাজানো হয়। সুন্দর ধ্বনি, সুন্দর গন্ধ, সুন্দর দৃশ্যের দ্বারা, উজ্জ্বলতার দ্বারা, হৃদয় আপনাকে শতধারায় ফোয়ারার মতো চারি দিকে ছড়াইয়া ফেলিতে থাকে। এমনি করিয়া নানাপ্রকার ইঙ্গিতে আপনার আনন্দকে সে অন্যের মধ্যে জাগাইয়া তুলিয়া সেই আনন্দকে সকলের মধ্যে সত্য করিতে চায়।

মা তাঁহার কোলের শিশুর সেবা না করিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু শুধু তাই নয়, কেবল কাজ করিয়া নয়, মায়ের স্নেহ আপনা-আপনি বিনা কারণে আপনাকে বাহিরে ব্যক্ত করিতে চায়। তখন সে কত খেলায় কত আদরে কত ভাষায় ভিতর হইতে ছাপাইয়া উঠিতে থাকে। তখন সে শিশুকে নানা রঙের সাজে সাজাইয়া, নানা গহনা পরাইয়া, নিতান্তই বিনা প্রয়োজনে নিজের প্রাচুর্যকে প্রাচুর্যদ্বারা, মাধুর্যকে সৌন্দর্যদ্বারা বাহিরে বিস্তার না করিয়া থাকিতে পারে না।

ইহা হইতে এই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের হৃদয়ের ধর্মই এই। সে আপনার আবেগকে বাহিরের জগতের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে চায়। সে নিজের মধ্যে নিজে পূরা নহে। অন্তরের সত্যকে কোনোপ্রকারে বাহিরে সত্য করিয়া তুলিলে তবে সে বাঁচে। যে বাড়িতে সে থাকে সে বাড়িটি তাহার কাছে কেবল ইট-কাঠের ব্যাপার হইয়া থাকে না; সে বাড়িটিকে সে বাস্তু করিয়া তুলিয়া তাহাতে হৃদয়ের রঙ মাখাইয়া দেয়। যে দেশে হৃদয় বাস করে সে দেশ তাহার কাছে মাটি-জল-আকাশ হইয়া থাকে না; সেই দেশ তাহার কাছে ঈশ্বরের জীবধাত্রীরূপকে জননীভাবে প্রকাশ করিলে তবে সে আনন্দ পায়, নহিলে হৃদয় আপনাকে বাহিরে দেখিতে পায় না। এমন না ঘটিলে হৃদয় উদাসীন হয় এবং ঔদাসীন্য হৃদয়ের পক্ষে মৃত্যু।

সত্যের সঙ্গে হৃদয় এমনি করিয়া কেবলই রসের সম্পর্ক পাতায়। রসের

সম্বন্ধ যেখানে আছে সেখানে আদানপ্রদান আছে। আমাদের হৃদয়লক্ষ্মী জগতের যে কুটুম্ববাড়ি হইতে যেমন সওগাত পায় সেখানে তাহার অনুরূপ সওগাতটি না পাঠাইতে পারিলে তাহার গৃহিণীপনায় যেন ঘা লাগে। এইরূপ সওগাতের ডালায় নিজের কুটুম্বিতাকে প্রকাশ করিবার জন্য তাহাকে নানা মাল-মসলা লইয়া. ভাষা লইয়া, স্বর লইয়া, তুলি লইয়া, পাথর লইয়া সৃষ্টি করিতে হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহার নিজের কোনো প্রয়োজন সারা হইল তো ভালোই, কিন্তু অনেক সময়ে সে আপনার প্রয়োজন নষ্ট করিয়াও কেবল নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র। সে দেউলে হইয়াও আপনাকে ঘোষণা করিতে চায়। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এই-যে প্রকাশের বিভাগ ইহাই তাহার প্রধান বাজে-খরচের বিভাগ; এইখানেই বুদ্ধি-খাতাঞ্চিকে বারংবার কপালে করাঘাত করিতে হয়।

হৃদয় বলে, আমি অন্তরে যতখানি বাহিরেও ততখানি সত্য হইব কী করিয়া? তেমন সামগ্রী, তেমন সুযোগ বাহিরে কোথায় আছে? সে কেবলই কাঁদিতে থাকে যে, আমি আপনাকে দেখাইতে অর্থাৎ আপনাকে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি না। ধনী হৃদয়ের মধ্যে যখন আপনার ধনিত্ব অনুভব করে তখন সেই ধনিত্ব বাহিরে প্রকাশ করিতে গিয়া কুবেরের ধনকেও সে ফুঁকিয়া দিতে পারে। প্রেমিক হৃদয়ের মধ্যে যখন যথার্থ প্রেম অনুভব করে তখন সেই প্রেমকে প্রকাশ অর্থাৎ বাহিরে সত্য করিয়া তুলিবার জন্য সে ধন প্রাণ মান সমস্তই এক নিমেষে বিসর্জন করিতে পারে। এমনি করিয়া বাহিরকে অন্তরের ও অন্তরকে বাহিরের সামগ্রী করিবার একান্ত ব্যাকুলতা হৃদয়ের কিছুতেই ঘুচে না। বলরাম-দাসের একটি পদ আছে: তোমায় হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির! অর্থাৎ প্রিয়বস্তু যেন হৃদয়ের ভিতরকারই বস্তু; তাহাকে কে যেন বাহিরে আনিয়াছে, সেইজন্য তাহাকে আবার ভিতরে ফিরাইয়া

লইবার জন্য এতই আকাঙ্ক্ষা। আবার ইহার উল্‌টাও আছে। হৃদয় আপনার ভিতরের আকাঙ্ক্ষা ও আবেগকে যখন বাহিরের কিছুতে প্রত্যক্ষ করিতে না পারে তখন অন্তত সে নানা উপকরণ লইয়া নিজের হাতে তাহার একটা প্রতিরূপ গড়িবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। এমনি করিয়া জগৎকে আপনার ও আপনাকে জগতের করিয়া তুলিবার জন্য হৃদয়ের ব্যাকুলতা কেবলই কাজ করিতেছে। নিজেকে বাহিরে প্রকাশ করা এই কাজেরই একটি অঙ্গ। সেইজন্য এই প্রকাশব্যাপারে হৃদয় মানুষকে সর্বস্ব খোওয়াইতেও রাজি করিয়া আনে।

বর্বর সৈন্য যখন লড়াই করিতে যায় তখন সে কেবলমাত্র শত্রুপক্ষকে হারাইয়া দিবার জন্যই ব্যস্ত থাকে না। তখন সে সর্বাঙ্গে রঙচঙ মাখিয়া, চীৎকার করিয়া, বাজনা বাজাইয়া, তাণ্ডবনৃত্য করিয়া চলে— ইহা অন্তরের হিংসাকে বাহিরে মূর্তিমান করিয়া তোলা। এ না হইলে হিংসা যেন পুরা হয় না। হিংসা অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য যুদ্ধ করে, আর আত্মপ্রকাশের তৃপ্তির জন্য এই-সমস্ত বাজে কাণ্ড করিতে থাকে।

এখনকার পাশ্চাত্যযুদ্ধেও জিগীষার আত্মপ্রকাশের জন্য বাজনা-বাদ্য সাজ-সরঞ্জাম যে একেবারেই নাই, তাহা নয়। তবু এই-সকল আধুনিক যুদ্ধে বুদ্ধির চালেরই প্রাধান্য ঘটিয়াছে; ক্রমেই মানবহৃদয়ের ধর্ম ইহা হইতে সরিয়া আসিতেছে। ইজিপ্টে দর্বেশের দল যখন ইংরেজসৈন্যকে আক্রমণ করিয়াছিল তখন তাহারা কেবল লড়াইয়ে জিতিবার জন্যই মরে নাই। তাহারা অন্তরের উদ্দীপ্ত তেজকে প্রকাশ করিবার জন্যই শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত মরিয়াছিল। লড়াইয়ে যাহারা কেবল জিতিতেই চায় তাহারা এমন অনাবশ্যক কাণ্ড করে না। আত্মহত্যা করিয়াও মানুষের হৃদয় আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়। এতবড়ো বাজে খরচের কথা কে মনে করিতে পারে!

আমরা যে পূজা করিয়া থাকি তাহা বুদ্ধিমানেরা এক ভাবে করে,

ভক্তিমানেরা আর-এক ভাবে করে। বুদ্ধিমান মনে করে, পূজা করিয়া ভগবানের কাছ হইতে সদ্‌গতি আদায় করিয়া লইব; আর ভক্তিমান বলে, পূজা না করিলে আমার ভক্তির পূর্ণতা হয় না, ইহার আর কোনো ফল না'ই থাকুক, হৃদয়ের ভক্তিকে বাহিরে স্থান দিয়া তাহাকেই পুরা আশ্রয় দেওয়া হইল। এইরূপে ভক্তি পূজার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিয়া নিজেকেই সার্থক করে। বুদ্ধিমানের পূজা সুদে টাকা খাটানো; ভক্তিমানের পূজা একেবারেই বাজে খরচ। হৃদয় আপনাকে প্রকাশ করিতে গিয়া লোকসানকে একেবারে গণ্যই করে না।

বিশ্বজগতের মধ্যেও যেখানে আমরা আমাদের হৃদয়ের এই ধর্মটি দেখি সেখানেই আমাদের হৃদয় আপনিই আপনাকে ধরা দিয়া বসে, কোনো কথাটি জিজ্ঞাসা করে না। জগতের মধ্যে এই বেহিসাবি বাজে খরচের দিকটা সৌন্দর্য। যখন দেখি, ফুল কেবলমাত্র বীজ হইয়া উঠিবার জন্যই তাড়া লাগাইতেছে না, নিজের সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপাইয়া সুন্দর হইয়া ফুটিতেছে— মেঘ কেবল জল ঝরাইয়া কাজ সারিয়া তাড়াতাড়ি ছুটি লইতেছে না, রহিয়া-বসিয়া বিনা প্রয়োজনে রঙের ছটায় আমাদের চোখ কাড়িয়া লইতেছে— গাছগুলা কেবল কাঠি হইয়া শীর্ণ কাঙালের মতো বৃষ্টি ও আলোকের জন্য হাত বাড়াইয়া নাই, সবুজ শোভার পুঞ্জ পুঞ্জ ঐশ্বর্যে দিগ্‌বধূদের ডালি ভরিয়া দিতেছে— যখন দেখি, সমুদ্র যে কেবল জলকে মেঘরূপে পৃথিবীর চারি দিকে প্রচার করিয়া দিবার একটা মস্ত আপিস তাহা নহে, সে আপনার তরল নীলিমার অতলস্পর্শ ভয়ের দ্বারা ভীষণ— এবং পর্বত কেবল ধরাতলে নদীর জল জোগাইয়াই ক্ষান্ত নহে, সে যোগনিমগ্ন রুদ্রের মতো ভয়ংকরকে আকাশ জুড়িয়া নিস্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছে— তখন জগতের মধ্যে আমরা হৃদয়ধর্মের পরিচয় পাই। তখন চিরপ্রবীণ বুদ্ধি মাথা নাড়িয়া প্রশ্ন করে, জগৎ জুড়িয়া এত অনাবশ্যক চেষ্টার বাজে খরচ কেন? চিরনবীন হৃদয় বলে, কেবলমাত্র আমাকে

লইবার জন্য এতই আকাঙ্ক্ষা। আবার ইহার উল্‌টাও আছে। হৃদয় আপনার ভিতরের আকাঙ্ক্ষা ও আবেগকে যখন বাহিরের কিছুতে প্রত্যক্ষ করিতে না পারে তখন অন্তত সে নানা উপকরণ লইয়া নিজের হাতে তাহার একটা প্রতিরূপ গড়িবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। এমনি করিয়া জগৎকে আপনার ও আপনাকে জগতের করিয়া তুলিবার জন্য হৃদয়ের ব্যাকুলতা কেবলই কাজ করিতেছে। নিজেকে বাহিরে প্রকাশ করা এই কাজেরই একটি অঙ্গ। সেইজন্য এই প্রকাশব্যাপারে হৃদয় মানুষকে সর্বস্ব খোওয়াইতেও রাজি করিয়া আনে।

বর্বর সৈন্য যখন লড়াই করিতে যায় তখন সে কেবলমাত্র শত্রুপক্ষকে হারাইয়া দিবার জন্যই ব্যস্ত থাকে না। তখন সে সর্বাঙ্গে রঙচঙ মাখিয়া, চীৎকার করিয়া, বাজনা বাজাইয়া, তাণ্ডবনৃত্য করিয়া চলে— ইহা অন্তরের হিংসাকে বাহিরে মূর্তিমান করিয়া তোলা। এ না হইলে হিংসা যেন পূরা হয় না। হিংসা অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য যুদ্ধ করে, আর আত্মপ্রকাশের তৃপ্তির জন্য এই-সমস্ত বাজে কাণ্ড করিতে থাকে।

এখনকার পাশ্চাত্যযুদ্ধেও জিগীষার আত্মপ্রকাশের জন্য বাজনা-বাদ্য সাজ-সরঞ্জাম যে একেবারেই নাই, তাহা নয়। তবু এই-সকল আধুনিক যুদ্ধে বুদ্ধির চালেরই প্রাধান্য ঘটিয়াছে; ক্রমেই মানবহৃদয়ের ধর্ম ইহা হইতে সরিয়া আসিতেছে। ইজিপ্টে দর্বেশের দল যখন ইংরেজসৈন্যকে আক্রমণ করিয়াছিল তখন তাহারা কেবল লড়াইয়ে জিতিবার জন্যই মরে নাই। তাহারা অন্তরের উদ্দীপ্ত তেজকে প্রকাশ করিবার জন্যই শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত মরিয়াছিল। লড়াইয়ে যাহারা কেবল জিতিতেই চায় তাহারা এমন অনাবশ্যক কাণ্ড করে না। আত্মহত্যা করিয়াও মানুষের হৃদয় আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়। এতবড়ো বাজে খরচের কথা কে মনে করিতে পারে!

আমরা যে পূজা করিয়া থাকি তাহা বুদ্ধিমানেরা এক ভাবে করে,

ভক্তিমানেরা আর-এক ভাবে করে। বুদ্ধিমান মনে করে, পূজা করিয়া ভগবানের কাছ হইতে সদ্‌গতি আদায় করিয়া লইব; আর ভক্তিমান বলে, পূজা না করিলে আমার ভক্তির পূর্ণতা হয় না, ইহার আর কোনো ফল না'ই থাকুক, হৃদয়ের ভক্তিকে বাহিরে স্থান দিয়া তাহাকেই পূরা আশ্রয় দেওয়া হইল। এইরূপে ভক্তি পূজার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিয়া নিজেকেই সার্থক করে। বুদ্ধিমানের পূজা সুদে টাকা খাটানো; ভক্তিমানের পূজা একেবারেই বাজে খরচ। হৃদয় আপনাকে প্রকাশ করিতে গিয়া লোকসানকে একেবারে গণ্যই করে না।

বিশ্বজগতের মধ্যেও যেখানে আমরা আমাদের হৃদয়ের এই ধর্মটি দেখি সেখানেই আমাদের হৃদয় আপনিই আপনাকে ধরা দিয়া বসে, কোনো কথাটি জিজ্ঞাসা করে না। জগতের মধ্যে এই বেহিসাবি বাজে খরচের দিকটা সৌন্দর্য। যখন দেখি, ফুল কেবলমাত্র বীজ হইয়া উঠিবার জন্যই তাড়া লাগাইতেছে না, নিজের সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপাইয়া সুন্দর হইয়া ফুটিতেছে— মেঘ কেবল জল ঝরাইয়া কাজ সারিয়া তাড়াতাড়ি ছুটি লইতেছে না, রহিয়া-বসিয়া বিনা প্রয়োজনে রঙের ছটায় আমাদের চোখ কাড়িয়া লইতেছে— গাছগুলা কেবল কাঠি হইয়া শীর্ণ কাঙালের মতো বৃষ্টি ও আলোকের জন্য হাত বাড়াইয়া নাই, সবুজ শোভার পুঞ্জ পুঞ্জ ঐশ্বর্যে দিগ্‌বধূদের ডালি ভরিয়া দিতেছে— যখন দেখি, সমুদ্র যে কেবল জলকে মেঘরূপে পৃথিবীর চারি দিকে প্রচার করিয়া দিবার একটা মস্ত আপিস তাহা নহে, সে আপনার তরল নীলিমার অতলস্পর্শ ভয়ের দ্বারা ভীষণ— এবং পর্বত কেবল ধরাতলে নদীর জল জোগাইয়াই ক্ষান্ত নহে, সে যোগনিমগ্ন রুদ্রের মতো ভয়ংকরকে আকাশ জুড়িয়া নিস্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছে— তখন জগতের মধ্যে আমরা হৃদয়ধর্মের পরিচয় পাই। তখন চিরপ্রবীণ বুদ্ধি মাথা নাড়িয়া প্রশ্ন করে, জগৎ জুড়িয়া এত অনাবশ্যক চেষ্টার বাজে খরচ কেন? চিরনবীন হৃদয় বলে, কেবলমাত্র আমাকে

ভুলাইবার জন্যই, আর তো কোনো কারণ দেখি না। হৃদয়ই জানে, জগতের মধ্যে একটি হৃদয় কেবলই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। নহিলে সৃষ্টির মধ্যে এত রূপ, এত গান, এত হাবভাব, এত আভাস-ইঙ্গিত, এত সাজসজ্জা কেন? হৃদয় যে ব্যাবসাদারির কৃপণতায় ভোলে না, সেইজন্যই তাহাকে ভুলাইতে জলে স্থলে আকাশে পদে পদে প্রয়োজনকে গোপন করিয়া এত অনাবশ্যক আয়োজন। জগৎ যদি রসময় না হইত তবে আমরা নিতান্তই ছোটো হইয়া অপমানিত হইয়া থাকিতাম; আমাদের হৃদয় কেবলই বলিত, জগতের যজ্ঞে আমারই নিমন্ত্রণ নাই। কিন্তু সমস্ত জগৎ তাহার অসংখ্য কাজের মধ্যেও রসে ভরিয়া উঠিয়া হৃদয়কে এই মধুর কথাটি বলিতেছে যে, আমি তোমাকে চাই: নানারকম করিয়া চাই; হাসিতে চাই, কান্নাতে চাই; ভয়ে চাই, ভরসায় চাই; ক্ষোভে চাই, শান্তিতে চাই।

এমনি জগতের মধ্যেও আমরা দুটা ব্যাপার দেখিতেছি, একটা কাজের প্রকাশ, একটা ভাবের প্রকাশ। কিন্তু, কাজের ভিতর দিয়া যাহা প্রকাশ হইতেছে তাহাকে সমগ্ররূপে দেখা ও বোঝা আমাদের কর্ম নয়। ইহার মধ্যে যে অমেয় জ্ঞানশক্তি আছে আমাদের জ্ঞান দিয়া তাহার কিনারা পাওয়া যায় না।

কিন্তু ভাবের প্রকাশ একেবারে প্রত্যক্ষ প্রকাশ। সুন্দর যাহা তাহা সুন্দর। বিরাট যাহা তাহা মহান। রুদ্র যাহা তাহা ভয়ংকর। জগতের যাহা রস তাহা একেবারে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং আমাদের হৃদয়ের রসকে বাহিরে টানিয়া আনিতেছে। এই মিলনের মধ্যে লুকোচুরি যতই থাক্‌, বাধাবিঘ্ন যতই ঘটুক, তবু প্রকাশ ছাড়া এবং মিলন ছাড়া ইহার মধ্যে আর-কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তবেই দেখিতেছি, জগৎসংসারে ও মানবসংসারে একটা সাদৃশ্য আছে। ঈশ্বরের সত্যরূপ জ্ঞানরূপ জগতের নানা কাজে প্রকাশ পাইতেছে, আর তাঁহার আনন্দরূপ জগতের নানা রসে প্রত্যক্ষ হইতেছে। কাজের মধ্যে

তাঁহার জ্ঞানকে আয়ত্ত করা শক্ত, রসের মধ্যে তাঁহার আনন্দকে অনুভব করায় জটিলতা নাই। কারণ, রসের মধ্যে তিনি যে নিজেকে প্রকাশই করিতেছেন।

মানুষের সংসারেও আমাদের জ্ঞানশক্তি কাজ করিতেছে, আমাদের আনন্দশক্তি রসের সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। কাজের মধ্যে আমাদের আত্মরক্ষার শক্তি, আর রসের মধ্যে আমাদের আত্মপ্রকাশের শক্তি। আত্মরক্ষা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, আর আত্মপ্রকাশ আমাদের প্রয়োজনের বেশি।

প্রয়োজনে প্রকাশকে এবং প্রকাশে প্রয়োজনকে বাধা দেয়, যুদ্ধের উদাহরণে তাহা দেখাইয়াছি। স্বার্থ বাজে খরচ করিতে চায় না, অথচ বাজে খরচেই আনন্দ আত্মপরিচয় দেয়। এইজন্যই স্বার্থের ক্ষেত্রে আপিসে আমাদের আত্মপ্রকাশ যতই অল্প হয় ততই তাহা শ্রদ্ধেয় হইয়া থাকে, এবং এইজন্যই আনন্দের উৎসবে স্বার্থকে যতই বিস্মৃত হইতে দেখি উৎসব ততই উজ্জ্বল হইতে থাকে।

তাই সাহিত্যে মানুষের আত্মপ্রকাশে কোনো বাধা নাই। স্বার্থ সেখান হইতে দূরে। দুঃখ সেখানে আমাদের হৃদয়ের উপর চোখের জলের বাষ্প সৃজন করে, কিন্তু আমাদের সংসারের উপর হস্তক্ষেপ করে না; ভয় আমাদের হৃদয়কে দোলা দিতে থাকে, কিন্তু আমাদের শরীরকে আঘাত করে না; সুখ আমাদের হৃদয়ে পুলকস্পর্শ সঞ্চার করে, কিন্তু আমাদের লোভকে নাড়া দিয়া অত্যন্ত জাগাইয়া তোলে না। এইরূপে মানুষ আপনার প্রয়োজনের সংসারের ঠিক পাশে-পাশেই একটা প্রয়োজন-ছাড়া সাহিত্যের সংসার রচনা করিয়া চলিয়াছে। সেখানে সে নিজের বাস্তব কোনো ক্ষতি না করিয়া নানা রসের দ্বারা আপনার প্রকৃতিকে নানারূপে অনুভব করিবার আনন্দ পায়, আপনার প্রকাশকে বাধাহীন করিয়া দেখে। সেখানে দায় নাই, সেখানে খুশি। সেখানে পেয়াদা-বরকন্দাজ নাই,

সেখানে স্বয়ং মহারাজা।

এইজন্য, সাহিত্যে আমরা কিসের পরিচয় পাই? না, মানুষের যাহা প্রাচুর্য, যাহা ঐশ্বর্য, যাহা তাহার সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। যাহা তাহার সংসারের মধ্যেই ফুরাইয়া যাইতে পারে নাই।

এইজন্য, ইতিমধ্যে আমার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছি, ভোজনরস যদিচ পৃথিবীতে ছোটো ছেলে হইতে বুড়া পর্যন্ত সকলেরই কাছে সুপরিচিত তবু সাহিত্যে তাহা প্রহসন ছাড়া অন্যত্র তেমন করিয়া স্থান পায় নাই। কারণ, সে রস আহারের তৃপ্তিকে ছাপাইয়া উছলিয়া উঠে না। পেটটি পুরাইয়া একটি জলদগম্ভীর 'আঃ—' বলিয়াই তাহাকে হাতে হাতেই নগদ-বিদায় করিয়া দিই। সাহিত্যের রাজদ্বারে তাহাকে দক্ষিণার জন্য নিমন্ত্রণপত্র দিই না। কিন্তু যাহা আমাদের ভাঁড়ার-ঘরের ভাঁড়ের মধ্যে কিছুতেই কুলায় না সেই-সকল রসের বন্যাই সাহিত্যের মধ্যে ঢেউ তুলিয়া কলধ্বনি করিতে করিতে বহিয়া যায়। মানুষ তাহাকে কাজের মধ্যেই নিঃশেষ করিয়া দিতে পারে না বলিয়াই ভরা হৃদয়ের বেগে সাহিত্যের মধ্যে তাহাকে প্রকাশ করিয়া তবে বাঁচে।

এইরূপ প্রাচুর্যেই মানুষের যথার্থ প্রকাশ। মানুষ যে ভোজনপ্রিয় তাহা সত্য বটে, কিন্তু মানুষ যে বীর ইহাই সত্যতম। মানুষের এই সত্যের জোর সামলাইবে কে? তাহা ভাগীরথীর মতো পাথর গুঁড়াইয়া, ঐরাবতকে ভাসাইয়া, গ্রাম নগর শস্যক্ষেত্রের তৃষ্ণা মিটাইয়া, একেবারে সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। মানুষের বীরত্ব মানুষের সংসারের সমস্ত কাজ সারিয়া দিয়া সংসারকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

এমনি করিয়া স্বভাবতই মানুষের যাহা-কিছু বড়ো, যাহা-কিছু নিত্য, যাহা সে কাজে-কর্মে ফুরাইয়া ফেলিতে পারে না, তাহাই মানুষের সাহিত্যে ধরা পড়িয়া আপনা-আপনি মানুষের বিরাট্‌রূপকেই গড়িয়া তুলে।

আরও একটি কারণ আছে। সংসারে যাহাকে আমরা দেখি তাহাকে ছড়াইয়া দেখি ; তাহাকে এখন একটু তখন একটু, এখানে একটু সেখানে একটু দেখি ; তাহাকে আরও দশটার সঙ্গে মিশাইয়া দেখি। কিন্তু সাহিত্যে সেই-সকল ফাঁক, সেই-সকল মিশাল থাকে না। সেখানে যাহাকে প্রকাশ করা হয় তাহার উপরেই সমস্ত আলো ফেলা হয়। তখনকার মতো আর-কিছুকেই দেখিতে দেওয়া হয় না। তাহার জন্য নানা কৌশলে এমন একটি স্থান তৈরি করিয়া দেওয়া হয় যেখানে সে'ই কেবল দীপ্যমান।

এমন অবস্থায়, এমন জমাট স্বাতন্ত্র্যে, এমন প্রখর আলোকে যাহাকে মানাইবে না তাহাকে আমরা স্বভাবতই এ জায়গায় দাঁড় করাই না। কারণ, এমন স্থানে অযোগ্যকে দাঁড় করাইলে তাহাকে লজ্জিত করা হয়। সংসারের নানা আচ্ছাদনের মধ্যে পেটুক তেমন করিয়া চোখে পড়ে না, কিন্তু সাহিত্যমঞ্চের উপর তাহাকে একাগ্র আলোকে ধরিয়া দেখাইলে সে হাস্যকর হইয়া উঠে। এইজন্য মানুষের যে প্রকাশটি তুচ্ছ নয়, মানব-হৃদয় যাহাকে করুণায় বা বীর্যে, রুদ্রতায় বা শান্তিতে আপনার উপযুক্ত প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত না হয়, যাহা কলানৈপুণ্যের বেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়াইয়া নিত্যকালের অনিমেষ দৃষ্টিপাত মাথা তুলিয়া সহ্য করিতে পারে, স্বভাবতই মানুষ তাহাকেই সাহিত্যে স্থান দেয় ; নহিলে তাহার অসংগতি আমাদের কাছে পীড়াজনক হইয়া উঠে। রাজা ছাড়া আর-কাহাকেও সিংহাসনের উপর দেখিলে আমাদের মনে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়।

কিন্তু সকল মানুষের বিচারবুদ্ধি বড়ো নয়, সকল সমাজও বড়ো নয়, এবং এক-একটা সময় আসে যখন ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র মোহে মানুষকে ছোটো করিয়া দেয়। তখন সেই দুঃসময়ের বিকৃত দর্পণে ছোটো জিনিস বড়ো হইয়া দেখা দেয় এবং তখনকার সাহিত্যে মানুষ আপনার ছোটোকেই বড়ো করিয়া তোলে, আপনার কলঙ্কের উপরেই স্পর্ধার সঙ্গে আলো

ফেলে। তখন কলার বদলে কৌশল, গৌরবের জায়গায় গর্ব এবং টেনিসনের আসনে কিপ্লিঙের আবির্ভাব হয়।

কিন্তু মহাকাল বসিয়া আছেন। তিনি তো সমস্তই ছাঁকিয়া লইবেন। তাঁহার চালুনির মধ্য দিয়া যাহা ছোটো, যাহা জীর্ণ, তাহা গলিয়া ধুলায় পড়িয়া ধুলা হইয়া যায়। নানা কাল ও নানা লোকের হাতে সেই-সকল জিনিসই টেঁকে যাহার মধ্যে সকল মানুষই আপনাকে দেখিতে পায়। এমনি করিয়া বাছাই হইয়া যাহা থাকিয়া যায় তাহা মানুষের সর্বদেশের সর্বকালের ধন।

এমনি করিয়া ভাঙিয়া গড়িয়া সাহিত্যের মধ্যে মানুষের প্রকৃতির, মানুষের প্রকাশের একটি নিত্যকালীন আদর্শ আপনি সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। সেই আদর্শই নূতন যুগের সাহিত্যেরও হাল ধরিয়া থাকে। সেই আদর্শমত'ই যদি আমরা সাহিত্যের বিচার করি তবে সমগ্র মানবের বিচারবুদ্ধির সাহায্য লওয়া হয়।

এইবার আমার আসল কথাটি বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; সেটি এই, সাহিত্যকে দেশকালপাত্রে ছোটো করিয়া দেখিলে ঠিকমত দেখাই হয় না। আমরা যদি এইটে বুঝি যে, সাহিত্যে বিশ্বমানবই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তবে সাহিত্যের মধ্যে আমাদের যাহা দেখিবার তাহা দেখিতে পাইব। যেখানে সাহিত্যরচনায় লেখক উপলক্ষ্যমাত্র না হইয়াছে সেখানে তাহার লেখা নষ্ট হইয়া গেছে। যেখানে লেখক নিজের ভাবনায় সমগ্র মানুষের ভাব অনুভব করিয়াছে, নিজের লেখায় সমগ্র মানুষের বেদনা প্রকাশ করিয়াছে, সেইখানেই তাহার লেখা সাহিত্যে জায়গা পাইয়াছে। তবেই সাহিত্যকে এইভাবে দেখিতে হইবে যে, বিশ্বমানব রাজমিস্ত্রি হইয়া এই মন্দিরটি গড়িয়া তুলিতেছেন; লেখকেরা নানা দেশ ও নানা কাল হইতে আসিয়া তাহার মজুরের কাজ করিতেছে। সমস্ত ইমারতের প্ল্যানটা কী তাহা আমাদের কারও সামনে নাই বটে,

কিন্তু যেটুকু ভুল হয় সেটুকু বার বার ভাঙা পড়ে; প্রত্যেক মজুরকে তাহার নিজের স্বাভাবিক ক্ষমতা খাটাইয়া, নিজের রচনাটুকুকে সমগ্রের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া, সেই অদৃশ্য প্ল্যানের সঙ্গে মিলাইয়া যাইতে হয়; ইহাতেই তাহার ক্ষমতা প্রকাশ পায় এবং এইজন্যই তাহাকে সাধারণ মজুরের মতো কেহ সামান্য বেতন দেয় না, তাহাকে ওস্তাদের মতো সম্মান করিয়া থাকে।

আমার উপরে যে আলোচনার ভার দেওয়া হইয়াছে ইংরেজিতে আপনারা তাহাকে Comparative Literature নাম দিয়াছেন। বাংলায় আমি তাহাকে বিশ্বসাহিত্য বলিব।

কর্মের মধ্যে মানুষ কোন্ কথা বলিতেছে, তাহার লক্ষ্য কী, তাহার চেষ্টা কী, ইহা যদি বুঝিতে হয় তবে সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে মানুষের অভিপ্রায়ের অনুসরণ করিতে হয়। আকবরের রাজত্ব বা গুজরাটের ইতিবৃত্ত বা এলিজাবেথের চরিত্র, এমন করিয়া আলাদা আলাদা দেখিলে কেবল খবর জানার কৌতূহলনিবৃত্তি হয় মাত্র। যে জানে আকবর বা এলিজাবেথ উপলক্ষ্যমাত্র, যে জানে মানুষ সমস্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়া নিজের গভীরতম অভিপ্রায়কে নানা সাধনায় নানা ভুল ও নানা সংশোধনে সিদ্ধ করিবার জন্য কেবলই চেষ্টা করিতেছে, যে জানে মানুষ সকল দিকেই সকলের সহিত বৃহৎভাবে যুক্ত হইয়া নিজেকে মুক্তি দিবার প্রয়াস পাই-তেছে, যে জানে স্বতন্ত্র নিজেকে রাজতন্ত্রে ও রাজতন্ত্র হইতে গণতন্ত্রে সার্থক করিবার জন্য যুঝিয়া মরিতেছে— মানব বিশ্বমানবের মধ্যে আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য, ব্যষ্টি সমষ্টির মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করিবার জন্য নিজেকে লইয়া কেবলই ভাঙাগড়া করিতেছে— সে ব্যক্তি মানুষের ইতিহাস হইতে, লোকবিশেষকে নহে, সেই নিত্যমানুষের নিত্য-সচেষ্ট অভিপ্রায়কে দেখিবারই চেষ্টা করে। সে কেবল তীর্থের যাত্রীদের দেখিয়াই ফিরিয়া আসে না; সমস্ত যাত্রীরা যে একমাত্র দেবতাকে

দেখিবার জন্য নানা দিক হইতে আসিতেছে তাঁহাকে দর্শন করিয়া তবে সে ঘরে ফেরে।

তেমনি সাহিত্যের মধ্যে মানুষ আপনার আনন্দকে কেমন করিয়া প্রকাশ করিতেছে, এই প্রকাশের বিচিত্রমূর্তির মধ্যে মানুষের আত্মা আপনার কোন্ নিত্যরূপ দেখাইতে চায়, তাহাই বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে যথার্থ দেখিবার জিনিস।· সে আপনাকে রোগী না ভোগী না যোগী কোন্ পরিচয়ে পরিচিত করিতে আনন্দবোধ করিতেছে; জগতের মধ্যে মানুষের আত্মীয়তা কতদূর পর্যন্ত সত্য হইয়া উঠিল, অর্থাৎ সত্য কতদূর পর্যন্ত তাহার আপনার হইয়া উঠিল, ইহাই জানিবার জন্য এই সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহাকে কৃত্রিম রচনা বলিয়া জানিলে হইবে না; ইহা একটি জগৎ; ইহার তত্ত্ব আমাদের কোনো ব্যক্তিবিশেষের আয়ত্তাধীন নহে; বস্তুজগতের মতো ইহার সৃষ্টি চলিয়াছেই, অথচ সেই অসমাপ্ত সৃষ্টির অন্তরতম স্থানে একটি সমাপ্তির আদর্শ অচল হইয়া আছে।

সূর্যের ভিতরের দিকে বস্তুপিণ্ড আপনাকে তরল-কঠিন নানা ভাবে গড়িতেছে, সে আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু তাহাকে ঘিরিয়া আলোকের মণ্ডল সেই সূর্যকে কেবলই বিশ্বের কাছে ব্যক্ত করিয়া দিতেছে। এইখানেই সে আপনাকে কেবলই দান করিতেছে, সকলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিতেছে। মানুষকে যদি আমরা সমগ্রভাবে এমনি করিয়া দৃষ্টির বিষয় করিতে পারিতাম তবে তাহাকে এইরূপ সূর্যের মতোই দেখিতাম। দেখিতাম, তাহার বস্তুপিণ্ড ভিতরে ভিতরে ধীরে ধীরে নানা স্তরে বিন্যস্ত হইয়া উঠিতেছে, আর তাহাকে ঘিরিয়া একটি প্রকাশের জ্যোতির্মণ্ডলী নিয়তই আপনাকে চারি দিকে বিকীর্ণ করিয়াই আনন্দ পাইতেছে। সাহিত্যকে মানুষের চারি দিকে সেই ভাষারচিত প্রকাশ-মণ্ডলীরূপে একবার দেখো। এখানে জ্যোতির ঝড় বহিতেছে, জ্যোতির উৎস উঠিতেছে, জ্যোতির্বাষ্পের সংঘাত ঘটিতেছে।

লোকালয়ের পথ দিয়া চলিতে চলিতে যখন দেখিতে পাও মানুষের অবকাশ নাই— মুদি দোকান চালাইতেছে, কামার লোহা পিটিতেছে, মজুর বোঝা লইয়া চলিয়াছে, বিষয়ী আপনার খাতার হিসাব মিলাইতেছে — সেই সঙ্গে আর-একটা জিনিস চোখে দেখিতে পাইতেছ না, কিন্তু একবার মনে মনে দেখো : এই রাস্তার দুই ধারে ঘরে-ঘরে দোকানে-বাজারে অলিতে-গলিতে কত শাখায়-প্রশাখায় রসের ধারা কত পথ দিয়া কত মলিনতা কত সংকীর্ণতা কত দারিদ্র্যের উপরে কেবলই আপনাকে প্রসারিত করিয়া দিতেছে ; রামায়ণ-মহাভারত কথা-কাহিনী কীর্তন-পাঁচালি বিশ্বমানবের হৃদয়সুধাকে প্রত্যেক মানবের কাছে দিনরাত বাঁটিয়া দিতেছে ; নিতান্ত তুচ্ছ লোকের ক্ষুদ্র কাজের পিছনে রাম লক্ষ্মণ আসিয়া দাঁড়াইতেছেন ; অন্ধকার বাসার মধ্যে পঞ্চবটীর করুণামিশ্রিত হাওয়া বহিতেছে ; মানুষের হৃদয়ের সৃষ্টি হৃদয়ের প্রকাশ মানুষের কর্মক্ষেত্রের কাঠিন্য ও দারিদ্র্যকে তাহার সৌন্দর্য ও মঙ্গলের কঙ্কণ-পরা দুটি হাত দিয়া বেড়িয়া রহিয়াছে। সমস্ত সাহিত্যকে সমস্ত মানুষের চারি দিকে একবার এমনি করিয়া দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে, মানুষ আপনার বাস্তব সত্তাকে ভাবের সত্তায় নিজের চতুর্দিকে আরও অনেক দূর পর্যন্ত বাড়াইয়া লইয়া গেছে। তাহার বর্ষার চারি দিকে কত গানের বর্ষা, কাব্যের বর্ষা, কত মেঘদূত, কত বিদ্যাপতি বিস্তীর্ণ হইয়া আছে ; তাহার ছোটো ঘরটির সুখদুঃখকে সে কত চন্দ্রসূর্যবংশীয় রাজাদের সুখদুঃখের কাহিনীর মধ্যে বড়ো করিয়া তুলিয়াছে ! তাহার ঘরের মেয়েটিকে ঘিরিয়া গিরিরাজকন্যার করুণা সর্বদা সঞ্চরণ করিতেছে ; কৈলাসের দরিদ্রদেবতার মহিমার মধ্যে সে আপনার দারিদ্র্যদুঃখকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে ! এইরূপে অনবরত মানুষ আপনার চারি দিকে যে বিকিরণ সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে বাহিরে যেন নিজেকে নিজে ছাড়াইয়া, নিজেকে নিজে বাড়াইয়া চলিতেছে। যে মানুষ অবস্থার দ্বারা

সংকীর্ণ সেই মানুষ নিজের ভাবসৃষ্টিদ্বারা নিজের এই-যে বিস্তার রচনা করিতেছে, সংসারের চারি দিকে যাহা একটি দ্বিতীয় সংসার, তাহাই সাহিত্য।

এই বিশ্বসাহিত্যে আমি আপনাদের পথপ্রদর্শক হইব এমন কথা মনেও করিবেন না। নিজের নিজের সাধ্য-অনুসারে এ পথ আমাদের সকলকে কাটিয়া চলিতে হইবে। আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাহিয়াছিলাম যে পৃথিবী যেমন আমার খেত এবং তোমার খেত এবং তাঁহার খেত নহে, পৃথিবীকে তেমন করিয়া জানা অত্যন্ত গ্রাম্যভাবে জানা, তেমনি সাহিত্য আমার রচনা, তোমার রচনা এবং তাঁহার রচনা নহে। আমরা সাধারণত সাহিত্যকে এমনি করিয়াই গ্রাম্যভাবেই দেখিয়া থাকি। সেই গ্রাম্য সংকীর্ণতা হইতে নিজেকে মুক্তি দিয়া বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে বিশ্বমানবকে দেখিবার লক্ষ্য আমরা স্থির করিব, প্রত্যেক লেখকের রচনার মধ্যে একটি সমগ্রতাকে গ্রহণ করিব এবং সেই সমগ্রতার মধ্যে সমস্ত মানুষের প্রকাশচেষ্টার সম্বন্ধ দেখিব, এই সংকল্প স্থির করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

মাঘ ১৩১৩

সৌন্দর্য ও সাহিত্য

'সৌন্দর্যবোধ' ও 'বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধে আমার বক্তব্য বিষয়টি স্পষ্ট হয় নাই, এমন অপবাদ প্রচার হওয়াতে যথাসাধ্য পুনরুক্তি বাঁচাইয়া মূলকথাটা পরিষ্কার করিয়া লইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।

যেমন জগতে যে ঘটনাটিকে কেবল এইমাত্র জানি যে তাহা ঘটিতেছে, কিন্তু কেন ঘটিতেছে, তাহার পূর্বাপর কী, জগতের অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কোথায়, তাহা না জানিলে তাহাকে পুরাপুরি আমাদের জ্ঞানে জানা হয় না— তেমনি জগতে যে সত্য কেবল আছে মাত্র বলিয়াই জানি, কিন্তু তাহাতে আমার কোনো আনন্দই নাই, তাহা আমার হৃদয়ের পক্ষে একেবারে নাই বলিলেই হয়। এই-যে এতবড়ো জগতে আমরা রহিয়াছি ইহার অনেকটাকেই আমাদের জানা-জগতের সম্পূর্ণ সামিল করিয়া আনিতে পারি নাই এবং ইহার অধিকাংশই আমাদের মনোহর জগতের মধ্যে ভুক্ত হইয়া আমাদের আপন হইয়া উঠে নাই।

অথচ, (জগতের যতটা জ্ঞানের দ্বারা আমি জানিব ও হৃদয়ের দ্বারা আমি পাইব ততটা আমারই ব্যাপ্তি, আমারই বিস্তৃতি। জগৎ যে পরিমাণে আমার অতীত সেই পরিমাণে আমিই ছোটো। সেইজন্য আমার মনোবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি, আমার কর্মশক্তি নিখিলকে কেবলই অধিক করিয়া অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। এমনি করিয়াই আমাদের সত্তা সত্যে ও শক্তিতে বিস্তৃত হইয়া উঠে।)

(এই বিকাশের ব্যাপারে আমাদের সৌন্দর্যবোধ কোন্ কাজে লাগে?) সে কি সত্যের যে বিশেষ অংশকে আমরা বিশেষ করিয়া সুন্দর বলি কেবল তাহাকেই আমাদের হৃদয়ের কাছে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া বাকি অংশকে ম্লান ও তিরস্কৃত করিয়া দেয়? তা যদি হয় তবে তো সৌন্দর্য

আমাদের বিকাশের বাধা, নিখিল সত্যের মধ্যে হৃদয়কে ব্যাপ্ত হইতে দিবার পক্ষে সে আমাদের অন্তরায়। সে তো তবে সত্যের মাঝখানে বিন্ধ্যাচলের মতো উঠিয়া তাহাকে সুন্দর-অসুন্দরের আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পরস্পরের মধ্যে চলাচলের পথকে দুর্গম করিয়া রাখিয়াছে। আমি বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে তাহা নহে; (জ্ঞান যেমন ক্রমে ক্রমে সমস্ত সত্যকেই আমাদের বুদ্ধিশক্তির আয়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে সৌন্দর্যবোধও তেমনি সমস্ত সত্যকেই ক্রমে ক্রমে আমাদের আনন্দের অধিকারে আনিবে, এই তাহার একমাত্র সার্থকতা। সমস্তই সত্য, এইজন্য সমস্তই আমাদের জ্ঞানের বিষয়। এবং সমস্তই সুন্দর, এইজন্য সমস্তই আমাদের আনন্দের সামগ্রী।)

গোলাপফুল আমার কাছে যে কারণে সুন্দর সমগ্র জগতের মধ্যে সেই কারণটি বড়ো করিয়া রহিয়াছে। বিশ্বের মধ্যে সেইরূপ উদার প্রাচুর্য অথচ তেমনি কঠিন সংযম; তাহার কেন্দ্রাতিগ শক্তি অপরিসীম বৈচিত্র্যে আপনাকে চতুর্দিকে সহস্রধা করিতেছে এবং তাহার কেন্দ্রানুগ শক্তি এই উদ্দাম বৈচিত্র্যের উল্লাসকে একটিমাত্র পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্যে মিলাইয়া রাখিয়াছে। এই-যে এক দিকে ফুটিয়া পড়া এবং আর-এক দিকে আঁটিয়া ধরা, ইহারই ছন্দে ছন্দে সৌন্দর্য; বিশ্বের মধ্যে এই ছাড়-দেওয়া এবং টান রাখার নিত্যলীলাতেই সুন্দর আপনাকে সর্বত্র প্রকাশ করিতেছেন। জাদুকর অনেকগুলি গোলা লইয়া যখন খেলা করে তখন গোলাগুলিকে একসঙ্গে ছুঁড়িয়া ফেলা এবং লুফিয়া ধরার দ্বারাই আশ্চর্য চাতুর্য ও সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিতে থাকে। ইহার মধ্যে যদি কোনো-একটা গোলার কেবল ক্ষণকালীন অবস্থা আমাদের চোখে পড়ে তবে হয় তাহার ওঠা নয় পড়া দেখি; তাহাতে দেখার পূর্ণতা হয় না বলিয়া আনন্দের পূর্ণতা ঘটে না। (জগতের আনন্দলীলাকেও আমরা যতই পূর্ণতররূপে দেখি ততই জানিতে পারি, ভালোমন্দ সুখদুঃখ জীবনমৃত্যু সমস্তই উঠিয়া

ও পড়িয়া বিশ্বসংগীতের ছন্দ রচনা করিতেছে ; সমগ্রভাবে দেখিলে এই ছন্দের কোথাও বিচ্ছেদ নাই, সৌন্দর্যের কোথাও লাঘব নাই। জগতের মধ্যে সৌন্দর্যকে এইরূপ সমগ্রভাবে দেখিতে শেখাই সৌন্দর্যবোধের শেষ লক্ষ্য।) মানুষ তেমনি করিয়া দেখিবার দিকে যতই অগ্রসর হইতেছে তাহার আনন্দকে ততই জগতের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিতেছে ; পূর্বে যাহা নিরর্থক ছিল ক্রমেই তাহা সার্থক হইয়া উঠিতেছে, পূর্বে সে যাহার প্রতি উদাসীন ছিল ক্রমে সে তাহাকে আপনার সঙ্গে মিলাইয়া লইতেছে, এবং যাহাকে বিরুদ্ধ বলিয়া জানিত তাহাকে বৃহতের মধ্যে দেখিয়া তাহার ঠিক স্থানটিকে দেখিতে পাইতেছে ও তৃপ্তিলাভ করিতেছে। (বিশ্বের সমগ্রের মধ্যে মানুষের এই সৌন্দর্যকে দেখার বৃত্তান্ত, জগৎকে তাহার আনন্দের দ্বারা অধিকার করিবার ইতিহাস, মানুষের সাহিত্যে আপনা-আপনি রক্ষিত হইতেছে।)

(কিন্তু সৌন্দর্যকে অনেক সময় আমরা নিখিল-সত্য হইতে পৃথক করিয়া দেখি এবং তাহাকে লইয়া দল বাঁধিয়া বেড়াই, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।) য়ুরোপে সৌন্দর্যচর্চা সৌন্দর্যপূজা বলিয়া একটা সাম্প্রদায়িক ধুয়া আছে। সৌন্দর্যের বিশেষ ভাবের অনুশীলনটা যেন একটা বিশেষ বাহাদুরির কাজ, এইরূপ ভঙ্গিতে একদল লোক তাহার জয়ধ্বজা উড়াইয়া বেড়ায়। স্বয়ং ঈশ্বরকেও এইরূপ নিজের বিশেষদলভুক্ত করিয়া, বড়াই করিয়া এবং অন্য দলের সঙ্গে লড়াই করিয়া বেড়াইতে মানুষকে দেখা গিয়াছে।

বলা বাহুল্য, সৌন্দর্যকে চারি দিক হইতে বিশেষ করিয়া লইয়া জগতের আর-সমস্ত ডিঙাইয়া কেবল তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়ানো সংসারের পনেরো-আনা লোকের কর্ম নহে। কেবলই সুন্দর-অসুন্দর বাঁচাইয়া জৈন তপস্বীদের মতো প্রতি পদক্ষেপের হিসাব লইয়া চলিতে গেলে চলাই হয় না।

পৃথিবীতে, কী সৌন্দর্যে কী শুচিতায় যাহাদের হিসাব নিরতিশয় সূক্ষ্ম

তাহারা মোটা-হিসাবের লোকদিগকে অবজ্ঞা করে; তাহাদিগকে বলে গ্রাম্য। মোটা-হিসাবের লোকেরা সসংকোচে তাহা স্বীকার করিয়া লয়।

য়ুরোপের সাহিত্যে সৌন্দর্যের দোহাই দিয়া, যাহা-কিছু প্রচলিত, যাহা-কিছু প্রাকৃত, তাহাকে তুচ্ছ, তাহাকে humdrum বলিয়া একেবারে ঝাঁটাইয়া দিবার চেষ্টা কোনো কোনো জায়গায় দেখা যায়। আমার বেশ মনে আছে, অনেক দিন হইল, কোনো বড়ো লেখকের লেখা একখানি ফরাসি বহির ইংরেজি তর্জমা পড়িয়াছিলাম। সে বইখানি নামজাদা। কবি সুইন্‌বরন্ তাহাকে Gospel of Beauty অর্থাৎ সৌন্দর্যের ধর্মশাস্ত্র উপাধি দিয়াছেন। তাহাতে এক দিকে একজন পুরুষ ও আর-এক দিকে একজন স্ত্রীলোক আপনার সম্পূর্ণ মনের-মতনকে পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর মধ্যে খুঁজিয়া বেড়ানোকেই জীবনের ব্রত করিয়াছে। সংসারের যাহা-কিছু প্রতি দিনের, যাহা-কিছু চারি দিকের, যাহা-কিছু সাধারণ, তাহা হইতে কোনোমতে আপনাকে বাঁচাইয়া, অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার সামান্যতাকে পদে পদে অপমান করিয়া, সমস্ত বইখানির মধ্যে আশ্চর্য লিপিচাতুর্যের সহিত রঙের পর রঙ, সুরের পর সুর চড়াইয়া সৌন্দর্যের একটি অতিদুর্লভ উৎকর্ষের প্রতি একটি অতিতীব্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করা হইয়াছে। আমার তো মনে হয়, এমন নিষ্ঠুর বই আমি পড়ি নাই। আমার কেবলই মনে হইতেছিল, সৌন্দর্যের টান মানুষের মনকে যদি সংসার হইতে এমনি করিয়া ছিনিয়া লয়, মানুষের বাসনাকে তাহার চারি দিকের সহিত যদি কোনোমতেই খাপ খাইতে না দেয়, যাহা প্রচলিত তাহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রচার করে, যাহা হিতকর তাহাকে গ্রাম্য বলিয়া পরিহাস করিতে থাকে, তবে সৌন্দর্যে ধিক্ থাক্। এ যেন আঙুরকে দলিয়া তাহার সমস্ত কান্তি ও রসগন্ধ বাদ দিয়া কেবলমাত্র তাহার মদটুকুকেই চোলাইয়া লওয়া।

(সৌন্দর্য জাত মানিয়া চলে না, সে সকলের সঙ্গেই মিশিয়া আছে।)

(সে আমাদের ক্ষণকালের মাঝখানেই চিরন্তনকে, আমাদের সামান্যের মুখশ্রীতেই চিরবিস্ময়কে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়া দেয়। সমস্ত জগতের যেটি মূলসুর সৌন্দর্য সেটি আমাদের মনের মধ্যে ধরাইয়া দেয়, সমস্ত সত্যকে তাহার সাহায্যে নিবিড় করিয়া দেখিতে পাই।) একদিন ফাল্গুনমাসের দিনশেষে অতি সামান্য যে একটা গ্রামের পথ দিয়া চলিয়াছিলাম, বিকশিত সর্ষের খেত হইতে গন্ধ আসিয়া সেই বাঁকা রাস্তা, সেই পুকুরের পাড়, সেই ঝিকিমিকি বিকালবেলাটিকে আমার হৃদয়ের মধ্যে চিরদিনের করিয়া দিয়াছে। যাহাকে চাহিয়া দেখিতাম না তাহাকে বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছে, যাহাকে ভুলিতাম তাহাকে ভুলিতে দেয় নাই। সৌন্দর্যে আমরা যেটিকে দেখি কেবল সেইটিকেই দেখি এমন নয়, তাহার যোগে আর-সমস্তকেই দেখি; মধুর গান সমস্ত জল স্থল আকাশকে, অস্তিত্বমাত্রকেই মর্যাদা দান করে। যাঁহারা সাহিত্যবীর তাঁহারাও অস্তিত্বমাত্রের গৌরবঘোষণা করিবার ভার লইয়াছেন। তাঁহারা ভাষা ছন্দ ও রচনা-রীতির সৌন্দর্য দিয়া এমন-সকল জিনিসকে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করেন অতিপ্রত্যক্ষ বলিয়াই আমরা যাহাদিগকে চাহিয়া দেখি না। অভ্যাসবশত সামান্যকে আমরা তুচ্ছ বলিয়াই জানি; তাঁহারা সেই সামান্যের প্রতি তাঁহাদের রচনাসৌন্দর্যের সমাদর অর্পণ করিবামাত্র আমরা দেখিতে পাই, তাহা সামান্য নহে, সৌন্দর্যের বেষ্টনে তাহার সৌন্দর্য ও তাহার মূল্য ধরা পড়িয়াছে। সাহিত্যের আলোকে আমরা অতিপরিচিতকে নূতন করিয়া দেখিতে পাই বলিয়া, সুপরিচিত এবং অপরিচিতকে আমরা একই বিস্ময়পূর্ণ অপূর্বতার মধ্যে গভীর করিয়া উপলব্ধি করি।

কিন্তু মানুষের যখন বিকৃতি ঘটে তখন সৌন্দর্যকে সে তাহার পরিবেশ হইতে স্বতন্ত্র-করিয়া তাহাকে উল্টা কাজে লাগাইতে থাকে। মাথাকে শরীর হইতে কাটিয়া লইলে সেই কাটা মুণ্ড শরীরের যেমন বিরুদ্ধ হয়, এ

তেমনি। সাধারণ হইতে বিশেষ করিয়া লইলে সাধারণের বিরুদ্ধে সৌন্দর্যকে দাঁড় করানো হয়; তাহাকে সত্যের ঘর-শত্রু করিয়া তাহার সাহায্যে সামান্যের প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণা জন্মাইবার উপায় করা হয়। বস্তুত সে জিনিসটা তখন সৌন্দর্যের যথার্থ ধর্মই পরিহার করে। ধর্মই বলো, সৌন্দর্যই বলো, যে-কোনো বড়ো জিনিসই বলো-না, যখনই তাহাকে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া একটু বিশেষ করিয়া লইবার চেষ্টা করা হয় তখনই তাহার স্বরূপটি নষ্ট হইয়া যায়। নদীকে আমার করিয়া লইবার জন্য বাঁধিয়া লইলে সে আর নদীই থাকে না, সে পুকুর হইয়া পড়ে।

এইরূপে সংসারে অনেকে সৌন্দর্যকে সংকীর্ণ করিয়া তাহাকে ভোগবিলাসের, অহংকারের ও মত্ততার সামগ্রী করিয়া তোলাতেই কোনো কোনো সম্প্রদায় সৌন্দর্যকে বিপদ বলিয়াই গণ্য করিয়াছে। তাহারা বলে, সৌন্দর্য কেবল কনকলঙ্কাপুরী মজাইবার জন্যই আছে।

ঈশ্বরের প্রসাদে বিপদ কিসে নাই? জলে বিপদ, স্থলে বিপদ, আগুনে বিপদ, বাতাসে বিপদ। বিপদই আমাদের কাছে প্রত্যেক জিনিসের সত্য পরিচয় ঘটায়, তাহার ঠিক ব্যবহারটি শিখাইতে থাকে।

ইহার উত্তরে কথা উঠিবে, জলে-স্থলে আগুনে-বাতাসে আমাদের এত প্রয়োজন যে তাহাদের নহিলে এক মুহূর্ত টিকিতে পারি না, সুতরাং সমস্ত বিপদ স্বীকার করিয়াই তাহাদিগকে সকল রকম করিয়া চিনিয়া লইতে হয়, কিন্তু সৌন্দর্যরসভোগ আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে, সুতরাং তাহা নিছক বিপদ, অতএব তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য এই বুঝি— ঈশ্বর আমাদের মন পরীক্ষা করিবার জন্যই সৌন্দর্যের মায়ামৃগকে আমাদের সম্মুখে দৌড় করাইতেছেন; ইহার প্রলোভনে আমরা অসাবধান হইলেই জীবনের সারধনটি চুরি যায়!

রক্ষা করো! ঈশ্বর পরীক্ষক এবং সংসার পরীক্ষাস্থল, এই-সমস্ত মিথ্যা বিভীষিকার কথা আর সহ্য হয় না। আমাদের নকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে

ঈশ্বরের খাঁটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা করিয়ো না। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নাই এবং পরীক্ষার কোনো প্রয়োজনই নাই। সে বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র শিক্ষাই আছে। সেখানে কেবল বিকাশেরই ব্যাপার চলিতেছে। সেইজন্য,(মানুষের মনে সৌন্দর্যবোধ যে এমন প্রবল হইয়াছে সে আমাদের বিকাশ ঘটাইবে বলিয়াই।) বিপদ থাকে তো থাক্, তাই বলিয়া বিকাশের পথকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া চলিলে মঙ্গল নাই।

(বিকাশ বলিতে কী বুঝায় সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সমগ্রের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগ যত রকম করিয়া যতদূর ব্যাপ্ত হইতে থাকে ততই প্রত্যেকের বিকাশ।)স্বর্গরাজ ইন্দ্র যদি আমাদের সেই যোগসাধনের বিঘ্ন ঘটাইবার জন্যই সৌন্দর্যকে মর্তে পাঠাইয়া দেন ইহা সত্য হয়, তবে ইন্দ্রদেবের সেই প্রবঞ্চনাকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া দুই চক্ষু মুদিয়া থাকাই শ্রেয়, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

কিন্তু ইন্দ্রদেবের প্রতি আমার লেশমাত্র অবিশ্বাস নাই। তাঁহার কোনো দূতকেই মারিয়া খেদাইতে হইবে এমন কথা আমি বলিতে পারিব না। এ কথা নিশ্চয়ই জানি,(সত্যের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের প্রগাঢ় এবং অখণ্ড মিলন ঘটাইবার জন্যই সৌন্দর্যবোধ হাসিমুখে আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে। সে কেবল বিনা প্রয়োজনের মিলন, সে কেবলমাত্র আনন্দের মিলন। নীলাকাশ যখন নিতান্তই শুধু শুধু আমাদের হৃদয় দখল করিয়া সমস্ত শ্যামল পৃথিবীর উপর তাহার জ্যোতির্ময় পীতাম্বরটি ছড়াইয়া দেয় তখনই আমরা বলি, সুন্দর!) বসন্তে গাছের নূতন কচি পাতা বনলক্ষ্মীদের আঙুলগুলির মতো যখন একেবারেই বিনা আবশ্যকে আমাদের দুই চোখকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিতে থাকে তখনই আমাদের মনে সৌন্দর্যরস উছলিয়া উঠে।

(কিন্তু সৌন্দর্যবোধ কেবল সুন্দর-নামক সত্যের একটা অংশের দিকেই আমাদের হৃদয়কে টানে ও বাকি অংশ হইতে আমাদের হৃদয়কে ফিরাইয়া

দেয়,) তাহার এই অন্যায় বদনাম কেমন করিয়া ঘুচানো যাইবে, সেই কথাই ভাবিতেছি।

আমাদের জ্ঞানশক্তিই কি জগতের সমস্ত সত্যকেই এখনই আমাদের জানার মধ্যে আনিয়াছে? আমাদের কর্মশক্তিই কি জগতের সমস্ত শক্তিকে আজই আমাদের ব্যবহারের আয়ত্ত করিয়াছে? জগতের এক অংশ আমাদের জানা, অধিকাংশই অজানা; বিশ্বশক্তির সামান্য অংশ আমাদের কাজে খাটিতেছে, অধিকাংশকেই আমরা ব্যবহারে লাগাইতে পারি নাই। তা হউক, তবু আমাদের জ্ঞান সেই জানা জগৎ ও না-জানা জগতের দ্বন্দ্ব প্রতিদিন একটু একটু ঘুচাইয়া চলিয়াছে; যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া জগতের সমস্ত সত্যকে ক্রমে আমাদের বুদ্ধির অধিকারে আনিতেছে ও জগৎকে আমাদের মনের জগৎ, আমাদের জ্ঞানের জগৎ, করিয়া তুলিতেছে। আমাদের কর্মশক্তি জগতের সমস্ত শক্তিকে ব্যবহারের দ্বারা ক্রমে ক্রমে আপন করিয়া তুলিতেছে এবং বিদ্যুৎ জল অগ্নি বাতাস দিনে দিনে আমাদেরই বৃহৎ কর্মশরীর হইয়া উঠিতেছে।(আমাদের সৌন্দর্য-বোধও ক্রমে ক্রমে সমস্ত জগৎকে আমাদের আনন্দের জগৎ করিয়া তুলিতেছে; সেই দিকেই তাহার গতি। জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার মন ব্যাপ্ত হইবে, কর্মের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার শক্তি ব্যাপ্ত হইবে, এবং সৌন্দর্যবোধের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার আনন্দ ব্যাপ্ত হইবে, মনুষ্যত্বের ইহাই লক্ষ্য। অর্থাৎ জগৎকে জ্ঞানরূপে পাওয়া, শক্তিরূপে পাওয়া ও আনন্দরূপে পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে।)

(কিন্তু পাওয়া না-পাওয়ার বিরোধের ভিতর দিয়া ছাড়া, পাওয়া যাইতেই পারে না; দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া ছাড়া বিকাশ হইতেই পারে না— সৃষ্টির গোড়াকার এই নিয়ম।) একের দুই হওয়া এবং দুয়ের এক হইতে থাকাই বিকাশ।

বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখো। মানুষের একদিন এমন অবস্থা ছিল যখন

সে গাছে পাথরে মানুষে মেঘে চন্দ্রে সূর্যে নদীতে পর্বতে প্রাণী-অপ্রাণীর ভেদ দেখিতে পাইত না। তখন সবই তাহার কাছে যেন সমানধর্মাবলম্বী ছিল। ক্রমে তাহার বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধিতে প্রাণী ও অপ্রাণীর ভেদ একান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপে অভেদ হইতে প্রথমে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। তাহা যদি না হইত, তবে প্রাণের প্রকৃত লক্ষণগুলিকে সে কোনোদিন জানিতেই পারিত না। এ দিকে লক্ষণগুলিকে যতই সে সত্য করিয়া জানিতে লাগিল দ্বন্দ্ব ততই দূরে সরিয়া যাইতে থাকিল। প্রথমে প্রাণী ও উদ্ভিদের মাঝখানের গণ্ডিটা ঝাপসা হইয়া আসিল ; কোথায় উদ্ভিদের শেষ ও প্রাণীর আরম্ভ তাহা আর ঠাহর করা যায় না। তাহার পরে আজ ধাতুদ্রব্য, যাহাকে জড় বলিয়া নিশ্চিন্ত আছি, তাহার মধ্যেও প্রাণের লক্ষণ বিজ্ঞানের চক্ষে ধরা দিবার উপক্রম করিতেছে। অতএব যে ভেদ-বুদ্ধির সাহায্যে আমরা প্রাণ-জিনিসটাকে চিনিয়াছি, চেনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভেদটা ক্রমেই লুপ্ত হইতে থাকিবে, অভেদ হইতে দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্ব হইতেই ঐক্য বাহির হইবে এবং অবশেষে বিজ্ঞান একদিন উপনিষদের ঋষিদের সঙ্গে সমান সুরে বলিবে : সর্বং প্রাণ এজতি। সমস্তই প্রাণে কম্পিত হইতেছে।

যেমন সমস্তই প্রাণে কাঁপিতেছে তেমনি সমস্তই আনন্দ, উপনিষদ এ কথাও বলিয়াছেন। জগতের এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দরূপ দেখিবার পথে সুন্দর-অসুন্দরের ভেদটা প্রথমে একান্ত হইয়া মাথা তোলে। নহিলে সুন্দরের পরিচয় ঘটা একেবারে অসম্ভব।

(আমাদের সৌন্দর্যবোধের প্রথমাবস্থায় সৌন্দর্যের একান্ত স্বাতন্ত্র্য আমাদিগকে যেন ঘা মারিয়া জাগাইতে চায়। এইজন্য বৈপরীত্য তাহার প্রথম অস্ত্র। খুব একটা টকটকে রঙ, খুব একটা গঠনের বৈচিত্র্য, নিজের চারি দিকের ম্লানতা হইতে যেন ফুঁড়িয়া উঠিয়া আমাদিগকে হাঁক দিয়া ডাকে।) সংগীত কেবল উচ্চশব্দের উত্তেজনা আশ্রয় করিয়া আকাশ মাত

করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। অবশেষে সৌন্দর্যবোধ যতই বিকাশ পায় ততই স্বাতন্ত্র্য নহে, সুসংগতি— আঘাত নহে, আকর্ষণ— আধিপত্য নহে, সামঞ্জস্য আমাদিগকে আনন্দ দান করে। (এইরূপে সৌন্দর্যকে প্রথমে চারি দিক হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া সৌন্দর্যকে চিনিবার চর্চা করি, তাহার পরে সৌন্দর্যকে চারি দিকের সঙ্গে মিলাইয়া লইয়া চারি দিককেই সুন্দর বলিয়া চিনিতে পারি।)

(একটুখানির মধ্যে দেখিলে আমরা অনিয়ম দেখি, চারি দিকের সঙ্গে অখণ্ড করিয়া মিলাইয়া দেখিলেই নিয়ম আমাদের কাছে ধরা পড়ে); তখন যদিচ ধোঁওয়া আকাশে উড়িয়া যায় ও ঢেলা মাটিতে পড়ে, সোলা জলে ভাসে ও লোহা জলে ডোবে, তবু এই-সমস্ত দ্বৈতের মধ্যে ভারাকর্ষণের এক নিয়মের কোথাও বিচ্ছেদ দেখি না।

(জ্ঞানকে ভ্রমমুক্ত করিবার এই যেমন উপায় তেমনি আনন্দকেও বিশুদ্ধ করিতে হইলে তাহাকে খণ্ডতা হইতে ছুটি দিয়া সমগ্রের সহিত যুক্ত করিতে হইবে।) যেমন, উপস্থিত যাহাই প্রতীতি হয় তাহাকেই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে বিজ্ঞানে বাধে, তেমনি উপস্থিত যাহাই আমাদিগকে মুগ্ধ করে তাহাকেই সুন্দর বলিয়া ধরিয়া লইলে আনন্দের বিঘ্ন ঘটে। আমাদের প্রতীতিকে নানা দিক দিয়া সর্বত্র যাচাই করিয়া লইলে তবেই তাহার সত্যতা স্থির হয়; তেমনি আমাদের অনুভূতিকেও তখনই আনন্দ বলিতে পারি যখন সংসারের সকল দিকেই সে মিশ খায়। মাতাল মদ খাইয়া যতই সুখবোধ করুক, নানা দিকেই সে সুখের বিরোধ; তাহার আপনার সুখ, অন্যের দুঃখ; তাহার আজিকার সুখ, কালিকার দুঃখ; তাহার প্রকৃতির এক অংশের সুখ, প্রকৃতির অন্য অংশের দুঃখ। অতএব এ সুখে সৌন্দর্য নষ্ট হয়, আনন্দ ভঙ্গ হয়। প্রকৃতির সমস্ত সত্যের সঙ্গে ইহার মিল হয় না।

(নানা দ্বন্দ্ব নানা সুখদুঃখের ভিতর দিয়া মানুষ সুন্দরকে আনন্দকে

সত্যের সব দিকে ছড়াইয়া বৃহৎ করিয়া চিনিয়া লইতেছে।) তাহার এই চেনা কোথায় সঞ্চিত হইতেছে? জগদ্‌ব্যাপার সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অনেক দিন হইতে অনেক লোকের দ্বারা স্মৃতিবদ্ধ হইয়া বিজ্ঞানের ভাণ্ডার ভরিয়া তুলিতেছে ; এই সুযোগে এক জনের দেখা আর-এক জনের দেখার সঙ্গে, এক কালের দেখা আর-এক কালের দেখার সঙ্গে পরখ করিয়া লইবার সুবিধা হয়। এমন নহিলে বিজ্ঞান পাকা হইতেই পারে না। তেমনি মানুষকর্তৃক সুন্দরের পরিচয়, আনন্দের পরিচয়, দেশে দেশে কালে কালে সাহিত্যে সঞ্চিত হইতেছে। সত্যের উপরে মানুষের হৃদয়ের অধিকার কোন্ পথ দিয়া কেমন করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে, সুখবোধ কেমন করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে ক্রমে প্রসারিত হইয়া মানুষের সমস্ত মন ধর্ম-বুদ্ধি ও হৃদয়কে অধিকার করিয়া লইতেছে ও এমনি করিয়া ক্ষুদ্রকেও মহৎ এবং দুঃখকেও প্রিয় করিয়া তুলিতেছে, মানুষ নিয়তই আপনার সাহিত্যে সেই পথের চিহ্ন রাখিয়া চলিয়াছে। (যাঁহারা বিশ্বসাহিত্যের পাঠক তাঁহারা সাহিত্যের ভিতর দিয়া সেই রাজপথটির অনুসরণ করিয়া সমস্ত মানুষ হৃদয় দিয়া কী চাহিতেছে ও হৃদয় দিয়া কী পাইতেছে, সত্য কেমন করিয়া মানুষের কাছে মঙ্গলরূপ ও আনন্দরূপ ধরিতেছে, তাহাই সন্ধান করিয়া ও অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইবেন।)

(ইহা মনে রাখিতে হইবে, মানুষ কী জানে তাহাতে নয়, কিন্তু মানুষ কিসে আনন্দ পায় তাহাতেই মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়।) মানুষের সেই পরিচয়ই আমাদের কাছে ঔৎসুক্যজনক। যখন দেখি সত্যের জন্য কেহ নির্বাসন স্বীকার করিতেছে তখন সেই বীরপুরুষের আনন্দের পরিধি আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। দেখিতে পাই, সে আনন্দ এতবড়ো জায়গা অধিকার করিয়া আছে যে, নির্বাসনদুঃখ অনায়াসে তাহার অঙ্গ হইয়াছে। এই দুঃখের দ্বারাই আনন্দের মহত্ত্ব প্রমাণ হইতেছে। টাকার মধ্যেই যাহার আনন্দ সে টাকার ক্ষতির ভয়ে অসত্যকে অপমানকে

অনায়াসে স্বীকার করে ; সে চাকরি বজায় রাখিতে অন্যায় করিতে কুণ্ঠিত হয় না ; এই লোকটি যত পরীক্ষাই পাস করুক, ইহার যত বিদ্যাই থাক্‌, আনন্দশক্তির সীমাতেই ইহার যথার্থ পরিচয়টি পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের কতখানি আনন্দের অধিকার ছিল যাহাতে রাজ্যসুখের আনন্দ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই, ইহা যখন দেখে তখন প্রত্যেক মানুষ মনুষ্যত্বের আনন্দপরিধির বিপুলতা দেখিয়া যেন নিজেরই গুপ্তধন অন্যের মধ্যে আবিষ্কার করে, নিজেরই বাধামুক্ত পরিচয় বাহিরে দেখিতে পায়। এই মহৎচরিত্রে আনন্দবোধ করাতে আমরা নিজেকেই আবিষ্কার করি।

(অতএব মানুষ আপনার আনন্দপ্রকাশের দ্বারা সাহিত্যে কেবল আপনারই নিত্যরূপ শ্রেষ্ঠরূপ প্রকাশ করিতেছে।)

(আমি জানি, সাহিত্য হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রমাণ আহরণ করিয়া আমার মোটকথাটাকে খণ্ডখণ্ড করিয়া ফেলা অত্যন্ত সহজ।) সাহিত্যের মধ্যে যেখানে যাহা-কিছু স্থান পাইয়াছে তাহার সমস্তটার জবাবদিহি করিবার দায় যদি আমার উপরে চাপানো হয় তবে সে আমার বড়ো কম বিপদ নয়। কিন্তু মানুষের সমস্ত বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে শত শত আত্মবিরোধ থাকে। (যখন বলি, জাপানিরা নির্ভীক সাহসে লড়াই করিয়াছিল, তখন জাপানি সেনাদলের প্রত্যেক লোকটির সাহসের হিসাব লইতে গেলে নানা স্থানেই ত্রুটি দেখা যাইবে।) কিন্তু ইহা সত্য, সেই-সমস্ত ব্যক্তিবিশেষের ভয়কেও সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়া জাপানিদের সাহস যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে। সাহিত্যে মানুষ বৃহৎভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, সে ক্রমশই তাহার আনন্দকে খণ্ড হইতে অখণ্ডের দিকে অগ্রসর করিয়া ব্যক্ত করিতেছে— বড়ো করিয়া দেখিলে এ কথা সত্য ; বিকৃতি এবং ত্রুটি যতই থাক্‌, তবু সব লইয়াই এ কথা সত্য।

(একটি কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, সাহিত্য দুইরকম করিয়া আমাদিগকে আনন্দ দেয়। এক, সে সত্যকে মনোহররূপে আমাদিগকে

দেখায় ; আর, সে সত্যকে আমাদের গোচর করিয়া দেয়। সত্যকে গোচর করানো বড়ো শক্ত কাজ) (হিমালয়ের শিখর কত হাজার ফিট উঁচু, তাহার মাথায় কতখানি বরফ আছে, তাহার কোন্ অংশে কোন্ শ্রেণীর উদ্ভিদ জন্মে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বলিলেও হিমালয় আমাদের গোচর হয় না। যিনি কয়েকটি কথায় এই হিমালয়কে আমাদের গোচর করিয়া দিতে পারেন তাঁহাকে আমরা কবি বলি) হিমালয় কেন, একটা পানা-পুকুরকেও আমাদের মনশ্চক্ষুর সামনে ধরিয়া দিলে আমাদের আনন্দ হয়। পানাপুকুরকে চোখে আমরা অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাকেই ভাষার ভিতর দিয়া দেখিলে তাহাকে নূতন করিয়া দেখা হয়, মন চক্ষুরিন্দ্রিয় দিয়া যেটাকে দেখিতে পায় ভাষা যদি ইন্দ্রিয়স্বরূপ হইয়া সেইটেকেই দেখাইতে পারে তবে মন তাহাতে নূতন একটা রস লাভ করে। (এইরূপে সাহিত্য আমাদের নূতন একটি ইন্দ্রিয়ের মতো হইয়া জগৎকে আমাদের কাছে নূতন করিয়া দেখায়। কেবল নূতন নয়। ভাষার একটা বিশেষত্ব আছে, সে মানুষের নিজের জিনিস, সে অনেকটা আমাদের মন-গড়া ; এইজন্য বাহিরের যে-কোনো জিনিসকে সে আমাদের কাছে আনিয়া দেয় সেটাকে যেন বিশেষ করিয়া মানুষের জিনিস করিয়া তোলে। ভাষা যে ছবি আঁকে সে ছবি যে যথাযথ ছবি বলিয়া আমাদের কাছে আদর পায় তাহা নয় ; ভাষা যেন তাহার মধ্যে একটা মানবরস মিশাইয়া দেয়, এইজন্য সে ছবি আমাদের হৃদয়ের কাছে একটা বিশেষ আত্মীয়তা লাভ করে। বিশ্বজগৎকে ভাষা দিয়া মানুষের ভিতর দিয়া চোলাইয়া লইলে সে আমাদের অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়ে।)

(শুধু তাই নয়, ভাষার মধ্য দিয়া যে ছবি আমাদের কাছে আসে সে সমস্ত খুঁটিনাটি লইয়া আসে না। সে কেবল ততটুকুই আসে যতটুকুতে সে একটি বিশেষ সমগ্রতা লাভ করে। এইজন্য তাহাকে একটি অখণ্ড-রসের সঙ্গে দেখিতে পাই ; কোনো অনাবশ্যক বাহুল্য সেই রস ভঙ্গ

করে না। সেই সুসম্পূর্ণ রসের ভিতর দিয়া দেখাতেই সে ছবি আমাদের অন্তঃকরণের কাছে এত অধিক করিয়া গোচর হইয়া উঠে।)

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্তের যে বর্ণনা আছে সে বর্ণনায় মানুষের চরিত্রের যে একটা বড়ো দিক দেখানো হইয়াছে তাহা নহে ; এইরকম চতুর স্বার্থপর এবং গায়ে পড়িয়া মোড়লি করিতে মজবুত লোক আমরা অনেক দেখিয়াছি। তাহাদের সঙ্গ যে সুখকর তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু কবিকঙ্কণ এই ছাঁদের মানুষটিকে আমাদের কাছে যে মূর্তিমান করিতে পারিয়াছেন তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। ভাষায় এমন একটু কৌতুকরস লইয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে যে, সে শুধু কালকেতুর সভায় নয়, আমাদেরও হৃদয়ের দরবারে অনায়াসে স্থান পাইয়াছে। ভাঁড়ুদত্ত প্রত্যক্ষ সংসারে ঠিক এমন করিয়া আমাদের গোচর হইত না। আমাদের মনের কাছে সুসহ করিবার পক্ষে ভাঁড়ুদত্তের যতটুকু আবশ্যক কবি তাহার চেয়ে বেশি কিছুই দেন নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষসংসারের ভাঁড়ুদত্ত ঠিক ওইটুকুমাত্র নয় ; এইজন্যই সে আমাদের কাছে অমন করিয়া গোচর হইবার অবকাশ পায় না। কোনো-একটা সমগ্রভাবে সে আমাদের কাছে গোচর হয় না বলিয়াই আমরা তাহাতে আনন্দ পাই না। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্ত তাহার সমস্ত অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জন করিয়া কেবল একটি সমগ্র রসের মূর্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে।

ভাঁড়ুদত্ত যেমন চরিত্রমাত্রই সেইরূপ। রামায়ণের রাম যে কেবল মহান বলিয়াই আমাদিগকে আনন্দ দিতেছেন তাহা নহে, তিনি আমাদের সুগোচর, সেও একটা কারণ। রামকে যেটুকু দেখিলে একটি সমগ্র রসে তিনি আমাদের কাছে জাগিয়া উঠেন, সমস্ত বিক্ষিপ্ততা বাদ দিয়া রামায়ণ কেবল সেইটুকুই আমাদের কাছে আনিয়াছে ; এইজন্য এত স্পষ্ট তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি, এবং স্পষ্ট দেখিতে পাওয়াই মানুষের একটি বিশেষ আনন্দ। স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া মানেই একটা কোনো সমগ্রভাবে দেখিতে

পাওয়া, যেন অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাওয়া। সাহিত্য তেমনি করিয়া একটা সামঞ্জস্যের সুষমার মধ্যে সমস্ত চিত্র দেখায় বলিয়া আমরা আনন্দ পাই। এই সুষমা সৌন্দর্য।

আর-একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, সাহিত্যের একটা বৃহৎ অংশ আছে যাহা তাহার উপকরণবিভাগ। পূর্তবিভাগে কেবল যে ইমারত তৈরি হয় তাহা নহে, তাহার দ্বারা ইঁটের পাঁজাও পোড়ানো হয়। ইঁটগুলি ইমারত নয় বলিয়া সাধারণ লোক অবজ্ঞা করিতে পারে, কিন্তু পূর্তবিভাগ তাহার মূল্য জানে। সাহিত্যের যাহা উপকরণ সাহিত্যরাজ্যে তাহার মূল্য বড়ো কম নয়। এইজন্যই অনেক সময় কেবল ভাষার সৌন্দর্য, কেবল রচনার নৈপুণ্যমাত্রও সাহিত্যে সমাদর পাইয়াছে।

(হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য মানুষ যে কত ব্যাকুল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।) হৃদয়ের ধর্মই এই, সে নিজের ভাবটিকে অন্যের ভাব করিয়া তুলিতে পারিলে তবে বাঁচিয়া যায়। অথচ কাজটি অত্যন্ত কঠিন বলিয়া তাহার ব্যাকুলতাও অত্যন্ত বেশি। সেইজন্য যখন আমরা দেখি একটা কথা কেহ অত্যন্ত চমৎকার করিয়া প্রকাশ করিয়াছে তখন আমাদের এত আনন্দ হয়। (প্রকাশের বাধা দূর হওয়াটাই আমাদের কাছে একটা দুর্মূল্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে আমাদের শক্তি বাড়িয়া যায়।) যে কথাটা প্রকাশ হইতেছে তাহা বিশেষ মূল্যবান একটা-কিছু না হইলেও, সেই প্রকাশ-ব্যাপারের মধ্যেই যদি কোনো অসামান্যতা দেখা যায় তবে মানুষ তাহাকে সমাদর করিয়া রাখে। সেইজন্য যাহা তাহা অবলম্বন করিয়া কেবলমাত্র প্রকাশ করিবার লীলাবশতই প্রকাশ, সাহিত্যে অনাদৃত হয় নাই। (তাহাতে মানুষ যে কেবল আপনার ক্ষমতাকে ব্যক্ত করিয়া আনন্দদান করে তাহা নহে; কিন্তু যে-কোনো উপলক্ষ্য ধরিয়া শুদ্ধমাত্র আপনার প্রকাশধর্মটাকে খেলানোতেই তাহার যে আনন্দ সেই নিতান্ত বাহুল্য আনন্দকে সে আমাদের মধ্যেও সঞ্চার করিয়া দেয়।) যখন দেখি কোনো

মানুষ একটা কঠিন কাজ অবলীলাক্রমে করিতেছে তখন তাহাতে আমাদের আনন্দ হয়; কিন্তু যখন দেখি, কোনো কাজ নয়, কিন্তু যে-কোনো তুচ্ছ উপলক্ষ্য লইয়া কোনো মানুষ আপনার সমস্ত শরীরকে নিপুণভাবে চালনা করিতেছে তখন সেই তুচ্ছ উপলক্ষ্যের গতিভঙ্গিতেই সেই লোকটার যে প্রাণের বেগ, যে উদ্যমের উৎসাহ প্রকাশ পায় তাহা আমাদের ভিতরকার প্রাণকে চঞ্চল করিয়া সুখ দেয়। সাহিত্যের মধ্যেও হৃদয়ের প্রকাশধর্মের লক্ষ্যহীন নৃত্যচাঞ্চল্য যথেষ্ট স্থান পাইয়াছে। স্বাস্থ্য শ্রান্তিহীন কর্মনৈপুণ্যেও আপনাকে প্রকাশ করে, আবার স্বাস্থ্য যে কেবলমাত্র স্বাস্থ্য ইহাই সে বিনা কারণেও প্রকাশ করিয়া থাকে। সাহিত্যে তেমনি মানুষ কেবল যে আপনার ভাবের প্রাচুর্যকেই প্রকাশ করিয়া থাকে তাহা নহে, সে আপনার প্রকাশশক্তির উৎসাহমাত্রকেই ব্যক্ত করিয়া আনন্দ করিতে থাকে। (কারণ, প্রকাশই আনন্দ। এইজন্যই উপনিষদ বলিয়াছেন: আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। সাহিত্যেও মানুষ কত বিচিত্রভাবে নিয়ত আপনার আনন্দ-রূপকে অমৃতরূপকেই ব্যক্ত করিতেছে তাহাই আমাদের দেখিবার বিষয়।)

বৈশাখ ১৩১৪

সাহিত্যসৃষ্টি

(যেমন একটা সুতাকে মাঝখানে লইয়া মিছরির কণাগুলা দানা বাঁধিয়া উঠে তেমনি আমাদের মনের মধ্যেও কোনো-একটা সূত্র অবলম্বন করিতে পারিলেই অনেকগুলা বিচ্ছিন্ন ভাব তাহার চারি দিকে দানা বাঁধিয়া একটা আকৃতিলাভ করিতে চেষ্টা করে। অস্ফুটতা হইতে পরিস্ফুটতা, বিচ্ছিন্নতা হইতে সংশ্লিষ্টতার জন্য আমাদের মনের ভিতরে একটা চেষ্টা যেন লাগিয়া আছে।) এমন-কি স্বপ্নেও দেখিতে পাই, একটা-কিছু সূচনা পাইবামাত্রই অমনি তাহার চারি দিকে কতই ভাবনা দেখিতে দেখিতে আকারধারণ করিতে থাকে। অব্যক্ত ভাবনাগুলা যেন মূর্তিলাভ করিবার সুযোগ-অপেক্ষায় নিদ্রায়-জাগরণে মনের মধ্যে প্রেতের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দিনের বেলা আমাদের কর্মের সময়, তখন বুদ্ধির কড়াক্কড় পাহারা, সে আমাদের আপিসে বাজে ভিড় করিয়া কোনোমতে কর্ম নষ্ট করিতে দেয় না। তাহার আমলে আমাদের ভাবনাগুলা কেবলমাত্র কর্মসূত্রে অবলম্বন করিয়া অত্যন্ত সুসংগতভাবে নিজেকে প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়। অবসরের সময় যখন চুপচাপ করিয়া বসিয়া আছি তখনো এই ব্যাপারটা চলিতেছে। হয়তো একটা ফুলের গন্ধের ছুতা পাইবামাত্র অমনি কতদিনের স্মৃতি তাহার চারি দিকে দেখিতে দেখিতে জমিয়া উঠিতেছে। একটা কথা যেমনি গড়িয়া উঠে অমনি তাহাকে আশ্রয় করিয়া যেমন-তেমন করিয়া কত-কী কথা যে পরে পরে আকারধারণ করিয়া চলে তাহার আর ঠিকানা নাই। আর-কিছু নয়, কেবল কোনো রকম করিয়া কিছু-একটা হইয়া উঠিবার চেষ্টা। ভাবনারাজ্যে এই চেষ্টার আর বিরাম নাই।

এই হইয়া উঠিবার চেষ্টা সফল হইলে তার পরে টিকিয়া থাকিবার চেষ্টার পালা। কাঁঠালের গাছে উপযুক্ত সময়ে ছড়াছড়ি করিয়া ফল

তো বিস্তর ধরিল, কিন্তু যে ফলগুলা ছোটো ডালে ধরিয়াছে, যাহার বোঁটা নিতান্তই সরু, সেগুলা কোনোমতে কাঁঠাল-লীলা একটুখানি শুরু করিয়াই আবার অব্যক্তের মধ্যে অন্তর্ধান করে।

আমাদের ভাবনাগুলারও সেই দশা। যেটা কোনো গতিকে এমন-একটা সূত্র পাইয়াছে যাহা টেঁকসই সে তাহার পূরা আয়তনে বাড়িয়া উঠিতে পায়; তাহার সমস্ত কোষগুলি ঠিকমত সাজিয়া ও ভরিয়া উঠিতে থাকে, তাহার হওয়াটা সার্থক হয়। আর যেটা কোনোমতে একটুখানি ধরিবার জায়গা পাইয়াছে মাত্র সেটা নেহাত তেড়াবাঁকা অসংগত-গোছ হইয়া বিদায় লইতে বিলম্ব করে না।

এমন গাছ আছে যে গাছে বোল ধরিয়াই ঝরিয়া যায়, ফল হইয়া ওঠা পর্যন্ত টেঁকে না। তেমনি এমন মনও আছে যেখানে ভাবনা কেবলই আসে-যায়, কিন্তু ভাব-আকার ধারণ করিবার পূরা অবকাশ পায় না। কিন্তু ভাবুক লোকের চিত্তে ভাবনাগুলি পুরাপুরি ভাব হইয়া উঠিতে পারে এমন রস আছে, এমন তেজ আছে। অবশ্য অনেকগুলা ঝরিয়া পড়ে বটে, কিন্তু কতকগুলা ফলিয়াও উঠে।

গাছে ফল যে-ক'টা ফলিয়া উঠে তাহাদের এই দরবার হয় যে, ডালের মধ্যে বাঁধা থাকিলেই আমাদের চলিবে না; আমরা পাকিয়া, রসে ভরিয়া, রঙে রঙিয়া, গন্ধে মাতিয়া, আঁটিতে শক্ত হইয়া, গাছ ছাড়িয়া বাহিরে যাইব— সেই বাহিরের জমিতে ঠিক অবস্থায় না পড়িতে পাইলে আমাদের সার্থকতা নাই। ভাবুকের মনে ভাবনাগুলা ভাব হইয়া উঠিলে তাহাদেরও সেই দরবার। তাহারা বলে, কোনো সুযোগে যদি হওয়া গেল তবে এবার বিশ্বমানবের মনের ভূমিতে নবজন্মের এবং চিরজীবনের লীলা করিতে বাহির হইব। প্রথমে ধরিবার সুযোগ, তাহার পরে ফলিবার সুযোগ, তাহার পরে বাহির হইয়া ভূমিলাভ করিবার সুযোগ, এই তিন সুযোগ ঘটিলে পর তবেই মানুষের মনের ভাবনা কৃতার্থ হয়।

ভাবনাগুলা সজীব পদার্থের মতো সেই কৃতার্থতার তাগিদ মানুষকে কেবলই দিতেছে। সেইজন্য মানুষে মানুষে গলাগলি-কানাকানি চলিতেছেই। (একটা মন আর-একটা মনকে খুঁজিতেছে, নিজের ভাবনার ভার নামাইয়া দিবার জন্য, নিজের মনের ভাবকে অন্যের মনে ভাবিত করিবার জন্য।) এইজন্য মেয়েরা ঘাটে জমে, বন্ধুর কাছে বন্ধু ছোটে, চিঠি আনাগোনা করিতে থাকে, এইজন্যই সভাসমিতি তর্কবিতর্ক লেখালেখি বাদপ্রতিবাদ— এমন-কি এজন্য মারামারি কাটাকাটি পর্যন্ত হইতে বাকি থাকে না। (মানুষের মনের ভাবনাগুলি সফলতালাভের জন্য ভিতরে ভিতরে মানুষকে এতই প্রচণ্ড তাগিদ দিয়া থাকে, মানুষকে একলা থাকিতে দেয় না, এবং ইহারই তাড়নায় পৃথিবী জুড়িয়া মানুষ সশব্দে ও নিঃশব্দে দিনরাত কত বকুনিই যে বকিতেছে তাহার আর ঠিকানা নাই।) সেই-সকল বকুনি কথায়-বার্তায় গল্পে-গুজবে চিঠিপত্রে মূর্তিতে-চিত্রে গদ্যে-পদ্যে কাজে-কর্মে কত বিচিত্র সাজে, কত বিবিধ আকারে, কত সুসংগত এবং অসংগত আয়োজনে, মানুষের সংসারে ভিড় করিয়া, ঠেলাঠেলি করিয়া চলিতেছে, তাহা মনের চক্ষে দেখিলে স্তব্ধ হইতে হয়।

(এই-যে এক মনের ভাবনার আর-এক মনের মধ্যে সার্থকতালাভের চেষ্টা মানবসমাজ জুড়িয়া চলিতেছে এই চেষ্টার বশে আমাদের ভাবগুলি স্বভাবতই এমন একটি আকার ধারণ করিতেছে যাহাতে তাহারা ভাবুকের কেবল একলার না হয়।) অনেক সময়ে এ আমাদের অলক্ষিতেই ঘটিতে থাকে। এ কথা বোধ হয় চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কোনো বন্ধুর কাছে যখন কথা বলি তখন কথা সেই বন্ধুর মনের ছাঁদে নিজেকে কিছু-না-কিছু গড়িয়া লয়। এক বন্ধুকে আমরা যে রকম করিয়া চিঠি লিখি আর-এক বন্ধুকে আমরা ঠিক তেমন করিয়া চিঠি লিখিতে পারি না। আমার ভাবটি বিশেষ বন্ধুর কাছে সম্পূর্ণতালাভ করিবার গূঢ় চেষ্টায় বিশেষ মনের প্রকৃতির সঙ্গে কতকটা পরিমাণে

আপোস করিয়া লয়। বস্তুত আমাদের কথা শ্রোতা ও বক্তা দুইজনের যোগেই তৈরি হইয়া উঠে।

এইজন্য সাহিত্যে লেখক যাহার কাছে নিজের লেখাটি ধরিতেছে, মনে মনে নিজের অজ্ঞাতসারেও, তাহার প্রকৃতির সঙ্গে নিজের লেখাটি মিলাইয়া লইতেছে। দাশুরায়ের পাঁচালি দাশরথির ঠিক একলার নহে; যে সমাজ সেই পাঁচালি শুনিতেছে, তাহার সঙ্গে যোগে এই পাঁচালি রচিত। এইজন্য এই পাঁচালিতে কেবল দাশরথির একলার মনের কথা পাওয়া যায় না; ইহাতে একটি বিশেষ কালের বিশেষ মণ্ডলীর অনুরাগ-বিরাগ শ্রদ্ধা-বিশ্বাস রুচি আপনি প্রকাশ পাইয়াছে।

এমনি করিয়া লেখকদের মধ্যে কেহ বা বন্ধুকে, কেহ বা সম্প্রদায়কে, কেহ বা সমাজকে, কেহ বা সর্বকালের মানবকে আপনার কথা শুনাইতে চাহিয়াছেন। যাঁহারা কৃতকার্য হইয়াছেন তাঁহাদের লেখার মধ্যে বিশেষভাবে সেই বন্ধুর, সম্প্রদায়ের, সমাজের বা বিশ্বমানবের কিছু-না-কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এমনি করিয়া সাহিত্য কেবল লেখকের নহে, যাহাদের জন্য লিখিত তাহাদেরও পরিচয় বহন করে।

বস্তুজগতেও ঠিক জিনিসটি ঠিক জায়গায় যখন আসর জমাইয়া বসে তখন চারি দিকের আনুকূল্য পাইয়া টিকিয়া যায়— এও ঠিক তেমনি। অতএব যে বস্তুটা টিকিয়া আছে সে যে কেবল নিজের পরিচয় দেয় তাহা নয়, সে তাহার চারি দিকের পরিচয় দেয়; কারণ, সে কেবল নিজের গুণে নহে, চারি দিকের গুণে টিকিয়া থাকে।

এখন সাহিত্যের সেই গোড়াকার কথা, সেই দানা বাঁধার কথাটা ভাবিয়া দেখো। দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাক।

কত নববর্ষার মেঘ, বলাকার শ্রেণী, তপ্ত ধরণীর 'পরে বারিসেচনের সুগন্ধ, কত পর্বত-অরণ্য নদী-নির্ঝর নগর-গ্রামের উপর দিয়া ঘনপুঞ্জ-গম্ভীর আষাঢ়ের স্নিগ্ধ সঞ্চার কবির মনে কতদিন ধরিয়া কত ভাবের

ছায়া, সৌন্দর্যের পুলক, বেদনার আভাস রাখিয়া গেছে। কাহার মনেই বা না রাখে! জগৎ তো দিনরাতই আমাদের মনকে স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে এবং সেই স্পর্শে আমাদের মনের তারে কিছু-না-কিছু ধ্বনি উঠিতেছেই।

একদা কালিদাসের মনে সেই তাঁহার বহুদিনের বহুতর ধ্বনিগুলি একটি সূত্র অবলম্বন করিবামাত্র একটার পর আর-একটা ভিড় করিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়া কী সুন্দর দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। অনেক দিনের অনেক ভাবের ছবি কালিদাসের মনে এই শুভক্ষণটির জন্য উমেদারি করিয়া বেড়াইয়াছে, আজ তাহারা যক্ষের বিরহবার্তার ছুতাটুকু লইয়া বর্ণনার স্তরে স্তরে মন্দাক্রান্তার স্তবকে স্তবকে ঘনাইয়া উঠিল। আজ তাহারা একটির যোগে অন্যটি এবং সমগ্রটির যোগে প্রত্যেকটি রক্ষা পাইয়া গেছে।

সতীলক্ষ্মী বলিতে হিন্দুর মনে যে ভাবটি জাগিয়া ওঠে সে তো আমরা সকলেই জানি। আমরা নিশ্চয়ই প্রত্যেকেই এমন কোনো-না-কোনো স্ত্রীলোককে দেখিয়াছি যাঁহাকে দেখিয়া সতীত্বের মাহাত্ম্য আমাদের মনকে কিছু-না-কিছু স্পর্শ করিয়াছে। গৃহস্থঘরের প্রাত্যহিক কাজকর্মের তুচ্ছতার মধ্যে কল্যাণের সেই-যে দিব্যমূর্তি আমরা ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি, সেই দেখার স্মৃতি তো মনের মধ্যে কেবল আবছায়ার মতো ভাসিয়াই বেড়াইতেছে।

কালিদাস কুমারসম্ভবের গল্পটাকে মাঝখানে ধরিতেই সতী নারীর সম্বন্ধে যে-সকল ভাব হাওয়ায় উড়িয়া বেড়াইতেছিল তাহারা কেমন এক হইয়া, শক্ত হইয়া ধরা দিল! ঘরে ঘরে নিষ্ঠাবতী স্ত্রীদের যে-সমস্ত কঠোর তপস্যা গৃহকর্মের আড়াল হইতে আভাসে চোখে পড়ে, তাহাই মন্দাকিনীর ধারাধৌত দেবদারুর বনচ্ছায়ায় হিমালয়ের শিলাতলে দেবীর তপস্যার ছবিতে চিরদিনের মতো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

যাহাকে আমরা গীতিকাব্য বলিয়া থাকি অর্থাৎ যাহা একটুখানির মধ্যে একটিমাত্র ভাবের বিকাশ— ওই যেমন বিদ্যাপতির—

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর—

সেও আমাদের মনের বহু দিনের অব্যক্ত ভাবের একটি কোনো সুযোগ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠা। ভরা বাদলে ভাদ্রমাসে শূন্যঘরের বেদনা কত লোকেরই মনে কথা না কহিয়া কতদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়াছে; যেমনি ঠিক ছন্দে ঠিক কথাটি বাহির হইল অমনি সকলেরই এই অনেক দিনের কথাটা মূর্তি ধরিয়া আঁট বাঁধিয়া বসিল।

বাষ্প তো হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু ফুলের পাপড়ির শীতল স্পর্শটুকু পাইবামাত্র জমিয়া শিশির হইয়া দেখা দেয়। আকাশে বাষ্প ভাসিয়া চলিয়াছিল, দেখা যাইতেছিল না, পাহাড়ের গায়ে আসিয়া ঠেকিতেই মেঘ জমিয়া বর্ষণের বেগে নদী-নির্ঝরিণী বহাইয়া দিল। তেমনি গীতিকবিতায় একটিমাত্র ভাব জমিয়া মুক্তার মতো টল্‌টল্‌ করিয়া ওঠে, আর বড়ো বড়ো কাব্যে ভাবের সম্মিলিত সংঘ ঝর্নায় ঝরিয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু মূল কথাটা এই যে, বাষ্পের মতো অব্যক্ত ভাবগুলি কবির কল্পনার মধ্যে এমন একটি স্পর্শ লাভ করে যে, দেখিতে দেখিতে তাহাকে ঘেরিয়া বিচিত্রসুন্দর মূর্তি রচনা করিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।

বর্ষাঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন এক-একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুররূপে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পরে বাংলাদেশের সেই অবস্থা আসিয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়া ছিল। তাই দেশে সে-সময় যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব ভাষা এবং নূতন ছন্দে কত প্রাচুর্যে এবং প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল।

ফরাসিবিদ্রোহের সময়েও তেমনি মানবপ্রেমের ভাবহিল্লোল আকাশ ভরিয়া তুলিয়াছিল। তাহাই নানা কবির চিত্তে আঘাত পাইয়া কোথাও

বা করুণায় কোথাও বা বিদ্রোহের সুরে আপনাকে নানা মূর্তিতে অজস্র-ভাবে প্রকাশ করিয়াছিল। অতএব কথাটা এই, মানুষের মন যে-সকল বহুতর অব্যক্তভাবকে নিরন্তর উচ্ছ্বসিত করিয়া দিতেছে, যাহা অনবরত ক্ষণিক বেদনায় ক্ষণিক ভাবনায় ক্ষণিক কথায় বিশ্বমানবের সুবিশাল মনো-লোকের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এক-একজন কবির কল্পনা এক-একটি আকর্ষণকেন্দ্রের মতো হইয়া তাহাদেরই মধ্যে এক-এক দলকে কল্পনাসূত্রে এক করিয়া মানুষের মনের কাছে সুস্পষ্ট করিয়া তোলে। তাহাতেই আমাদের আনন্দ হয়। আনন্দ কেন হয়? হয় তাহার কারণ এই, আপনাকে আপনি দেখিবার অনেক চেষ্টা সমস্ত মানব-মনের মধ্যে কেবলই কাজ করিতেছে; এইজন্য যেখানেই সে কোনো-একটা ঐক্যের মধ্যে নিজের কোনো-একটা বিকাশকে দেখিতে পায় সেখানেই তাহার এই নিয়তচেষ্টা সার্থক হইয়া তাহাকে আনন্দ দিতে থাকে। কেবল সাহিত্য কেন, দর্শন-ইতিহাসও এইরূপ। দর্শনশাস্ত্রের সমস্ত প্রশ্ন ও সমস্ত চিন্তা অব্যক্তভাবে সমস্ত মানুষের মনে ছড়াইয়া আছে; দার্শনিকের প্রতিভা তাহাদের মধ্যে কোনো-একটা দলকে কোনো-একটা ঐক্য দিবামাত্র তাহার একটা রূপ, একটা মীমাংসা আমাদের কাছে ব্যক্ত হইয়া উঠে—আমরা নিজেদের মনের চিন্তার একটা বিশেষমূর্তি দেখিতে পাই। ইতিহাস লোকের মুখে মুখে জনশ্রুতি-আকারে ছড়াইয়া থাকে; ঐতিহাসিকের প্রতিভা তাহাদিগকে একটি সূত্রের চারি দিকে বাঁধিয়া তুলিবামাত্র এত কালের অব্যক্ত ইতিহাসের ব্যক্তমূর্তি আমাদের কাছে ধরা দেয়।

কোন্ কবির কল্পনায় মানুষের হৃদয়ের কোন্ বিশেষ রূপ ঘনীভূত হইয়া আপনার অনন্ত বৈচিত্র্যের একটা অপরূপ প্রকাশ সৌন্দর্যের দ্বারা ফুটাইয়া তুলিল তাহাই সাহিত্যসমালোচকের বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। কালিদাসের উপমা ভালো বা ভাষা সরস, বা কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের বর্ণনা সুন্দর, বা অভিজ্ঞানশকুন্তলের চতুর্থ সর্গে করুণরস প্রচুর

আছে, এ আলোচনা যথেষ্ট নহে। কিন্তু কালিদাসের সমস্ত কাব্যে মানব-হৃদয়ের একটা বিশেষ রূপ বাঁধা পড়িয়াছে। তাঁহার কল্পনা একটা বিশেষ কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া আকর্ষণবিকর্ষণ-গ্রহণবর্জনের নিয়মে মানুষের মনোলোকে কোন্ অব্যক্তকে একটা বিশেষ সৌন্দর্যে ব্যক্ত করিয়া তুলিল, সমালোচকের তাহাই বিচার্য। কালিদাস জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া দেখিয়াছেন, ভাবিয়াছেন, সহিয়াছেন, কল্পনা ও রচনা করিয়াছেন; তাঁহার এই ভাবনা-বেদনা-কল্পনা-ময় জীবন মানবের অনন্তরূপের একটি বিশেষ রূপকেই বাণীর দ্বারা আমাদের কাছে ব্যক্ত করিয়াছে— সেইটি কী? যদি আমরা প্রত্যেকেই অসাধারণ কবি হইতাম তবে আমরা প্রত্যেকেই আপনার হৃদয়কে এমন করিয়া মূর্তিমান করিতাম যাহাতে একটি অপূর্বতা দেখা দিত এবং এইরূপে অন্তহীন বিচিত্রই অন্তহীন এককে প্রকাশ করিতে থাকিত। কিন্তু আমাদের সে ক্ষমতা নাই। আমরা ভাঙাচোরা করিয়া কথা বলি, আমরা নিজেকে ঠিকমত জানিই না; যেটাকে আমরা সত্য বলিয়া প্রচার করি সেটা হয়তো আমাদের প্রকৃতিগত সত্য নহে, তাহা হয়তো দশের মতের অভ্যস্ত আবৃত্তিমাত্র; এইজন্য আমি আমার সমস্ত জীবনটা দিয়া কী দেখিলাম, কী বুঝিলাম, কী পাইলাম, তাহা সমগ্র করিয়া সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইতেই পারি না। কবিরা যে সম্পূর্ণ পারেন তাহা নহে। তাঁহাদের বাণীও সমস্ত স্পষ্ট হয় না, সত্য হয় না, সুন্দর হয় না; তাঁহাদের চেষ্টা তাঁহাদের প্রকৃতির গূঢ় অভিপ্রায়কে সকল সময়ে সার্থক করে না; কিন্তু তাঁহাদের নিজের অগোচরে তাঁহাদের চেষ্টার অতীত প্রদেশ হইতে একটা বিশ্বব্যাপী গূঢ় চেষ্টার প্রেরণায় সমস্ত বাধা ও অস্পষ্টতার মধ্য হইতে আপনিই একটি মানসরূপ, যাহাকে 'ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলে আর মেলে না', কখনো অল্প মাত্রায় কখনো অধিক মাত্রায় প্রকাশ হইতে থাকে। যে গূঢ়দর্শী ভাবুক, কবির কাব্যের ভিতর হইতে এই সমগ্র রূপটিকে দেখিতে পান তিনিই যথার্থ সাহিত্যবিচারক।

আমার এ-সকল কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, আমাদের ভাবের সৃষ্টি একটা খামখেয়ালি ব্যাপার নহে, ইহা বস্তুসৃষ্টির মতোই একটা অমোঘ নিয়মের অধীন। প্রকাশের যে-একটা আবেগ আমরা বাহিরের জগতে সমস্ত অণুপরমাণুর ভিতরেই দেখিতেছি, সেই একই আবেগ আমাদের মনোবৃত্তির মধ্যে প্রবলবেগে কাজ করিতেছে। অতএব যে চক্ষে আমরা পর্বতকানন নদনদী মরুসমুদ্রকে দেখি সাহিত্যকেও সেই চক্ষেই দেখিতে হইবে ; ইহাও আমার তোমার নহে, ইহা নিখিল সৃষ্টিরই একটা ভাগ।

তেমন করিয়া দেখিলে সাহিত্যের কেবল ভালোমন্দ বিচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকা যায় না। সেই সঙ্গে তাহার একটা বিকাশের প্রণালী, তাহার একটা বৃহৎ কার্যকারণ-সম্বন্ধ দেখিবার জন্য আগ্রহ জন্মে। আমার কথাটা একটি দৃষ্টান্ত দিয়া স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব।

'গ্রাম্যসাহিত্য'[১] -নামক প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি, দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে প্রথমে কতকগুলি ভাব টুকরা টুকরা কাব্য হইয়া চারি দিকে ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়। তার পরে একজন কবি সেই টুকরা কাব্য-গুলিকে একটা বড়ো কাব্যের সূত্রে এক করিয়া একটা বড়ো পিণ্ড করিয়া তোলেন। হরপার্বতীর কত কথা যাহা কোনো পুরাণে নাই, রামসীতার কত কাহিনী যাহা মূলরামায়ণে পাওয়া যায় না, গ্রামের গায়ক-কথকদের মুখে মুখে পল্লীর আঙিনায় ভাঙা ছন্দ ও গ্রাম্যভাষার বাহনে কত কাল ধরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়াছে। এমন সময় কোনো রাজসভার কবি যখন, কুটিরের প্রাঙ্গণে নহে, কোনো বৃহৎ বিশিষ্টসভায় গান গাহিবার জন্য আহূত হইয়াছেন, তখন সেই গ্রাম্যকথাগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়া মার্জিত ছন্দে গম্ভীর ভাষায় বড়ো করিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। পুরাতনকে নূতন করিয়া, বিচ্ছিন্নকে এক করিয়া, দেখাইলেই সমস্ত দেশ আপনার হৃদয়কে যেন স্পষ্ট ও প্রশস্ত করিয়া দেখিয়া আনন্দলাভ করে। ইহাতে সে

১ 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত।

আপনার জীবনের পথে আরও একটা পর্ব যেন অগ্রসর হইয়া যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, কেতকাদাস প্রভৃতির মনসার ভাসান, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এইরূপ শ্রেণীর কাব্য; তাহা বাংলার ছোটো ছোটো পল্লীসাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাঁধিবার প্রয়াস। এমনি করিয়া একটা বড়ো জায়গায় আপনার প্রাণপদার্থকে মিলাইয়া দিয়া পল্লীসাহিত্য, ফল-ধরা হইলেই ফুলের পাপড়িগুলার মতো, ঝরিয়া পড়িয়া যায়।

পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর, আরব্য উপন্যাস, ইংলণ্ডের আর্থার-কাহিনী, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার সাগা সাহিত্য এমনি করিয়া জন্মিয়াছে; সেইগুলির মধ্যে লোকমুখের বিক্ষিপ্ত কথা এক জায়গায় বড়ো আকারে দানা বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে।

এইরূপ ছড়ানো ভাবের এক হইয়া উঠিবার চেষ্টা মানবসাহিত্যে কয়েক জায়গায় অতি আশ্চর্য বিকাশ লাভ করিয়াছে। গ্রীসে হোমরের কাব্য এবং ভারতবর্ষে রামায়ণ মহাভারত।

ইলিয়াড এবং অডেসিতে নানা খণ্ডগাথা ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে জোড়া লাগিয়া এক হইয়া উঠিয়াছে, এ মত প্রায় মোটামুটি সর্বত্রই চলিত হইয়াছে। যে সময়ে লেখা পুঁথি এবং ছাপা বইয়ের চলন ছিল না এবং যখন গায়কেরা কাব্য গান করিয়া শুনাইয়া বেড়াইত তখন যে ক্রমে নানা কালে ও নানা হাতে একটা কাব্য ভরাট হইয়া উঠিতে থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্যের কথা নাই। কিন্তু যে কাঠামোর মধ্যে এই কাব্যগুলি খাড়া হইবার জায়গা পাইয়াছে তাহা যে একজন বড়ো কবির রচনা তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, এই কাঠামোর গঠন অনুসরণ করিয়া নূতন নূতন জোড়াগুলি ঐক্যের গণ্ডি হইতে ভ্রষ্ট হইতে পায় নাই।

মিথিলার বিদ্যাপতির গান কেমন করিয়া বাংলা পদাবলী হইয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে, স্বভাবের নিয়মে এক কেমন করিয়া আর হইয়া উঠিতেছে। বাংলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির পদাবলীকে

বিদ্যাপতির বলা চলে না। মূল কবির প্রায় কিছুই তাহার অধিকাংশ পদেই নাই। ক্রমেই বাঙালি গায়ক ও বাঙালি শ্রোতার যোগে তাহার ভাষা, তাহার অর্থ, এমন-কি তাহার রসেরও পরিবর্তন হইয়া সে এক নূতন জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রিয়র্সন মূল বিদ্যাপতির যে-সকল পদ প্রকাশ করিয়াছেন বাংলা পদাবলীতে তাহার দুটি-চারটির ঠিকানা মেলে, বেশির ভাগই মিলাইতে পারা যায় না। অথচ নানা কাল ও নানা লোকের দ্বারা পরিবর্তন-সত্ত্বেও পদগুলি এলোমেলো প্রলাপের মতো হইয়া যায় নাই। কারণ,একটা মূলসুর মাঝখানে থাকিয়া সমস্ত পরিবর্তনকে আপনার করিয়া লইবার জন্য সর্বদা সতর্ক হইয়া বসিয়া আছে। সেই সুরটুকুর জোরেই এই পদগুলিকে বিদ্যাপতির পদ বলিতেছি, আবার আগাগোড়া পরিবর্তনের জোরে এগুলিকে বাঙালির সাহিত্য বলিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, প্রথমে নানা মুখে প্রচলিত খণ্ডগানগুলা একটা কাব্যে বাঁধা পড়িয়া সেই কাব্য আবার যখন বহুকাল ধরিয়া সর্ব-সাধারণের কাছে গাওয়া হইতে থাকে, তখন আবার তাহার উপরে নানা দিক হইতে নানা কালের হাত পড়িতে থাকে। সেই কাব্য দেশের সকল দিক হইতেই আপনার পুষ্টি আপনি টানিয়া লয়। এমনি করিয়া ক্রমশই তাহা সমস্ত দেশের জিনিস হইয়া উঠে। তাহাতে সমস্ত দেশের অন্তঃ-করণের ইতিহাস, তত্ত্বজ্ঞান, ধর্মবোধ, কর্মনীতি আপনি আসিয়া মিলিত হয়। যে কবি গোড়ায় ইহার ভিত পত্তন করিয়াছেন তাঁহার আশ্চর্য ক্ষমতাবলেই ইহা সম্ভবপর হইতে পারে। তিনি এমন জায়গায় এমন করিয়া গোড়া ফাঁদিয়াছেন, তাঁহার প্ল্যানটা এতই প্রশস্ত যে, বহুকাল ধরিয়া সমস্ত দেশকে তিনি নিজের কাজে খাটাইয়া লইতে পারেন। এতদিন ধরিয়া এত লোকের হাত পড়িয়া কোথাও যে কিছুই তেড়াবাঁকা হয় না, তাহা বলিতে পারি না— কিন্তু মূল গঠনটার মাহাত্ম্যে সে-সমস্তই অভিভূত হইয়া থাকে।

আমাদের রামায়ণ-মহাভারত, বিশেষভাবে মহাভারত, ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল।

এইরূপ কালে কালে একটি সমগ্র জাতি যে কাব্যকে একজন কবির কবিত্বভিত্তি আশ্রয় করিয়া রচনা করিয়া তুলিয়াছে তাহাকেই যথার্থ মহাকাব্য বলা যায়।

তাহাকে আমি গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীর সঙ্গে তুলনা করি। প্রথমে পর্বতের নানা গোপন গুহা হইতে নানা ঝর্না একটা জায়গায় আসিয়া নদী তৈরি করিয়া তোলে। তার পরে সে যখন আপনার পথে চলিতে থাকে তখন নানা দেশ হইতে নানা উপনদী তাহার সঙ্গে মিলিয়া তাহার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে।

কিন্তু ভারতবর্ষের গঙ্গা, মিশরের নীল ও চীনের ইয়াংসিকিয়াং প্রভৃতির মতো মহানদী জগতে অল্পই আছে। এই-সমস্ত নদী মাতার মতো একটি বৃহৎ দেশের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্তকে পালন করিয়া চলিয়াছে। ইহারা এক-একটি প্রাচীন সভ্যতার স্তন্যদায়িনী ধাত্রীর মতো।

তেমনি মহাকাব্যও আমাদের জানা সাহিত্যের মধ্যে কেবল চারিটি-মাত্র আছে। ইলিয়ড অডেসি রামায়ণ ও মহাভারত। অলংকারশাস্ত্রের কৃত্রিম আইনের জোরেই রঘুবংশ, ভারবি, মাঘ, বা মিল্‌টনের প্যারাডাইস লস্‌ট্‌, ভল্‌টেয়ারের আঁরিয়াদ প্রভৃতিকে মহাকাব্যের পংক্তিতে জোর করিয়া বসানো হইয়া থাকে। তাহার পরে এখনকার ছাপাখানার শাসনে মহাকাব্য গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা পর্যন্ত লোপ হইয়া গেছে।

রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বে রামচরিত সম্বন্ধে যে-সমস্ত আদিম পুরাণ-কথা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল এখন তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদেরই মধ্যে রামায়ণের একটা পূর্ব-সূচনা দেশময় ছড়াইয়া ছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশে যে-সকল বীরপুরুষ অবতাররূপে গণ্য হইয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই জগতের হিতের জন্য কোনো-না-কোনো অসামান্য কাজ করিয়াছিলেন। রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বে দেশে রামচন্দ্র সম্বন্ধে সেইরূপ একটা লোকশ্রুতি নিঃসন্দেহই প্রচলিত ছিল। তিনি যে পিতৃসত্যপালনের জন্য বনে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নীহরণকারীকে বিনাশ করিয়া স্ত্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন ইহাতে তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব প্রমাণ করে বটে, কিন্তু যে অসাধারণ লোকহিত সাধন করিয়া তিনি লোকের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিলেন রামায়ণে কেবল তাহার আভাস আছে মাত্র।

আর্যদের ভারত-অধিকারের পূর্বে যে দ্রাবিড়জাতীয়েরা আদিম-নিবাসীদিগকে জয় করিয়া এই দেশ দখল করিয়া বসিয়াছিল তাহারা নিতান্ত অসভ্য ছিল না। তাহারা আর্যদের কাছে সহজে হার মানে নাই। ইহারা আর্যদের যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাইত, চাষের ব্যাঘাত করিত, কুলপতিরা অরণ্য কাটিয়া যে এক-একটি আশ্রম স্থাপন করিতেন সেই আশ্রমে তাহারা কেবলই উৎপাত করিত।

দাক্ষিণাত্যে কোনো দুর্গমস্থানে এই দ্রাবিড়জাতীয় রাজবংশ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়া এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদেরই প্রেরিত দলবল হঠাৎ বনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আর্য-উপনিবেশগুলিকে ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

রামচন্দ্র বানরগণকে অর্থাৎ ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদিগকে দলে লইয়া বহু দিনের চেষ্টায় ও কৌশলে এই দ্রাবিড়দের প্রতাপ নষ্ট করিয়া দেন; এই কারণেই তাঁহার গৌরবগান আর্যদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। যেমন শকদের উপদ্রব হইতে হিন্দুদিগকে উদ্ধার করিয়া বিক্রমাদিত্য যশস্বী হইয়াছিলেন তেমনি অনার্যদের প্রভাব খর্ব করিয়া যিনি আর্য-দিগকে নিরুপদ্রব করিয়াছিলেন তিনিও সাধারণের কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং পূজ্য হইয়াছিলেন।

এই উপদ্রব কে দূর করিয়া দিবে সেই চিন্তা তখন চারি দিকে জাগিয়া উঠিয়াছিল। বিশ্বামিত্র, অল্প বয়সেই সুলক্ষণ দেখিয়া রামচন্দ্রকেই যোগ্যপাত্র বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিশোরবয়স হইতেই রামচন্দ্র এই বিশ্বামিত্রের উৎসাহে ও শিক্ষায় শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত হন। তখনই তিনি আরণ্য গুহকের সঙ্গে বন্ধুতা করিয়া যে প্রণালীতে শত্রুজয় করিতে হইবে তাহার সূচনা করিতেছিলেন।

গোরু তখন ধন বলিয়া এবং কৃষি পবিত্রকর্মরূপে গণ্য হইত। জনক স্বহস্তে চাষ করিয়াছেন। এই চাষের লাঙল দিয়াই তখন আর্যেরা ভারতবর্ষের মাটিকে ক্রমশ আপন করিয়া লইতেছিলেন। এই লাঙলের মুখে অরণ্য হঠিয়া গিয়া কৃষিক্ষেত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। রাক্ষসেরা এই ব্যাপ্তির অন্তরায় ছিল।

প্রাচীন মহাপুরুষদের মধ্যে জনক যে আর্যসভ্যতার একজন ধুরন্ধর ছিলেন নানা জনপ্রবাদে সে কথার সমর্থন করে। ভারতবর্ষে কৃষিবিস্তারে তিনি একজন উদ্‌যোগী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কন্যারও নাম রাখিয়াছিলেন সীতা। পণ করিয়াছিলেন, যে বীর ধনুক ভাঙিয়া অসামান্য বলের পরিচয় দিবে তাহাকেই কন্যা দিবেন। সেই অশান্তির দিনে এইরূপ অসামান্য বলিষ্ঠ পুরুষের জন্য তিনি অপেক্ষা করিয়াছিলেন। প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে যে লোক দাঁড়াইতে পারিবে তাহাকে বাছিয়া লইবার এই এক উপায় ছিল।

বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে অনার্যপরাভবব্রতে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাকে জনকের পরীক্ষার স্থলে উপস্থিত করিলেন। সেখানে রামচন্দ্র ধনুক ভাঙিয়া তাঁহার ব্রতগ্রহণের শ্রেষ্ঠ অধিকারী বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেন।

তার পর তিনি ছোটোভাই ভরতের উপর রাজ্যভার দিয়া মহৎ প্রতিজ্ঞা-পালনের জন্য বনে গমন করিলেন। ভরদ্বাজ অগস্ত্য প্রভৃতি যে-সকল ঋষি দুর্গম দক্ষিণে আর্যনিবাস-বিস্তারে প্রবৃত্ত ছিলেন তাঁহাদের

উপদেশ লইয়া অনুচর লক্ষ্মণের সঙ্গে অপরিচিত গহন অরণ্যের মধ্যে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

সেখানে বালি ও সুগ্রীব -নামক দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাইয়ের মধ্যে এক ভাইকে মারিয়া অন্য ভাইকে দলে লইলেন। বানরদিগকে বশ করিলেন, তাহাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইয়া সৈন্য গড়িলেন। সেই সৈন্য লইয়া শত্রু-পক্ষের মধ্যে কৌশলে আত্মবিচ্ছেদ ঘটাইয়া লঙ্কাপুরী ছারখার করিয়া দিলেন। এই রাক্ষসেরা স্থাপত্যবিদ্যায় সুদক্ষ ছিল। যুধিষ্ঠির যে আশ্চর্য প্রাসাদ তৈরি করিয়াছিলেন ময়দানব তাহার কারিকর। মন্দিরনির্মাণে দ্রাবিড়জাতীয়ের কৌশল আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। ইহারাই প্রাচীন ইজিপ্‌টীয়দের স্বজাতি বলিয়া যে কেহ কেহ অনুমান করেন তাহা নিতান্ত অসংগত বোধ হয় না।

যাহা হউক, স্বর্ণলঙ্কাপুরীর যে প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছিল তাহার একটা-কিছু মূল ছিল। এই রাক্ষসেরা অসভ্য ছিল না। বরঞ্চ শিল্পবিলাসে তাহারা আর্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল।

রামচন্দ্র শত্রুদিগকে বশ করিয়াছিলেন, তাহাদের রাজ্য হরণ করেন নাই। বিভীষণ তাঁহার বন্ধু হইয়া লঙ্কায় রাজত্ব করিতে লাগিল। কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্যভার বানরদের হাতে দিয়াই চিরদিনের মতো তিনি তাহাদিগকে বশ করিয়া লইলেন। এইরূপে রামচন্দ্রই আর্যদের সহিত অনার্যদের মিলন ঘটাইয়া পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তাহারই ফলে দ্রাবিড়গণ ক্রমে আর্যদের সঙ্গে একসমাজভুক্ত হইয়া হিন্দুজাতি রচনা করিল। এই হিন্দুজাতির মধ্যে উভয়জাতির আচার-বিচার-পূজাপদ্ধতি মিশিয়া গিয়া ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপিত হয়।

ক্রমে ক্রমে আর্য-অনার্যের মিলন যখন সম্পূর্ণ হইল, পরস্পরের ধর্ম ও বিদ্যার বিনিময় হইয়া গেল, তখন রামচন্দ্রের পুরাতন কাহিনী মুখে মুখে রূপান্তর ও ভাবান্তর ধরিতে লাগিল। যদি কোনোদিন ইংরেজের সঙ্গে

ভারতবাসীর পরিপূর্ণ মিলন ঘটে তবে কি ক্লাইবের কীর্তি লইয়া বিশেষ-ভাবে আড়ম্বর করিবার কোনো হেতু থাকিবে? না ম্যুটিনির উট্রাম প্রভৃতি যোদ্ধাদের কাহিনীকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করিয়া তুলিবার স্বাভাবিক কোনো উত্তেজনা থাকিতে পারিবে?

যে কবি দেশপ্রচলিত চরিতগাথাগুলিকে মহাকাব্যের মধ্যে গাঁথিয়া ফেলিলেন তিনি এই অনার্যবশ-ব্যাপারকেই প্রাধান্য না দিয়া মহৎ চরিত্রের এক সম্পূর্ণ আদর্শকে বড়ো করিয়া তুলিলেন। তিনি করিয়া তুলিলেন বলিলে বোধ হয় ভুল হয়। রামচন্দ্রের পূজ্যস্মৃতি ক্রমে ক্রমে কালান্তর ও অবস্থান্তরের অনুসরণ করিয়া আপনার পূজনীয়তাকে সাধারণের ভক্তিবৃত্তির উপযোগী করিয়া তুলিতেছিল। কবি তাঁহার প্রতিভার দ্বারা তাহাকে এক জায়গায় ঘনীভূত ও সুস্পষ্ট করিয়া তুলিলেন। তখন সর্বসাধারণের ভক্তি চরিতার্থ হইল।

কিন্তু আদিকবি তাহাকে যেখানে দাঁড় করাইয়াছেন সে যে তাহার পর হইতে সেইখানেই স্থির হইয়া আছে, তাহা নহে।

রামায়ণের আদিকবি, গার্হস্থ্যপ্রধান হিন্দুসমাজের যত-কিছু ধর্ম রামকে তাহারই অবতার করিয়া দেখাইয়াছিলেন। পুত্ররূপে, ভ্রাতৃরূপে, পতিরূপে, বন্ধুরূপে, ব্রাহ্মণধর্মের রক্ষাকর্তারূপে, অবশেষে রাজারূপে বাল্মীকির রাম আপনার লোকপূজ্যতা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি যে রাবণকে মারিয়াছিলেন সেও কেবল ধর্মপত্নীকে উদ্ধার করিবার জন্য; অবশেষে সেই পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন সেও কেবল প্রজারঞ্জনের অনুরোধে। নিজের সমুদয় সহজ প্রবৃত্তিকে শাস্ত্রমতে কঠিন শাসন করিয়া সমাজরক্ষার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। আমাদের স্থিতিপ্রধান সভ্যতায় পদে পদে যে ত্যাগ ক্ষমা ও আত্মনিগ্রহের প্রয়োজন হয় রামের চরিত্রে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়া রামায়ণ হিন্দুসমাজের মহাকাব্য হইয়া উঠিয়াছে।

আদিকবি যখন রামায়ণ লিখিয়াছিলেন তখন যদিচ রামের চরিতে

অতিপ্রাকৃত মিশিয়াছিল তবু তিনি মানুষেরই আদর্শরূপে চিত্রিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু অতিপ্রাকৃতকে এক জায়গায় স্থান দিলে তাহাকে আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না, সে ক্রমেই বাড়িয়া চলে। এমনি করিয়া রাম ক্রমে দেবতার পদবী অধিকার করিলেন।

তখন রামায়ণের মূল সুরটার মধ্যে আর-একটা পরিবর্তন প্রবেশ করিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

রামকে দেবতা বলিলেই তিনি যে-সকল কঠিন কাজ করিয়াছিলেন তাহার দুঃসাধ্যতা চলিয়া যায়। সুতরাং রামের চরিত্রকে মহীয়ান করিবার জন্য সেগুলির বর্ণনাই আর যথেষ্ট হয় না। তখন যে ভাবের দিক দিয়া দেখিলে দেবচরিত্র মানুষের কাছে প্রিয় হয় কাব্যে সেই ভাবটাই প্রবল হইয়া উঠে।

সেই ভাবটি ভক্তবৎসলতা। কৃত্তিবাসের রাম ভক্তবৎসল রাম। তিনি অধম পাপী সকলকেই উদ্ধার করেন। তিনি গুহক-চণ্ডালকে মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করেন। বনের পশু বানরদিগকে তিনি প্রেমের দ্বারা ধন্য করেন। ভক্ত হনুমানের জীবনকে ভক্তিতে আর্দ্র করিয়া তাহার জন্ম সার্থক করিয়াছেন। বিভীষণ তাঁহার ভক্ত। রাবণও শত্রুভাবে তাঁহার কাছ হইতে বিনাশ পাইয়া উদ্ধার হইয়া গেল। এ রামায়ণে ভক্তিরই লীলা।

ভারতবর্ষে এক সময়ে জনসাধারণের মধ্যে এই একটা ঢেউ উঠিয়াছিল। ঈশ্বরের অধিকার যে কেবল জ্ঞানীদিগেরই নহে এবং তাঁহাকে পাইতে হইলে যে তন্ত্রমন্ত্র ও বিশেষ বিধির প্রয়োজন করে না, কেবল সরল ভক্তির দ্বারাই আপামর চণ্ডাল সকলেই ভগবানকে লাভ করিতে পারে, এই কথাটা হঠাৎ যেন একটা নূতন আবিষ্কারের মতো আসিয়া ভারতের জনসাধারণের দুঃসহ হীনতাভার মোচন করিয়া দিয়াছিল। সেই বৃহৎ আনন্দ দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যখন ভাসিয়া উঠিয়াছিল তখন যে সাহিত্যের

প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল তাহা জনসাধারণের এই নূতন গৌরবলাভের সাহিত্য। কালকেতু, ধনপতি, চাঁদসদাগর প্রভৃতি সাধারণ লোকেই তাহার নায়ক; ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় নহে, মানীজ্ঞানী সাধক নহে, সমাজে যাহারা নীচে পড়িয়া আছে, দেবতা যে তাহাদেরও দেবতা ইহাই সাহিত্য নানাভাবে প্রচার করিতেছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণেও এই ভাবটি ধরা দিয়াছে। ভগবান যে শাস্ত্রজ্ঞানহীন অনাচারী বানরদেরও বন্ধু, কাঠবিড়ালির অতি সামান্য সেবাও যে তাঁহার কাছে অগ্রাহ্য হয় না, পাপিষ্ঠ রাক্ষসকেও যে তিনি যথোচিত শাস্তির দ্বারা পরাভূত করিয়া উদ্ধার করেন, এই ভাবটিই কৃত্তিবাসে প্রবল হইয়া ভারতবর্ষে রামায়ণকথার ধারাকে গঙ্গার শাখা ভাগীরথীর ন্যায় আর-একটা বিশেষ পথে লইয়া গেছে।

রামায়ণকথার যে ধারা আমরা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি তাহারই একটি অত্যন্ত আধুনিক শাখা মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে রহিয়াছে। এই কাব্য সেই পুরাতন কথা অবলম্বন করিয়াও বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস হইতে একটি বিপরীত প্রকৃতি ধরিয়াছে।

আমরা অনেক সময়ে বলিয়া থাকি যে, ইংরেজি শিখিয়া যে সাহিত্য আমরা রচনা করিতেছি তাহা খাঁটি জিনিস নহে। অতএব এ সাহিত্য যেন দেশের সাহিত্য বলিয়াই গণ্য হইবার যোগ্য নয়।

যে জিনিসটা একটা-কোনো স্থায়ী বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে, যাহার আর কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাই, তাহাকেই যদি খাঁটি জিনিস বলা হয়, তবে সজীব প্রকৃতির মধ্যে সে জিনিসটা কোথাও নাই।

মানুষের সমাজে ভাবের সঙ্গে ভাবের মিলন হয় এবং সে মিলনে নূতন নূতন বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইতে থাকে। ভারতবর্ষে এমন মিলন কত ঘটিয়াছে, আমাদের মন কত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়াছে, তাহার কি সীমা আছে! অল্পদিন হইল মুসলমানেরা যখন আমাদের দেশের রাজ-সিংহাসনে চড়িয়া বসিয়াছিল তাহারা কি আমাদের মনকে স্পর্শ করে

নাই? তাহাদের সেমেটিক-ভাবের সঙ্গে হিন্দুভাবের কোনো স্বাভাবিক সম্মিশ্রণ কি ঘটিতে পায় নাই? আমাদের শিল্পসাহিত্য বেশভূষা রাগরাগিণী ধর্মকর্মের মধ্যে মুসলমানের সামগ্রী মিশিয়াছে। মনের সঙ্গে মনের এ মিলন না হইয়া থাকিতে পারে না। যদি এমন হয় যে কেবল আমাদেরই মধ্যে এরূপ হওয়া সম্ভব নহে, তবে সে আমাদের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথা।

য়ুরোপ হইতে একটা ভাবের প্রবাহ আসিয়াছে এবং স্বভাবতই তাহা আমাদের মনকে আঘাত করিতেছে। এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিলে নিজের চিত্তবৃত্তির প্রতি অন্যায় অপবাদ দেওয়া হইবে। এইরূপ ভাবের মিলনে যে-একটা ব্যাপার উৎপন্ন হইয়া উঠিতেছে কিছুকাল পরে তাহার মূর্তিটা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইবার সময় আসিবে।

য়ুরোপ হইতে নূতন ভাবের সংঘাত আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিয়াছে এ কথা যখন সত্য তখন আমরা হাজার খাঁটি হইবার চেষ্টা করি না কেন, আমাদের সাহিত্য কিছু-না-কিছু নূতন মূর্তি ধরিয়া এই সত্যকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। ঠিক সেই সাবেক জিনিসের পুনরাবৃত্তি আর কোনোমতেই হইতে পারে না; যদি হয় তবে এ সাহিত্যকে মিথ্যা ও কৃত্রিম বলিব।

মেঘনাদবধকাব্যে, কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যের রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু

ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারি দিকে প্রভূত ঐশ্বর্য; ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথী-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান; ইহা স্পর্ধাদ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি-ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোনো-কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারি দিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারি রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্রপৌত্র-আত্মীয়স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে, তাহাদের জননীরা ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটলশক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনোমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।

য়ুরোপের শক্তি তাহার বিচিত্র প্রহরণ ও অপূর্ব ঐশ্বর্যে পার্থিব মহিমার চূড়ার উপর দাঁড়াইয়া আজ আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার বিদ্যুৎখচিত বজ্র আমাদের নত মস্তকের উপর দিয়া ঘন ঘন গর্জন করিতে করিতে চলিয়াছে; এই শক্তির স্তবগানের সঙ্গে আধুনিক কালে রামায়ণকথার একটি নূতন-বাঁধা তার ভিতরে ভিতরে সুর মিলাইয়া দিল, এ কি কোনো ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালে হইল? দেশ জুড়িয়া ইহার আয়োজন চলিয়াছে, দুর্বলের অভিমানবশত ইহাকে আমরা স্বীকার করিব

না বলিয়াও পদে পদে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি— তাই রামায়ণের গান করিতে গিয়াও ইহার সুর আমরা ঠেকাইতে পারি নাই।

রামায়ণকে অবলম্বন করিয়া আমি এই কথাটা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, মানুষের সাহিত্যে যে-একটা ভাবের সৃষ্টি চলিতেছে তাহার স্থিতিগতির ক্ষেত্র অতি বৃহৎ। তাহা দেখিতে আকস্মিক; এই চৈত্রমাসে যে ঘন ঘন এত বৃষ্টি হইয়া গেল সেও তো আকস্মিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কত সুদূর পশ্চিম হইতে কারণপরম্পরার দ্বারা বাহিত হইয়া কোথাও বা বিশেষ সুযোগ কোথাও বা বিশেষ বাধা পাইয়া সেই বৃষ্টি আমার ক্ষেত্রকে অভিষিক্ত করিয়া দিল। ভাবের প্রবাহও তেমনি করিয়াই বহিয়া চলিয়াছে; সে ছোটো বড়ো কত কারণের দ্বারা খণ্ড হইতে এক এবং এক হইতে শতধা হইয়া কত রূপরূপান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। সম্মিলিত মানবের বৃহৎ মন, মনের নিগূঢ় এবং অমোঘ নিয়মেই আপনাকে কেবলই প্রকাশ করিয়া অপরূপ মানসসৃষ্টি সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার করিতেছে। তাহার কত রূপ, কত রস, কতই বিচিত্র গতি।

(লেখককে যখন আমরা অত্যন্ত নিকটে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখি তখন লেখকের সঙ্গে লেখার সম্বন্ধটুকুই আমাদের কাছে প্রবল হইয়া উঠে; তখন মনে করি গঙ্গোত্রীই যেন গঙ্গাকে সৃষ্টি করিতেছে। এইজন্য জগতের যে-সকল কাব্যের লেখক কে তাহার যেন ঠিকানা নাই, যে-সকল কাব্য আপনাকেই যেন আপনি সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, অথচ যাহার সূত্র ছিন্ন হইয়া যায় নাই, সেই-সকল কাব্যের দৃষ্টান্ত দিয়া আমি ভাবসৃষ্টির বিপুল নৈসর্গিকতার প্রতি আপনাদের মন আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।)

আষাঢ় ১৩১৪

বাংলা জাতীয় সাহিত্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সভার বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত

সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে-ভাবে ভাষায়-ভাষায় গ্রন্থে-গ্রন্থে মিলন তাহা নহে; মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর-কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে। যে দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের লোক পরস্পর সজীব বন্ধনে সংযুক্ত নহে; তাহারা বিচ্ছিন্ন।

পূর্বপুরুষদের সহিতও তাহাদের জীবন্ত যোগ নাই। কেবল পূর্বাপর-প্রচলিত জড়প্রথাবন্ধনের দ্বারা যে যোগসাধন হয় তাহা যোগ নহে, তাহা বন্ধন মাত্র। সাহিত্যের ধারাবাহিকতা ব্যতীত পূর্বপুরুষদিগের সহিত সচেতন মানসিক যোগ কখনো রক্ষিত হইতে পারে না।

আমাদের দেশের প্রাচীন কালের সহিত আধুনিক কালের যদিও প্রথাগত বন্ধন আছে, কিন্তু এক জায়গায় কোথায় আমাদের মনের মধ্যে এমন একটা নাড়ীর বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে যে, সেকাল হইতে মানসিক প্রাণরস অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হইয়া একাল পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতেছে না। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কেমন করিয়া চিন্তা করিতেন, কার্য করিতেন, নব তত্ত্ব উদ্‌ভাবন করিতেন— সমস্ত শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ কাব্যকলা ধর্মতত্ত্ব রাজনীতি সমাজতন্ত্রের মর্মস্থলে তাঁহাদের জীবৎশক্তি তাঁহাদের চিৎশক্তি জাগ্রত থাকিয়া কী ভাবে সমস্তকে সর্বদা সৃজন এবং সংযমন করিত— কী ভাবে সমাজ প্রতিদিন বৃদ্ধিলাভ করিত, পরিবর্তনপ্রাপ্ত হইত, আপনাকে কেমন করিয়া চতুর্দিকে বিস্তার করিত, নূতন অবস্থাকে কেমন করিয়া আপনার সহিত সম্মিলিত করিত— তাহা আমরা সম্যক্‌রূপে

জানি না। মহাভারতের কাল এবং আমাদের বর্তমান কালের মাঝখানকার অপরিসীম বিচ্ছেদকে আমরা পূরণ করিব কী দিয়া? যখন ভুবনেশ্বর ও কনারক মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া যায় তখন মনে হয়, এই আশ্চর্য শিল্পকৌশলগুলি কি বাহিরের কোনো আকস্মিক আন্দোলনে কতকগুলি প্রস্তরময় বুদ্‌বুদের মতো হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছিল? সেই শিল্পীদের সহিত আমাদের যোগ কোন্‌খানে? যাহারা এত অনুরাগ এত ধৈর্য এত নৈপুণ্যের সহিত এই-সকল অভ্রভেদী সৌন্দর্য সৃজন করিয়া তুলিয়াছিল, আর আমরা যাহারা অর্ধ-নিমীলিত উদাসীন চক্ষে সেই-সকল ভুবনমোহিনী কীর্তির এক-একটি প্রস্তরখণ্ড খসিতে দেখিতেছি অথচ কোনোটা যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছি না এবং পুনঃস্থাপন করিবার ক্ষমতাও রাখি না, আমাদের মাঝখানে এমন কী একটা মহাপ্রলয় ঘটিয়াছিল যাহাতে পূর্বকালের কার্যকলাপ এখনকার কালের নিকট প্রহেলিকা বলিয়া প্রতীয়মান হয়? আমাদের জাতীয়-জীবন-ইতিহাসের মাঝখানের কয়েকখানি পাতা কে একেবারে ছিঁড়িয়া লইয়া গেল, যাহাতে আমরা তখনকার সহিত আপনাদিগের অর্থ মিলাইতে পারিতেছি না? এখন আমাদের নিকট বিধানগুলি রহিয়াছে, কিন্তু সে বিধাতা নাই; শিল্পী নাই, কিন্তু তাহাদের শিল্পনৈপুণ্যে দেশ আচ্ছন্ন হইয়া আছে। আমরা যেন কোন্ এক পরিত্যক্ত রাজধানীর ভগ্নাবশেষের মধ্যে বাস করিতেছি; সেই রাজধানীর ইষ্টক যেখানে খসিয়াছে আমরা সেখানে কেবল কর্দম এবং গোময়পঙ্ক লেপন করিয়াছি; পুরী নির্মাণ করিবার রহস্য আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অবিদিত।

প্রাচীন পূর্বপুরুষদের সহিত আমাদের এতই বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে যে, তাঁহাদের সহিত আমাদের পার্থক্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাও আমরা হারাইয়াছি। আমরা মনে করি, সেকালের ভারতবর্ষের সহিত এখনকার কালের কেবল নূতন-পুরাতনের প্রভেদ। সেকালে যাহা উজ্জ্বল

ছিল এখন তাহা মলিন হইয়াছে, সেকালে যাহা দৃঢ় ছিল এখন তাহাই শিথিল হইয়াছে। অর্থাৎ আমাদিগকেই যদি কেহ সোনার জল দিয়া পালিশ করিয়া কিঞ্চিৎ ঝক্‌ঝকে করিয়া দেয় তাহা হইলেই সেই অতীত ভারতবর্ষ সশরীরে ফিরিয়া আসে। আমরা মনে করি, প্রাচীন হিন্দুগণ রক্তমাংসের মনুষ্য ছিলেন না, তাঁহারা কেবল সজীব শাস্ত্রের শ্লোক ছিলেন, তাঁহারা কেবল বিশ্বজগৎকে মায়া মনে করিতেন এবং সমস্ত দিন জপতপ করিতেন। তাঁহারা যে যুদ্ধ করিতেন, রাজ্যরক্ষা করিতেন, শিল্পচর্চা ও কাব্যালোচনা করিতেন, সমুদ্র পার হইয়া বাণিজ্য করিতেন— তাঁহাদের মধ্যে যে ভালো-মন্দের সংঘাত ছিল, বিচার ছিল, বিদ্রোহ ছিল, মত-বৈচিত্র্য ছিল, এক কথায় জীবন ছিল, তাহা আমরা জ্ঞানে জানি বটে কিন্তু অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারি না। প্রাচীন ভারতবর্ষকে কল্পনা করিতে গেলেই নূতন পঞ্জিকার বৃদ্ধব্রাহ্মণ সংক্রান্তির মূর্তিটি আমাদের মনে উদয় হয়।

এই আত্যন্তিক ব্যবধানের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, আমাদের দেশে তখন হইতে এখন পর্যন্ত সাহিত্যের মনোময় প্রাণময় ধারা অবিচ্ছেদে বহিয়া আসে নাই। সাহিত্যের যাহা-কিছু আছে তাহা মাঝে মাঝে দূরে দূরে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। তখনকার কালের চিন্তাস্রোত ভাবস্রোত প্রাণস্রোতের আদিগঙ্গা শুকাইয়া গেছে, কেবল তাহার নদীখাতের মধ্যে মধ্যে জল বাধিয়া আছে; তাহা কোনো একটি বহমান আদিম ধারার দ্বারা পরিপুষ্ট নহে, তাহার কতখানি প্রাচীন জল কতটা আধুনিক লোকাচারের বৃষ্টি -সঞ্চিত বলা কঠিন। এখন আমরা সাহিত্যের ধারা অবলম্বন করিয়া হিন্দুত্বের সেই বৃহৎ প্রবল নানাভিমুখ সচল তটগঠনশীল সজীব স্রোত বাহিয়া একাল হইতে সেকালের মধ্যে যাইতে পারি না। এখন আমরা সেই শুষ্ক পথের মাঝে মাঝে নিজের অভিরুচি ও আবশ্যক -অনুসারে পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহাকে হিন্দুত্ব নামে অভিহিত করিতেছি। সেই

বদ্ধ ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন হিন্দুত্ব আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ; তাহার কোনোটা বা আমার হিন্দুত্ব, কোনোটা বা তোমার হিন্দুত্ব ; তাহা সেই কণ্ব-কণাদ রাঘব-কৌরব নন্দ-উপনন্দ এবং আমাদের সর্বসাধারণের তরঙ্গিত প্রবাহিত অখণ্ডবিপুল হিন্দুত্ব কিনা সন্দেহ।

এইরূপে সাহিত্যের অভাবে আমাদের মধ্যে পূর্বাপরের সজীব যোগ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। কিন্তু সাহিত্যের অভাব ঘটিবার একটা প্রধান কারণ, আমাদের মধ্যে জাতীয় যোগবন্ধনের অসদ্ভাব। আমাদের দেশে কনোজ কোশল কাশী কাঞ্চী প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ভাবে আপন আপন পথে চলিয়া গিয়াছে, এবং মাঝে মাঝে অশ্বমেধের ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া পরস্পরকে সংক্ষেপ করিতেও ছাড়ে নাই। মহাভারতের ইন্দ্রপ্রস্থ, রাজ-তরঙ্গিণীর কাশ্মীর, নন্দবংশীয়দের মগধ, বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী, ইহাদের মধ্যে জাতীয় ইতিহাসের কোনো ধারাবাহিক যোগ ছিল না। সেইজন্য সম্মিলিত জাতীয় হৃদয়ের উপর জাতীয় সাহিত্য আপন অটল ভিত্তি স্থাপন করিতে পারে নাই। বিচ্ছিন্ন দেশে বিচ্ছিন্ন কালে গুণজ্ঞ রাজার আশ্রয়ে এক-এক জন সাহিত্যকার আপন কীর্তি স্বতন্ত্র ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। কালিদাস কেবল বিক্রমাদিত্যের, চাঁদবর্দি কেবল পৃথ্বীরাজের, চাণক্য কেবল চন্দ্রগুপ্তের। তাঁহারা তৎকালীন সমস্ত ভারতবর্ষের নহেন, এমন-কি তৎপ্রদেশেও তাঁহাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোনো যোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সম্মিলিত জাতীয় হৃদয়ের মধ্যে যখন সাহিত্য আপন উত্তপ্ত সুরক্ষিত নীড়টি বাঁধিয়া বসে তখনই সে আপনার বংশ রক্ষা করিতে, ধারাবাহিক-ভাবে আপনাকে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করিয়া দিতে পারে। সেইজন্য প্রথমেই বলিয়াছি সহিতত্বই সাহিত্যের প্রধান উপাদান ; সে বিচ্ছিন্নকে এক করে, এবং যেখানে ঐক্য সেইখানে আপন প্রতিষ্ঠাভূমি স্থাপন করে। যেখানে একের সহিত অন্যের, কালের সহিত কালান্তরের, গ্রামের

সহিত ভিন্ন গ্রামের বিচ্ছেদ, সেখানে ব্যাপক সাহিত্য জন্মিতে পারে না। আমাদের দেশে কিসে অনেক লোক এক হয়? ধর্মে। সেইজন্য আমাদের দেশে কেবল ধর্মসাহিত্যই আছে। সেইজন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য কেবল শাক্ত এবং বৈষ্ণব কাব্যেরই সমষ্টি। রাজপুতগণকে বীরগৌরবে এক করিত, এইজন্য বীরগৌরব তাহাদের কবিদের গানের বিষয় ছিল।

আমাদের ক্ষুদ্র বঙ্গদেশেও একটা সাধারণ সাহিত্যের হাওয়া উঠিয়াছে। ধর্মপ্রচার হইতেই ইহার আরম্ভ। প্রথমে যাঁহারা ইংরাজি শিখিতেন তাঁহারা প্রধানত আমাদের বণিক ইংরাজ-রাজের নিকট উন্নতিলাভের প্রত্যাশাতেই এ কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন; তাঁহাদের অর্থকরী বিদ্যা সাধারণের কোনো কাজে লাগিত না। তখন সর্বসাধারণকে এক শিক্ষায় গঠিত করিবার সংকল্প কাহারও মাথায় উঠে নাই; তখন কৃতীপুরুষগণ যে যাহার আপন আপন পন্থা দেখিত।

বাংলার সর্বসাধারণকে আপনাদের কথা শুনাইবার অভাব খৃষ্টীয় মিশনরিগণ সর্বপ্রথমে অনুভব করেন, এইজন্য তাঁহারা সর্বসাধারণের ভাষাকে শিক্ষাবহনের ও জ্ঞানবিতরণের যোগ্য করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এ কার্য বিদেশীয়ের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সম্ভবপর নহে। নব্যবঙ্গের প্রথম সৃষ্টিকর্তা রাজা রামমোহন রায়ই প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে গদ্য-সাহিত্যের ভূমিপত্তন করিয়া দেন।

ইতিপূর্বে আমাদের সাহিত্য কেবল পদ্যেই বদ্ধ ছিল। কিন্তু রাম-মোহন রায়ের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে পদ্য যথেষ্ট ছিল না। কেবল ভাবের ভাষা, সৌন্দর্যের ভাষা, রসজ্ঞের ভাষা নহে; যুক্তির ভাষা, বিবৃতির ভাষা, সর্ববিষয়ের এবং সর্বসাধারণের ভাষা তাঁহার আবশ্যক ছিল। পূর্বে কেবল ভাবুকসভার জন্য পদ্য ছিল, এখন জনসভার জন্য গদ্য অবতীর্ণ হইল। এই গদ্যপদ্যর সহযোগ -ব্যতীত কখনো কোনো সাহিত্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। খাস দরবার এবং আম দরবার ব্যতীত সাহিত্যের

রাজ-দরবার সরস্বতী মহারানীর সমস্ত প্রজাসাধারণের উপযোগী হয় না। রামমোহন রায় আসিয়া সরস্বতীর সেই আম দরবারের সিংহদ্বার স্বহস্তে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন।

আমরা আশৈশবকাল গদ্য বলিয়া আসিতেছি, কিন্তু গদ্য যে কী দুরূহ ব্যাপার তাহা আমাদের প্রথম গদ্যকারদের রচনা দেখিলেই বুঝা যায়। পদ্যে প্রত্যেক ছত্রের প্রান্তে একটি করিয়া বিশ্রামের স্থান আছে, প্রত্যেক দুই ছত্র বা চারি ছত্রের পর একটা করিয়া নিয়মিত ভাবের ছেদ পাওয়া যায়। কিন্তু গদ্যে একটা পদের সহিত আর-একটা পদকে বাঁধিয়া দিতে হয়, মাঝে ফাঁক রাখিবার জো নাই; পদের মধ্যে কর্তা কর্ম ক্রিয়াকে এবং পদগুলিকে পরস্পরের সহিত এমন করিয়া সাজাইতে হয় যাহাতে গদ্যপ্রবন্ধের আদ্যন্তমধ্যে যুক্তিসম্বন্ধের নিবিড় যোগ ঘনিষ্ঠরূপে প্রতীয়মান হয়। ছন্দের একটা অনিবার্য প্রবাহ আছে; সেই প্রবাহের মাঝখানে একবার ফেলিয়া দিতে পারিলে কবিতা সহজে নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু গদ্যে নিজে পথ দেখিয়া পায়ে হাঁটিয়া নিজের ভার-সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে হয়, সেই পদব্রজবিদ্যাটি রীতিমত অভ্যাস না থাকিলে চাল অত্যন্ত আঁকাবাঁকা এলোমেলো এবং টল্‌মলে হইয়া থাকে। গদ্যের সুপ্রণালীবদ্ধ নিয়মটি আজকাল আমাদের অভ্যস্ত হইয়া গেছে, কিন্তু অনধিক কাল -পূর্বে এরূপ ছিল না।

তখন যে গদ্য রচনা করাই কঠিন ছিল তাহা নহে, তখন লোকে অনভ্যাসবশত গদ্য প্রবন্ধ সহজে বুঝিতে পারিত না। দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর আদিম অবস্থায় যেমন কেবল জল ছিল তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের আদিম অবস্থায় কেবল ছন্দতরঙ্গিতা প্রবাহশালিনী কবিতা ছিল। আমি বোধ করি, কবিতায় হ্রস্ব পদ, ভাবের নিয়মিত ছেদ ও ছন্দ এবং মিলের ঝংকার -বশত কথাগুলি অতি শীঘ্র মনে অঙ্কিত হইয়া যায় এবং শ্রোতা-গণ তাহা সত্বর ধারণা করিতে পারে। কিন্তু ছন্দোবন্ধহীন বৃহৎকায়

গদ্যের প্রত্যেক পদটি এবং প্রত্যেক অংশটি পরস্পরের সহিত যোজনা করিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া যাইতে বিশেষ একটা মানসিক চেষ্টার আবশ্যক করে। সেইজন্য রামমোহন রায় যখন বেদান্তসূত্র বাংলায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন গদ্য বুঝিবার কী প্রণালী তৎসম্বন্ধে ভূমিকা রচনা করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন। সেই অংশটি উদ্‌ধৃত করিতে ইচ্ছা করি—

> 'এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়'

অতঃপর কী করিলে গদ্যে বোধ জন্মে তৎসম্বন্ধে লেখক উপদেশ দিতেছেন।—

> 'বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে২ স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন' ইত্যাদি।

পুরাণ-ইতিহাসে পড়া গিয়াছে, রাজগণ সহসা কোনো ঋষির তপোবনে অতিথি হইলে তাঁহারা যোগবলে মদ্যমাংসের সৃষ্টি করিয়া রাজা ও রাজানুচরবর্গকে ভোজন করাইতেন। বেশ দেখা যাইতেছে, তপোবনের নিকট দোকান-বাজারের সংস্রব ছিল না এবং শালপত্রপুটে কেবল হরীতকী আমলকী সংগ্রহ করিয়া রাজযোগ্য ভোজের আয়োজন করা যায় না, সেইজন্য ঋষিদিগকে তপঃপ্রভাব প্রয়োগ করিতে হইত।

রামমোহন রায় যেখানে ছিলেন সেখানেও কিছুই প্রস্তুত ছিল না ; গদ্য ছিল না, গদ্যবোধশক্তিও ছিল না। যে সময়ে এ কথা উপদেশ করিতে হইত যে, প্রথমের সহিত শেষের যোগ, কর্তার সহিত ক্রিয়ার অন্বয় অনুসরণ করিয়া গদ্য পাঠ করিতে হয়, সেই আদিমকালে রামমোহন পাঠকদের জন্য কী উপহার প্রস্তুত করিতেছিলেন? বেদান্তসার, ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ প্রভৃতি দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদ। তিনি সর্বসাধারণকে অযোগ্য জ্ঞান করিয়া তাহাদের হস্তে উপস্থিতমত সহজপ্রাপ্য আমলকী হরীতকী আনিয়া দিলেন না। সর্বসাধারণের প্রতি তাঁহার এমন একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। আমাদের দেশে অধুনাতন কালের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথমে মানবসাধারণকে রাজা বলিয়া জানিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে বলিয়াছিলেন : সাধারণ-নামক এই মহারাজকে আমি যথোচিত অতিথিসৎকার করিব ; আমার অরণ্যে ইঁহার উপযুক্ত কিছুই নাই, কিন্তু আমি কঠিন তপস্যার দ্বারা রাজভোগের সৃষ্টি করিয়া দিব।

কেবল পণ্ডিতদের নিকট পাণ্ডিত্য করা, জ্ঞানীদের নিকট খ্যাতি অর্জন করা, রামমোহন রায়ের ন্যায় পরমবিদ্বান ব্যক্তির পক্ষে সুসাধ্য ছিল। কিন্তু তিনি পাণ্ডিত্যের নির্জন অত্যুচ্চশিখর ত্যাগ করিয়া সর্বসাধারণের ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং জ্ঞানের অন্ন ও ভাবের সুধা সমস্ত মানবসভার মধ্যে পরিবেশন করিতে উদ্যত হইলেন।

এইরূপে বাংলাদেশে এক নূতন রাজার রাজত্ব, এক নূতন যুগের অভ্যুদয় হইল। নব্যবঙ্গের প্রথম বাঙালি সর্বসাধারণকে রাজটিকা পরাইয়া দিলেন এবং এই রাজার বাসের জন্য সমস্ত বাংলাদেশে বিস্তীর্ণ ভূমির মধ্যে সুগভীর ভিত্তির উপরে সাহিত্যকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কালে কালে সেই ভিত্তির উপর নব নব তল নির্মিত হইয়া সাহিত্যহর্ম্য অভ্রভেদী হইয়া উঠিবে এবং অতীত-ভবিষ্যতের সমস্ত বঙ্গহৃদয়কে স্থায়ী আশ্রয় দান করিতে থাকিবে, অদ্য আমাদের নিকট ইহা দুরাশার স্বপ্ন

বলিয়া মনে হয় না।

অতএব দেখা যাইতেছে, বড়ো একটি উন্নত ভাবের উপর বঙ্গসাহিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যখন এই নির্মাণকার্যের আরম্ভ হয় তখন বঙ্গভাষার না ছিল কোনো যোগ্যতা, না ছিল সমাদর; তখন বঙ্গভাষা কাহাকে খ্যাতিও দিত না অর্থও দিত না; তখন বঙ্গভাষায় ভাব প্রকাশ করাও দুরূহ ছিল এবং ভাব প্রকাশ করিয়া তাহা সাধারণের মধ্যে প্রচার করাও দুঃসাধ্য ছিল। তাহার আশ্রয়দাতা রাজা ছিল না, তাহার উৎসাহদাতা শিক্ষিতসাধারণ ছিল না। যাঁহারা ইংরাজি চর্চা করিতেন তাঁহারা বাংলাকে উপেক্ষা করিতেন এবং যাঁহারা বাংলা জানিতেন তাঁহারাও এই নূতন উদ্যমের কোনো মর্যাদা বুঝিতেন না।

তখন বঙ্গসাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতাদের সম্মুখে কেবল সুদূর ভবিষ্যৎ এবং সুবৃহৎ জনমণ্ডলী উপস্থিত ছিল— তাহাই যথার্থ সাহিত্যের স্থায়ী প্রতিষ্ঠাভূমি। স্বার্থও নহে, খ্যাতিও নহে, প্রকৃত সাহিত্যের ধ্রুব লক্ষ্যস্থল কেবল নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথিবী। সেই লক্ষ্য থাকে বলিয়াই সাহিত্য মানবের সহিত মানবকে, যুগের সহিত যুগান্তরকে প্রাণবন্ধনে বাঁধিয়া দেয়। বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি ও ব্যাপ্তি -সহকারে কেবল-যে সমস্ত বাঙালির হৃদয় অন্তরতম যোগে বদ্ধ হইবে তাহা নহে; এক সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিকেও বঙ্গসাহিত্য আপন জ্ঞানান্নবিতরণের অতিথিশালায়, আপন ভাবামৃতের অবারিত সদাব্রতে আকর্ষণ করিয়া আনিবে তাহার লক্ষণ এখন হইতেই অল্পে অল্পে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

এপর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা একক ভাবেই কাজ করিয়াছেন। এককভাবে সকল কাজই কঠিন, বিশেষত সাহিত্যের কাজ। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি সাহিত্যের একটি প্রধান উপাদান সহিতত্ব। যে সমাজে জনসাধারণের মনের মধ্যে অনেকগুলি ভাব সঞ্চিত এবং সর্বদা আন্দোলিত হইতেছে, যেখানে পরস্পরের মানসিক

সংস্পর্শ নানা আকারে পরস্পর অনুভব করিতে পারিতেছে, সেখানে সেই মনের সংঘাতে ভাব এবং ভাবের সংঘাতে সাহিত্য স্বতই জন্মগ্রহণ করে এবং চতুর্দিকে সঞ্চারিত হইতে থাকে। এই মানবমনের সজীব সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইয়া কেবলমাত্র দৃঢ় সংকল্পের আঘাতে সঙ্গিহীন মনকে জনশূন্য কঠিন কর্তব্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া চালনা করা, একলা বসিয়া চিন্তা করা, উদাসীনদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার একান্ত চেষ্টা করা, সুদীর্ঘকাল একমাত্র নিজের অনুরাগের উত্তাপে নিজের ভাবপুষ্পগুলিকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিবার প্রয়াস করা এবং চিরজীবনের প্রাণপণ উদ্যমের সফলতা সম্বন্ধে চিরকাল সন্দিহান হইয়া থাকা— এমন নিরানন্দের অবস্থা আর কী আছে? যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে কেবল যে তাহারই কষ্ট তাহা নয়, ইহাতে কাজেরও অসম্পূর্ণতা ঘটে। এইরূপ উপবাসদশায় সাহিত্যের ফুলগুলিতে সম্পূর্ণ রঙ ধরে না, তাহার ফলগুলিতে পরিপূর্ণ-মাত্রায় পাক ধরিতে পায় না। সাহিত্যের সমস্ত আলোক ও উত্তাপ সর্বত্র সর্বতোভাবে সঞ্চারিত হইতে পারে না।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, পৃথিবীবেষ্টনকারী বায়ুমণ্ডলের একটি প্রধান কাজ সূর্যালোককে ভাঙিয়া বণ্টন করিয়া চারি দিকে যথাসম্ভব সমানভাবে বিকীর্ণ করিয়া দেওয়া। বাতাস না থাকিলে মধ্যাহ্নকালেও কোথাও বা প্রখর আলোক কোথাও বা নিবিড়তম অন্ধকার বিরাজ করিত।

আমাদের জ্ঞানরাজ্যের মনোরাজ্যের চারি দিকেও সেইরূপ একটা বায়ুমণ্ডলের আবশ্যকতা আছে। সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া এমন একটা অনুশীলনের হাওয়া বহা চাই যাহাতে জ্ঞান এবং ভাবের রশ্মি চতুর্দিকে প্রতিফলিত, বিকীর্ণ, হইতে পারে।

যখন বঙ্গদেশে প্রথম ইংরাজিশিক্ষা প্রচলিত হয়, যখন আমাদের সমাজে সেই মানসিক বায়ুমণ্ডল সৃজিত হয় নাই, তখন শতরঞ্জের সাদা এবং কালো ঘরের মতো শিক্ষা এবং অশিক্ষা পরস্পর সংলিপ্ত না হইয়া

ঠিক পাশাপাশি বাস করিত। যাহারা ইংরাজি শিখিয়াছে এবং যাহারা শেখে নাই তাহারা সুস্পষ্টরূপে বিভক্ত ছিল ; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোনোরূপ সংযোগ ছিল না, কেবল সংঘাত ছিল। শিক্ষিত ভাই আপন অশিক্ষিত ভাইকে মনের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিত, কিন্তু কোনো সহজ উপায়ে তাহাকে আপন শিক্ষার অংশ দান করিতে পারিত না।

কিন্তু দানের অধিকার না থাকিলে কোনো জিনিসে পুরা অধিকার থাকে না। কেবল ভোগস্বত্ব এবং জীবনস্বত্ব নাবালক এবং স্ত্রীলোকের অসম্পূর্ণ অধিকার মাত্র। এক সময়ে আমাদের ইংরাজি-পণ্ডিতেরা মস্ত পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পাণ্ডিত্য তাঁহাদের নিজের মধ্যেই বদ্ধ থাকিত, দেশের লোককে দান করিতে পারিতেন না— এইজন্য সে পাণ্ডিত্য কেবল বিরোধ এবং অশান্তির সৃষ্টি করিত। সেই অসম্পূর্ণ পাণ্ডিত্যে কেবল প্রচুর উত্তাপ দিত কিন্তু যথেষ্ট আলোক দিত না।

এই ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ ব্যাপ্তিহীন পাণ্ডিত্য কিছু অত্যুগ্র হইয়া উঠে ; কেবল তাহাই নহে, তাহার প্রধান দোষ এই যে নবশিক্ষার মুখ্য এবং গৌণ অংশ সে নির্বাচন করিয়া লইতে পারে না। সেইজন্য প্রথম-প্রথম যাঁহারা ইংরাজি শিখিয়াছিলেন তাঁহারা চতুষ্পার্শ্ববর্তীদের প্রতি অনাবশ্যক উৎপীড়ন করিয়াছিলেন এবং স্থির করিয়াছিলেন মদ্য মাংস ও মুখরতাই সভ্যতার মুখ্য উপকরণ।

চালের বস্তার চাল এবং কাঁকর পৃথক বাছিতে হইলে একটা পাত্রে সমস্ত ছড়াইয়া ফেলিতে হয় ; তেমনি নবশিক্ষা অনেকের মধ্যে বিস্তারিত করিয়া না দিলে তাহার শস্য এবং কঙ্কর -অংশ নির্বাচন করিয়া ফেলা দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। অতএব প্রথম-প্রথম যখন নূতন শিক্ষায় সম্পূর্ণ ভালো ফল না দিয়া নানাপ্রকার অসংগত আতিশয্যের সৃষ্টি করে তখন অতিমাত্র ভীত হইয়া সে শিক্ষাকে রোধ করিবার চেষ্টা সকল সময়ে সদ্‌বিবেচনার কাজ নহে। যাহা স্বাধীনভাবে ব্যাপ্ত হইতে পারে তাহা আপনাকে আপনি

সংশোধন করিয়া লয়, যাহা বদ্ধ থাকে তাহাই দূষিত হইয়া উঠে।

এই কারণে ইংরাজি শিক্ষা যখন সংকীর্ণ সীমায় নিরুদ্ধ ছিল তখন সেই ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে ইংরাজি সভ্যতার ত্যাজ্য অংশ সঞ্চিত হইয়া সমস্ত কলুষিত করিয়া তুলিতেছিল। এখন সেই শিক্ষা চারি দিকে বিস্তৃত হওয়াতেই তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু ইংরাজি শিক্ষা যে ইংরাজি ভাষা অবলম্বন করিয়া বিস্তৃত হইয়াছে তাহা নহে। বাংলা সাহিত্যই তাহার প্রধান সহায় হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালি এক সময়ে ইংরাজ-রাজ্য স্থাপনের সহায়তা করিয়াছিল; ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গসাহিত্য আজ ইংরাজি ভাবরাজ্য এবং জ্ঞানরাজ্য -বিস্তারের প্রধান সহকারী হইয়াছে। এই বাংলাসাহিত্য-যোগে ইংরাজিভাব যখন ঘরে বাহিরে সর্বত্র সুগম হইল তখনই ইংরাজি সভ্যতার অন্ধ দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভের জন্য আমরা সচেতন হইয়া উঠিলাম। ইংরাজি শিক্ষা এখন আমাদের সমাজে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, এইজন্য আমরা স্বাধীনভাবে তাহার ভালোমন্দ তাহার মুখ্যগৌণ -বিচারের অধিকারী হইয়াছি; এখন নানা চিত্ত নানা অবস্থায় তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে; এখন সেই শিক্ষার দ্বারা বাঙালির মন সজীব হইয়াছে এবং বাঙালির মনকে আশ্রয় করিয়া সেই শিক্ষাও সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের জ্ঞানরাজ্যের চতুর্দিকে মানসিক বায়ুমণ্ডল এমনি করিয়া সৃজিত হয়। আমাদের মন যখন সজীব ছিল না তখন এই বায়ুমণ্ডলের অভাব আমরা তেমন করিয়া অনুভব করিতাম না, এখন আমাদের মানসপ্রাণ যতই সজীব হইয়া উঠিতেছে ততই এই বায়ুমণ্ডলের জন্য আমরা ব্যাকুল হইতেছি।

এতদিন আমাদিগকে জলমগ্ন ডুবারির মতো ইংরাজি-সাহিত্যাকাশ হইতে নলে করিয়া হাওয়া আনাইতে হইত। এখনো সে নল সম্পূর্ণ

ত্যাগ করিতে পারি নাই। কিন্তু অল্পে অল্পে আমাদের জীবনসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চারি দিকে সেই বায়ুসঞ্চারও আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের দেশীয় ভাষায় দেশীয় সাহিত্যের হাওয়া উঠিয়াছে।

যতক্ষণ বাংলাদেশে সাহিত্যের সেই হাওয়া বহে নাই, সেই আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই, যতক্ষণ বঙ্গসাহিত্য এক-একটি স্বতন্ত্র সঙ্গিহীন প্রতিভা-শিখর আশ্রয় করিয়া বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছিল, ততক্ষণ তাহার দাবি করিবার বিষয় বেশি-কিছু ছিল না। ততক্ষণ কেবল বলবান ব্যক্তিগণ তাহাকে নিজ বীর্যবলে নিজ বাহুযুগলের উপর ধারণপূর্বক পালন করিয়া আসিতেছিলেন। এখন সে সাধারণের হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করিয়াছে, এখন বাংলাদেশের সর্বত্রই সে অবাধ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন অন্তঃপুরেও সে পরিচিত আত্মীয়ের ন্যায় প্রবেশ করে এবং বিদ্বৎসভাতেও সে সমাদৃত অতিথির ন্যায় আসন প্রাপ্ত হয়। এখন যাঁহারা ইংরাজিতে শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহারা বাংলা ভাষায় ভাবপ্রকাশ করাকে গৌরব জ্ঞান করেন; এখন অতিবড়ো বিলাতি-বিদ্যাভিমানীও বাংলাপাঠকদিগের নিকট খ্যাতি অর্জন করাকে আপন চেষ্টার অযোগ্য বোধ করেন না।

প্রথমে যখন ইংরাজি শিক্ষার প্রবাহ আমাদের সমাজে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন কেবল বিলাতি বিদ্যার একটা বালির চর বাঁধিয়া দিয়াছিল; সে বালুকারাশি পরস্পর অসংসক্ত; তাহার উপরে না আমাদের স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করা যায়, না তাহা সাধারণের প্রাণধারণযোগ্য শস্য উৎপাদন করিতে পারে। অবশেষে তাহারই উপরে যখন বঙ্গসাহিত্যের পলিমৃত্তিকা পড়িল তখন যে কেবল দৃঢ় তট বাঁধিয়া গেল, তখন যে কেবল বাংলার বিচ্ছিন্ন মানবেরা এক হইবার উপক্রম করিল তাহা নহে, তখন বাংলা-হৃদয়ের চিরকালের খাদ্য এবং আশ্রয়ের উপায় হইল। এখন এই জীবনশালিনী জীবনদায়িনী মাতৃভাষা সন্তানসমাজে আপন অধিকার

প্রার্থনা করিতেছে।

সেইজন্যই আজ উপযুক্ত কালে এক সময়োচিত আন্দোলন স্বতই উদ্ভূত হইয়াছে। কথা উঠিয়াছে, আমাদের বিদ্যালয়ে অধিকতর পরিমাণে বাংলা শিক্ষা প্রচলিত হওয়া আবশ্যক।

কেন আবশ্যক? কারণ, শিক্ষাদ্বারা আমাদের হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষা যে অভাবের সৃষ্টি হইয়াছে বাংলা ভাষা ব্যতীত তাহা পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংরাজি শিখিয়া যদি কেবল সাহেবের চাকরি ও আপিসের কেরানিগিরি করিয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতাম তাহা হইলে কোনো কথাই ছিল না। কিন্তু শিক্ষায় আমাদের মনে যে কর্তব্যের আদর্শ স্থাপিত করিয়াছে তাহা লোকহিত। জনসাধারণের নিকটে আপনাকে কর্মপাশে বদ্ধ করিতে হইবে, সকলকে শিক্ষা বিতরণ করিতে হইবে, সকলকে ভাব-রসে সরস করিতে হইবে, সকলকে জাতীয় বন্ধনে যুক্ত করিতে হইবে।

দেশীয় ভাষা ও দেশীয় সাহিত্যের অবলম্বন-ব্যতীত এ কার্য কখনো সিদ্ধ হইবার নহে। আমরা পরের হস্ত হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছি দান করিবার সময় নিজের হস্ত দিয়া তাহা বণ্টন করিতে হইবে।

ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে, সর্বসাধারণের নিকট নিজের কর্তব্য পালন করিবার, যাহা লাভ করিয়াছি তাহা সাধারণের জন্য সঞ্চয় করিবার, যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছি তাহা সাধারণের সমক্ষে প্রমাণ করিবার, যাহা ভোগ করিতেছি তাহা সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু অদৃষ্টদোষে সেই আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার উপায় এখনো আমাদের পক্ষে যথেষ্ট সুলভ হয় নাই। আমরা ইংরাজি বিদ্যালয় হইতে উদ্দেশ্য শিক্ষা করিতেছি, কিন্তু উপায় লাভ করিতেছি না।

কেহ কেহ বলেন, বিদ্যালয়ে বাংলা-প্রচলনের কোনো আবশ্যক নাই; কারণ, এপর্যন্ত ইংরাজিশিক্ষিত ব্যক্তিগণ নিজের অনুরাগেই বাংলা

সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, বাংলা শিখিবার জন্ম তাঁহাদিগকে অতিমাত্র চেষ্টা করিতে হয় নাই।

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে। এখন কেবল ক্ষমতাশালী লেখকের উপর বাংলা সাহিত্য নির্ভর করিতেছে না, এখন তাহা সমস্ত শিক্ষিত-সাধারণের সামগ্রী। এখন প্রায় কোনো-না-কোনো উপলক্ষে বাংলা ভাষায় ভাবপ্রকাশের জন্ম শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই উপর সমাজের দাবি দেখা যায়। কিন্তু সকলের শক্তি সমান নহে; অশিক্ষা ও অনভ্যাসের সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার কর্তব্য-পালন সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। এবং বাংলা অপেক্ষাকৃত অপরিণত ভাষা বলিয়াই তাহাকে কাজে লাগাইতে হইলে সবিশেষ শিক্ষা এবং নৈপুণ্যের আবশ্যক করে।

এখন বাংলা খবরের কাগজ, মাসিক পত্র, সভাসমিতি, আত্মীয়সমাজ, সর্বত্র হইতেই বঙ্গভূমি তাহার শিক্ষিত সন্তানদিগকে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে আহ্বান করিতেছে। যাহারা প্রস্তুত নহে, যাহারা অক্ষম, তাহারা কিছু-না-কিছু সংকোচ অনুভব করিতেছে। অসাধারণ নির্লজ্জ না হইলে আজকাল বাংলা ভাষার অজ্ঞতা লইয়া আস্ফালন করিতে কেহ সাহস করে না। এক্ষণে আমাদের বিদ্যালয় যদি ছাত্রদিগকে আমাদের বর্তমান আদর্শের উপযোগী না করিয়া তোলে, আমাদের সমাজের সর্বাঙ্গীণ হিতসাধনে সক্ষম না করে, যে বিদ্যা আমাদিগকে অর্পণ করে সঙ্গে সঙ্গে তাহার দানাধিকার যদি আমাদিগকে না দেয়, আমাদের পরমাত্মীয়-দিগকে বুভুক্ষিত দেখিয়াও সে বিদ্যা পরিবেশন করিবার শক্তি যদি আমাদের না থাকে— তবে এমন বিদ্যালয় আমাদের বর্তমান কাল ও অবস্থার পক্ষে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

যেমন মাছ ধরিবার সময় দেখা যায়, অনেক মাছ যতক্ষণ বঁড়শিতে বিদ্ধ হইয়া জলে খেলাইতে থাকে ততক্ষণ তাহাকে ভারী মস্ত মনে হয়,

কিন্তু ডাঙায় টান মারিয়া তুলিলেই প্রকাশ হইয়া পড়ে যত বড়োটা মনে করিয়াছিলাম তত বড়োটা নহে— যেমন রচনাকালে দেখা যায় একটা ভাব যতক্ষণ মনের মধ্যে অস্ফুট অপরিণত আকারে থাকে ততক্ষণ সেটাকে অত্যন্ত বিপুল এবং নূতন মনে হয়, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলেই তাহা দুটো কথায় শেষ হইয়া যায় এবং তাহার নূতনত্বের উজ্জ্বলতাও দেখিতে পাওয়া যায় না— যেমন স্বপ্নে অনেক ব্যাপারকে অপরিসীম বিস্ময়জনক এবং বৃহৎ মনে হয়, কিন্তু জাগরণমাত্রেই তাহা তুচ্ছ এবং ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে— তেমনি পরের শিক্ষাকে যতক্ষণ নিজের ডাঙায় না টানিয়া তোলা যায় ততক্ষণ আমরা বুঝিতেই পারি না বাস্তবিক কতখানি আমরা পাইয়াছি। আমাদের অধিকাংশ বিদ্যাই বঁড়শিগাঁথা মাছের মতো ইংরাজি ভাষার সুগভীর সরোবরের মধ্যে খেলাইয়া বেড়াইতেছে, আন্দাজে তাহার গুরুত্ব নির্ণয় করিয়া খুব পুলকিত গর্বিত হইয়া উঠিয়াছি। যদি বঙ্গভাষার কূলে একবার টানিয়া তুলিতে পারিতাম তাহা হইলে সম্ভবত নিজের বিদ্যাটাকে তত বেশি বড়ো না দেখাইতেও পারিত; নাই দেখাক, তবু সেটা ভোগে লাগিত এবং আয়তনে ছোটো হইলেও আমাদের কল্যাণরূপিণী গৃহলক্ষ্মীর স্বহস্তকৃত রন্ধনে, অমিশ্র অনুরাগ এবং বিশুদ্ধ সর্ষপতৈল -সহযোগে পরম উপাদেয় হইতে পারিত।

বাইবেলে কথিত আছে, যাহার নিজের কিছু আছে তাহাকেই দেওয়া হইয়া থাকে। যে লোক একেবারে রিক্ত তাহার পক্ষে কিছু গ্রহণ করা বড়ো কঠিন। জলাশয়েই বৃষ্টির জল বাধিয়া থাকে, শুষ্ক মরুভূমে তাহা দাঁড়াইবে কোথায়? আমরা নূতন বিদ্যাকে গ্রহণ করিব, সঞ্চিত করিব কোন্‌খানে? যদি নিজের শুষ্ক স্বার্থ এবং ক্ষণিক আবশ্যক ও ভোগের মধ্যে সে প্রতিক্ষণে শোষিত হইয়া যায় তবে সে শিক্ষা কেমন করিয়া ক্রমশ স্থায়িত্ব ও গভীরতা লাভ করিবে, সরস্বতীর সৌন্দর্যশতদলে প্রফুল্ল

হইয়া উঠিবে, আপনার তটভূমিকে স্নিগ্ধ শ্যামল, আকাশকে প্রতিফলিত, বহুকাল ও বহুলোককে আনন্দে ও নির্মলতায় অভিষিক্ত করিয়া তুলিবে?

বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে আরও একটি কথা বলিবার আছে। আলোচনা ব্যতীত কোনো শিক্ষা সজীবভাবে আপনার হয় না। নানা মানবমনের মধ্য দিয়া গড়াইয়া না আসিলে একটা শিক্ষার বিষয় মানবসাধারণের যথার্থ ব্যবহারযোগ্য হইয়া উঠে না। যে দেশে বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে সে দেশে বিজ্ঞান অন্তরে বাহিরে আচারে ব্যবহারে ভাষায় ভাবে সর্বত্র সংলিপ্ত হইয়া গেছে। সে দেশে বিজ্ঞান একটা অপরিচিত শুষ্ক জ্ঞান নহে, তাহা মানবমনের সহিত মানবজীবনের সহিত সজীবভাবে নানা আকারে মিশ্রিত হইয়া আছে। এইজন্য সে দেশে অতি সহজেই বিজ্ঞানের অনুরাগ অকৃত্রিম হয়, বিজ্ঞানের ধারণা গভীরতর হইয়া থাকে। নানা মনের মধ্যে অবিশ্রাম সঞ্চরিত হইয়া সেখানে বিজ্ঞান প্রাণ পাইয়া উঠে। যে দেশে সাহিত্যচর্চা প্রাচীন ও পরিব্যাপ্ত সে দেশে সাহিত্য কেবল গুটিকতক লোকের শখের মধ্যে বদ্ধ নহে। তাহা সমাজের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত প্রবাহিত; তাহা দিনে নিশীথে মনুষ্যজীবনের সহিত নানা আকারে মিশ্রিত হইয়াছে এইজন্য সাহিত্যানুরাগ সেখানে সহজ, সাহিত্যবোধ স্বাভাবিক। আমাদের দেশে বিদ্বান লোকদের মধ্যে বিদ্যার আলোচনা যথেষ্ট নাই এবং বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকালের পূর্বে অতি যৎসামান্যই ছিল।

কারণ, দেশীয় সাহিত্যের সম্যক্‌ বিস্তার -অভাবে অনেকের মধ্যে কোনো বিষয়ের আলোচনা অসম্ভব এবং আলোচনা-অভাবে বিদ্বান ব্যক্তিগণ চতুর্দিক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল নিজের মধ্যেই বদ্ধ। তাঁহাদের জ্ঞানবৃক্ষ চারি দিকের মানবমন হইতে যথেষ্ট পরিমাণে জীবনরস আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে না।

আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে হাস্যলেশহীন একটা সুগভীর

নিরানন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত অভাব তাহার অন্যতম কারণ। কী করিয়া কালযাপন করিতে হইবে আমরা ভাবিয়া পাই না। আমরা সকাল-বেলায় চুপ করিয়া দ্বারের কাছে বসিয়া তামাক খাই, দ্বিপ্রহরে আপিসে যাই, সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া তাস খেলি। সমাজের মধ্যে এমন একটা সর্বব্যাপী প্রবাহ নাই যাহাতে আমাদিগকে ভাসাইয়া রাখে,যাহাতে আমাদিগকে একসঙ্গে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। আমরা যে যার আপন আপন ঘরে উঠিতেছি বসিতেছি গড়াইতেছি এবং যথাকালে, অধিকাংশতই অকালে, মরিতেছি। ইহার প্রধান কারণ; আমরা বিচ্ছিন্ন। আমাদের শিক্ষার সহিত সমাজের, আদর্শের সহিত চরিত্রের, ভাবের সহিত কার্যের, আপনার সহিত চতুর্দিকের সর্বাঙ্গীণ মিশ খায় নাই। আমরা বীরত্বের ইতিহাস জানি কিন্তু বীর্য কাহাকে বলে জানি না, আমরা সৌন্দর্যের সমালোচনা অনেক পড়িয়াছি কিন্তু চতুর্দিকে সৌন্দর্য রচনা করিবার কোনো ক্ষমতা নাই; আমরা অনেক ভাব অনুভব করিতেছি কিন্তু অনেকের সহিত ভাগ করিয়া ভোগ করিব এমন লোক পাইতেছি না। এই-সকল মনোরুদ্ধ ভাব ক্রমশ বিকৃত ও অস্বাভাবিক হইয়া যায়। তাহা ক্রমে অলীক আকার ধারণ করে। অন্য দেশে যাহা একান্ত সত্য আমাদের দেশে তাহা অন্তঃসারশূন্য হাস্যকর আতিশয্যে পরিণত হইয়া উঠে।

হিমালয়ের মাথার উপরে যদি উত্তরোত্তর কেবলই বরফ জমিতে থাকিত তবে ক্রমে তাহা অতি বিপর্যয় অদ্ভুত এবং পতনোন্মুখ উচ্চতা লাভ করিত এবং তাহা ন দেবায় ন ধর্মায় হইত। কিন্তু সেই বরফ নির্ঝররূপে গলিয়া প্রবাহিত হইলে হিমালয়েরও অনাবশ্যক ভার লাঘব হয় এবং সেই সজীব ধারায় সুদূরপ্রসারিত তৃষাতুর ভূমি সরস শস্যশালী হইয়া উঠে। ইংরাজি বিদ্যা যতক্ষণ বদ্ধ থাকে ততক্ষণ তাহা সেই জড় নিশ্চল বরফ-ভারের মতো; দেশীয় সাহিত্যযোগে তাহা বিগলিত প্রবাহিত হইলে তবে সেই বিদ্যারও সার্থকতা হয়, বাঙালির ছেলের

মাথারও ঠিক থাকে এবং স্বদেশের তৃষ্ণাও নিবারিত হয়। অবরুদ্ধ ভাবগুলি অনেকের মধ্যে ছড়াইয়া গিয়া তাহার আতিশয্য-বিকার দূর হইতে থাকে। যে-সকল ইংরাজি ভাব যথার্থরূপে আমাদের দেশের লোক গ্রহণ করিতে পারে, অর্থাৎ যাহা বিশেষরূপে ইংরাজি নহে, যাহা সার্বভৌমিক, তাহাই থাকিয়া যায় এবং বাকি সমস্ত নষ্ট হইতে থাকে। আমাদের মধ্যে একটা মানসিক প্রবাহ উৎপন্ন হয়, সাধারণের মধ্যে একটা আদর্শের এবং আনন্দের ঐক্য জাগিয়া উঠে, বিদ্যার পরীক্ষা হয়, ভাবের আদানপ্রদান চলে; ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে যাহা শেখে বাড়িতে আসিয়া তাহার অনুবৃত্তি দেখিতে পায় এবং বয়স্কসমাজে প্রবেশ করিবার সময় বিদ্যাভারকে বিদ্যালয়ের বহির্দ্বারে ফেলিয়া আসা আবশ্যক হয় না। এই-যে স্কুলের সহিত গৃহের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ, ছাত্রবয়সের সহিত কর্মকালের সম্পূর্ণ ব্যবধান, নিজের সহিত আত্মীয়ের সম্পূর্ণ ভিন্ন শিক্ষা, এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা দূর হইয়া যায়, দেশীয় সাহিত্যের সংযোজনী-শক্তি-প্রভাবে বাঙালি আপনার মধ্যে আপনি ঐক্যলাভ করে— তাহার শিক্ষাও সম্পূর্ণ হইতে পারে, তাহার জীবনও সফলতা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু এখনো আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা বাঙালি ছাত্রদিগকে অধিকতর পরিমাণে বাংলা শিখাইবার আবশ্যকতা অনুভব করেন না, এমন-কি সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। যদি তাঁহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করা যায় যে, আমরা যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেই দেশের ভাষায় আমাদের নবলব্ধ জ্ঞান বিস্তার করিবার, আমাদের নবজাত ভাব প্রকাশ করিবার, ক্ষমতা ন্যূনাধিক পরিমাণে আমাদের সকলেরই আয়ত্ত থাকা উচিত কি না, তাঁহারা উত্তর দেন 'উচিত'; কিন্তু তাঁহাদের মতে, সেজন্য বিশেষরূপে প্রস্তুত হইবার আবশ্যকতা নাই। তাঁহারা বলেন, ইচ্ছা করিলেই বাঙালির ছেলেমাত্রই বাংলা শিখিতে ও লিখিতে পারে।

কিন্তু ইচ্ছা জন্মিবে কেন ? সকলেই জানেন, পরিচয়ের পর যে-সকল বিষয়ের প্রতি আমাদের পরম অনুরাগ জন্মিয়া থাকে পরিচয় হইবার পূর্বে তাহাদের প্রতি অনেক সময় আমাদের বৈমুখভাব অসম্ভব নহে। অনুরাগ জন্মিবার একটা অবসর দেওয়াও কর্তব্য এবং পূর্ব হইতে পথকে কিয়ৎ-পরিমাণেও সুগম করিয়া রাখিলে কর্তব্যবুদ্ধি সহজেই তদভিমুখে ধাবিত হইতে পারে। সম্মুখে একেবারে অনভ্যস্ত পথ দেখিলে কর্তব্য-ইচ্ছা স্বভাবতই উদ্‌বোধিত হইতে চাহে না।

কিন্তু বৃথা এ-সকল যুক্তি প্রয়োগ করা। আমাদের মধ্যে এমন এক-দল লোক আছেন বাংলার প্রতি যাঁহাদের অনুরাগ রুচি এবং শ্রদ্ধা নাই; তাঁহাদিগকে যেমন করিয়া যে দিকে ফিরানো যায় তাঁহাদের কম্পাসের কাঁটা ইংরাজির দিকেই ঘুরিয়া বসে। তাঁহারা অনেকে ইংরাজি আহার এবং পরিচ্ছদকে বিজাতীয় বলিয়া ঘৃণা করেন; তাঁহারা আমাদের জাতির বাহ্যশরীরকে বিলাতী অশনবসনের সহিত সংসক্ত দেখিতে চাহেন না; কিন্তু সমস্ত জাতির মনঃশরীরকে বিদেশীয় ভাষার পরিচ্ছদে মণ্ডিত এবং বিজাতীয় সাহিত্যের আহার্যে পরিবর্ধিত দেখিতে তাঁহাদের আক্ষেপ বোধ হয় না। শরীরের সহিত বস্ত্র তেমন করিয়া সংলিপ্ত হয় না মনের সহিত ভাষা যেমন করিয়া জড়িত হইয়া যায়। যাঁহারা আপন সন্তানকে তাহার মাতৃভাষা শিখিবার অবসর দেন না, যাঁহারা পরমাত্মীয়দিগকেও ইংরাজি ভাষায় পত্র লিখিতে লজ্জা বোধ করেন না, যাঁহারা 'পদ্মবনে মত্তকরীসম' বাংলা ভাষার বানান এবং ব্যাকরণ ক্রীড়াচ্ছলে পদদলিত করিতে পারেন অথচ ভ্রমক্রমে ইংরাজির ফোঁটা অথবা মাত্রার বিচ্যুতি ঘটিলে ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলেন, যাঁহাদিগকে বাংলায় হস্তীমূর্খ বলিলে অবিচলিত থাকেন কিন্তু ইংরাজিতে ইগ্নোরেণ্ট্ বলিলে মূর্ছাপ্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে এ কথা বুঝানো কঠিন যে, তাঁহারা ইংরাজি শিক্ষার সন্তোষ-জনক পরিণাম নহেন।

কিন্তু ইংরাজি-অভিমানী মাতৃভাষাদ্বেষী বাঙালির ছেলেকে আমরা দোষ দিতে চাহি না। ইংরাজির প্রতি এই উৎকট পক্ষপাত স্বাভাবিক। কারণ, ইংরাজি ভাষাটা একে রাজার ঘরের মেয়ে, তাহাতে আবার তিনি আমাদের দ্বিতীয় পক্ষের সংসার, তাঁহার আদর যে অত্যন্ত বেশি হইবে তাহাতে বিচিত্র নাই। তাঁহার যেমন রূপ তেমনি ঐশ্বর্য, আবার তাঁহার সম্পর্কে আমাদের রাজপুত্রদের ঘরেও আমরা কিঞ্চিৎ সম্মানের প্রত্যাশা রাখি। সকলেই অবগত আছেন ইঁহার প্রসাদে উক্ত যুবরাজদের প্রাসাদদ্বারপ্রান্তে আমরা কখনো কখনো স্থান পাইয়া থাকি, আবার কখনো কখনো কর্ণপীড়নও লাভ হয়— সেটাকে আমরা পরিহাসের স্বরূপ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করি, কিন্তু চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া পড়ে।

আর, আমাদের হতভাগিনী প্রথম পক্ষটি, আমাদের দরিদ্র বাংলা ভাষা, পাকশালার কাজ করেন— সে কাজটি নিতান্ত সামান্য নহে, তেমন আবশ্যক কাজ আর আমাদের আছে কি না সন্দেহ, কিন্তু তাঁহাকে আমাদের আপনার বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা করে। পাছে তাঁহার মলিন বসন লইয়া তিনি আমাদের ধনশালী নবকুটুম্বদের চক্ষে পড়েন এইজন্য তাঁহাকে গোপন করিয়া রাখি ; প্রশ্ন করিলে বলি, চিনি না।

সে দরিদ্র ঘরের মেয়ে। তাহার বাপের রাজত্ব নাই। সে সম্মান দিতে পারে না, সে কেবলমাত্র ভালোবাসা দিতে পারে। তাহাকে যে ভালোবাসে তাহার পদবৃদ্ধি হয় না, তাহার বেতনের আশা থাকে না, রাজদ্বারে তাহার কোনো পরিচয়-প্রতিপত্তি নাই। কেবল যে অনাথাকে সে ভালোবাসে সেই তাহাকে গোপনে ভালোবাসার পূর্ণ প্রতিদান দেয়। এবং সেই ভালোবাসার যথার্থ স্বাদ যে পাইয়াছে সে জানে যে, পদমান-প্রতিপত্তি এই প্রেমের নিকট তুচ্ছ।

রূপকথায় যেমন শুনা যায় এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ দেখিতেছি ; আমাদের

ঘরের এই নূতন রানী সুয়ারানী নিষ্ফল, বন্ধ্যা। এতকাল এত যত্নে এত সম্মানে সে মহিষী হইয়া আছে, কিন্তু তাহার গর্ভে আমাদের একটি সন্তান জন্মিল না। তাহার দ্বারা আমাদের কোনো সজীব ভাব আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। একেবারে বন্ধ্যা যদি বা না হয় তাহাকে মৃতবৎসা বলিতে পারি; কারণ, প্রথম-প্রথম গোটাকতক কবিতা এবং সম্প্রতি অনেকগুলা প্রবন্ধ জন্মলাভ করিয়াছে, কিন্তু সংবাদপত্রশয্যাতেই তাহারা ভূমিষ্ঠ হয় এবং সংবাদপত্ররাশির মধ্যেই তাহাদের সমাধি।

আর, আমাদের দুয়ারানীর ঘরে আমাদের দেশের সাহিত্য, আমাদের দেশের ভাবী আশাভরসা, আমাদের হতভাগ্য দেশের একমাত্র স্থায়ী গৌরব জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই শিশুটিকে আমরা বড়ো একটা আদর করি না; ইহাকে প্রাঙ্গণের প্রান্তে উলঙ্গ ফেলিয়া রাখি এবং সমালোচনা করিবার সময় বলি, 'ছেলেটার শ্রী দেখো! ইহার না আছে বসন, না আছে ভূষণ— ইহার সর্বাঙ্গেই ধুলা!' ভালো, তাই মানিলাম। ইহার বসন নাই, ভূষণ নাই, কিন্তু ইহার জীবন আছে। এ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে। এ মানুষ হইবে এবং সকলকে মানুষ করিবে। আর, আমাদের ওই সুয়ারানীর মৃত সন্তানগুলিকে বসনে ভূষণে আচ্ছন্ন করিয়া যতই হাতে-হাতে কোলে-কোলে নাচাইয়া বেড়াই-না কেন, কিছুতেই উহাদের মধ্যে জীবনসঞ্চার করিতে পারিব না।

আমরা যে-কয়টি লোক বঙ্গভাষার আহ্বানে একত্র আকৃষ্ট হইয়াছি, আপনাদের যথাসাধ্য শক্তিতে এই শিশু সাহিত্যটিকে মানুষ করিবার ভার লইয়াছি, আমরা যদি এই অভূষিত ধূলিমলিন শিশুটিকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া অহংকার করি, ভরসা করি কেহ কিছু মনে করিবেন না। যাঁহারা রাজসভায় বসিতেছেন তাঁহারা ধন্য, যাঁহারা প্রজাসভায় বসিতেছেন তাঁহাদের জয়জয়কার; আমরা এই উপেক্ষিত অধীন দেশের প্রচলিত ভাষায় অন্তরের সুখদুঃখ বেদনা প্রকাশ করি, ঘরের কড়ি খরচ করিয়া

তাহা ছাপাই এবং ঘরের কড়ি খরচ করিয়া কেহ তাহা কিনিতে চাহেন না— আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া কেবল একটুখানি অহংকার করিতে দিবেন। সেও বর্তমানের অহংকার নহে, ভবিষ্যতের অহংকার; আমাদের নিজের অহংকার নহে, ভাবী বঙ্গদেশের, সম্ভবত ভাবী ভারতবর্ষের অহংকার। তখন আমরাই বা কোথায় থাকিব আর এখনকার দিনের উড্ডীয়মান বড়ো বড়ো জয়পতাকাগুলিই বা কোথায় থাকিবে! কিন্তু এই সাহিত্য তখন অঙ্গদ-কুণ্ডল-উষ্ণীষে ভূষিত হইয়া সমস্ত জাতির হৃদয়-সিংহাসনে রাজমহিমায় বিরাজ করিবে এবং সেই ঐশ্বর্যের দিনে মাঝে মাঝে এই বাল্যসুহৃদ্‌দিগের নাম তাহার মনে পড়িবে, এই স্নেহের অহংকারটুকু আমাদের আছে।

আজ আমরা এ কথা বলিয়া অলীক গর্ব করিতে পারিব না যে, আমাদের অদ্যকার তরুণ বঙ্গসাহিত্য পৃথিবীর ঐশ্বর্যশালী বয়স্ক সাহিত্য-সমাজে স্থান পাইবার অধিকারী হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যের যশস্বিবৃন্দের সংখ্যা অত্যল্প, আজিও বঙ্গসাহিত্যের আদরণীয় গ্রন্থ গণনায় যৎসামান্য, এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু স্বীকার করিয়াও তথাপি বঙ্গসাহিত্যকে ক্ষুদ্র মনে হয় না। সে কি কেবল অনুরাগের অন্ধ মোহ-বশত? তাহা নহে। আমাদের বঙ্গসাহিত্যে এমন একটি সময় আসিয়াছে যখন সে আপন ভাবী সম্ভাবনাকে আপনি সচেতনভাবে অনুভব করিতেছে। এইজন্য বর্তমান প্রত্যক্ষ ফল তুচ্ছ হইলেও সে আপনাকে অবহেলাযোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না। বসন্তের প্রথম অভ্যাগমে যখন বনভূমিতলে নবাঙ্কুর এবং তরুশাখায় নবকিশলয়ের প্রচুর উদ্‌গম অনারব্ধ আছে, যখন বনশ্রী আপন অপরিসীম পুষ্পৈশ্বর্যের সম্পূর্ণ পরিচয় দিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই, তখনো সে যেমন আপন অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে শিরায়-উপশিরায় এক নিগূঢ় জীবনরসসঞ্চার, এক বিপুল ভাবী মহিমা উপলব্ধি করিয়া আসন্ন যৌবনগর্বে সহসা উৎফুল্ল হইয়া উঠে— সেইরূপ আজ

বঙ্গসাহিত্য আপন অন্তরের মধ্যে একটা নূতন প্রাণশক্তি, এক বৃহৎ বিশ্বাসের পুলক অনুভব করিয়াছে; সমস্ত বঙ্গহৃদয়ের সুখদুঃখ-আশা-আকাঙ্ক্ষার আন্দোলন সে আপনার নাড়ীর মধ্যে উপলব্ধি করিতেছে; সে জানিতে পারিয়াছে সমস্ত বাঙালির অন্তর-অন্তঃপুরের মধ্যে তাহার স্থান হইয়াছে; এখন সে ভিখারিনীবেশে কেবল ক্ষমতাশালীর দ্বারে দাঁড়াইয়া নাই, তাহার আপন গৌরবের প্রাসাদে তাহার অক্ষুণ্ণ অধিকার প্রতিদিন বিস্তৃত এবং দৃঢ় হইতে চলিয়াছে। এখন হইতে সে শয়নে-স্বপনে সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে সমস্ত বাঙালির—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

নববঙ্গসাহিত্য অদ্য প্রায় এক শত বৎসর হইল জন্মলাভ করিয়াছে; আর এক শত বৎসর পরে যদি এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ সভার শততম বার্ষিক উৎসব উপস্থিত হয় তবে সেই উৎসবসভায় যে সৌভাগ্যশালী বক্তা বঙ্গসাহিত্যের জয়গান করিতে দণ্ডায়মান হইবেন তিনি আমাদের মতো প্রমাণরিক্তহস্তে কেবলমাত্র অন্তরের আশা এবং অনুরাগ— কেবলমাত্র আকাঙ্ক্ষার আবেগ লইয়া, কেবলমাত্র অপরিস্ফুট অনাগত গৌরবের সূচনার প্রতি লক্ষ করিয়া, অতিপ্রত্যূষের অকস্মাৎ-জাগ্রত একক বিহঙ্গের অনিশ্চিত মৃদু কাকলির স্বরে সুর বাঁধিবেন না। তিনি স্ফুটতর অরুণালোকে জাগ্রত বঙ্গকাননে বিবিধ কণ্ঠের বিচিত্র কলগানের অধিনেতা হইয়া বর্তমানের উৎসাহে আনন্দধ্বনি উচ্ছ্রিত করিয়া তুলিবেন— এবং কোনোকালে যে অমানিশীথের একাধিপত্য ছিল এবং অদ্যকার আমরা যে প্রদোষের অন্ধকারে ক্লান্তি এবং শান্তি, আশা এবং নৈরাশ্যের দ্বিধার মধ্যে সকরুণ দুর্বল কণ্ঠের গীতগান সমাপ্ত করিয়া নিদ্রা গিয়াছিলাম সে কথা কাহারও মনেও থাকিবে না।

চৈত্র ১৩০১

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে দীনেশচন্দ্রবাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে পুস্তকখানি দ্বিতীয়বার পাঠ করিয়া আমরা দ্বিতীয়বার আনন্দলাভ করিলাম।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যখন বাহির হইয়াছিল তখন দীনেশবাবু আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বলিয়া এতবড়ো একটা ব্যাপার যে আছে তাহা আমরা জানিতাম না; তখন সেই অপরিচিতের সহিত পরিচয়স্থাপনেই ব্যস্ত ছিলাম।

দ্বিতীয়বার পাঠে গ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সময় ও সুযোগ পাইয়াছি। এবারে বাংলার প্রাচীন সাহিত্যকারদের স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত পরিচয়ে বা তুলনামূলক সমালোচনায় আমাদের মন আকর্ষণ করে নাই; আমরা দীনেশবাবুর গ্রন্থের মধ্যে বাংলাদেশের বিচিত্রশাখাপ্রশাখাসম্পন্ন ইতিহাসবনস্পতির বৃহৎ আভাস দেখিতে পাইয়াছি।

যে-সকল গ্রন্থকে বাংলার ইতিহাস বলে তাহাও পড়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে বাদশাহদের সহিত নবাবদের, নবাবদের সহিত বিদেশী বণিকদের ও বণিকদের সহিত দেশী ষড়যন্ত্রকারীদের কী খেলা চলিতেছিল তাহার অনেক সত্যমিথ্যা বিবরণ পাওয়া যায়। সে-সকল বিবরণ যদি কোনো দৈবঘটনায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় তবে বাংলাদেশকে চিনিবার পক্ষে অল্পই ব্যাঘাত ঘটে। বাংলাদেশের সহিত নবাবদের কী সম্বন্ধ ছিল তাহার বিবরণ বাংলাসাহিত্যের ইতস্তত যেটুকু পাওয়া যায় তাহাই পর্যাপ্ত; তাহার অতিরিক্ত যাহা পাঠ্যগ্রন্থে আলোচিত হয় তাহা ব্যক্তিগত কাহিনীমাত্র।

কিন্তু দীনেশবাবুর এই গ্রন্থে হুসেন-শা পরাগল-খাঁ ছুটি-খাঁ'র সহিত আমাদের যেটুকু পরিচয় হইয়াছে তাহাতে ইতিহাস আমাদের কাছে

অনেকটা সজীব হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমান ও হিন্দু যে কত কাছাকাছি ছিল, নানা উপদ্রব-উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে যে হৃদ্যতার পথ ছিল, ইহা এমন একটি কথা যাহা যথার্থই জ্ঞাতব্য, যাহা প্রকৃতপক্ষেই ঐতিহাসিক। ইহা দেশের কথা, ইহা লোকবিশেষের সংবাদবিশেষ নহে।

যেমন ভূস্তরপর্যায়ে ভূমিকম্প অগ্নি-উচ্ছ্বাস জলপ্লাবন তুষারসংহতি কালে কালে ভূমিগঠনের ইতিহাস নানা অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে এবং বৈজ্ঞানিক সেই লিপি উদ্‌ঘাটন করিয়া বিচিত্র সৃজনশক্তির রহস্যলীলা বিস্ময়ের সহিত পাঠ করেন, তেমনি যে-সকল প্রলয়শক্তি ও সৃজনশক্তি অদৃশ্যভাবে সমাজকে পরিণতি দান করিয়া আসিয়াছে সাহিত্যের স্তরে স্তরে তাহাদের ইতিবৃত্ত আপনি মুদ্রিত হইয়া যায়। সেই নিগূঢ় ইতিহাসটি উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলে প্রকৃতভাবে সজীবভাবে আমাদের দেশকে আমরা জানিতে পারি। রাজার দপ্তর ঘাঁটিয়া যে-সকল কীটজর্জর দলিল পাওয়া যায় তাহাতে অনেক সময়ে কেবলমাত্র কৌতূহল পরিতৃপ্ত ও অনেক সময়ে ভুল ইতিহাসের সৃষ্টি হইতে পারে; কারণ, তাহাকে তাহার যথাস্থান ও যথাসময় হইতে, তাহার চারি পাশ হইতে, বিচ্যুত আকারে যখন দেখি তখন কল্পনা ও প্রবৃত্তির বিশেষ ঝোঁকে তাহাকে অসত্যরূপে বড়ো বা অসত্যরূপে ছোটো করিয়া দেখিতে পারি।

বৌদ্ধযুগের পরবর্তী ভারতবর্ষই বর্তমান ভারতবর্ষ। সেই যুগের অন্তিম অবস্থায় যখন গৌড়ের রাজসিংহাসন ক্ষণে ক্ষণে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজত্বের মধ্যে দোলায়মান হইতেছিল তখন প্রজাসাধারণের মধ্যে সমাজ যে স্থিরভাবে ছিল, তাহা সম্ভব নহে। তখনকার সেই আধ্যাত্মিক অরাজকতার মধ্যে বাংলাদেশে যেন একটা দেবদেবীর লড়াই বাধিয়াছিল; তখন সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম-সমেত এক দেবতার মন্দির আর-এক দেবতা অধিকার করিয়া পূজার্চনায় নানাপ্রকার মিশ্রণ উৎপন্ন করিতেছিল। তখন

এক দেবতার বিগ্রহে আর-এক দেবতার সঞ্চার, এক সম্প্রদায়ের তীর্থে আর-এক সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব, এমনি একটা বিপর্যয়ব্যাপার ঘটিতেছিল। ঠিক সেইসময়কার কথা সাহিত্যে আমরা স্পষ্ট করিয়া খুঁজিয়া পাই না।

ইহা দেখিতেছি, বৈদিক কালের দেবতন্ত্রে মহাদেবের আধিপত্য নাই। তাহার পরে দীর্ঘকালের ইতিহাসহীন নিস্তব্ধতা কাটিয়া গেলে দেখিতে পাই, ইন্দ্র ও বরুণ ছায়ার মতো অস্পষ্ট হইয়া গেছে এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে দ্বন্দ্ব ও মিলন ঘটিতেছে। এই দৈবসংগ্রামে ব্রহ্মা সর্বপ্রথমেই পূজাগৃহ হইতে দূরে আশ্রয় লইলেন, বিষ্ণু নানা পরিবর্তনের মধ্যে নানা আকারে নিজের দাবি রক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং মহেশ্বর এক সময়ে অধিকাংশ ভারত অধিকার করিয়া লইলেন।

এই-সকল দেবদ্বন্দ্বের মূল কোথায় তাহা অনুসন্ধানযোগ্য। ভারতবর্ষের কটাহে আর্য অনার্য নানা জাতির সম্মিশ্রণ হইয়াছিল। এক-এক সময়ে এক-এক জাতি ফুটিয়া উঠিয়া আপন আপন দেবতাকে জয়ী করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনবরত বিপ্লবের সময় হিন্দুর প্রতিভা সমস্ত বিরোধবিপ্লবের মধ্যে আপনার ঐক্যসূত্র বিস্তার করিয়া নানা বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আর্য-অনার্যের সমন্বয়-স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিল।

কথাসরিৎসাগরে আছে, একদা ব্রহ্মা ও বিষ্ণু হিমাদ্রিপাদমূলে কঠোর-তপস্যা-সহকারে ধূর্জটির আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শিব তুষ্ট হইয়া বর দিতে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মা শিবকেই নিজের পুত্ররূপে লাভ করিবার প্রার্থনা করিলেন। এই অনুচিত আকাঙ্ক্ষার জন্য তিনি নিন্দিত ও লোকের নিকট অপূজ্য হইলেন। বিষ্ণু এই বর চাহিলেন, যেন আমি তোমারই সেবাপর হইতে পারি। শিব তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুকে নিজের অর্ধাঙ্গ করিয়া লইলেন। সেই অর্ধাঙ্গই শিবের শক্তিরূপিণী পার্বতী।

এক-এক সময়ে এক-এক দেবতা বড়ো হইয়া অন্যান্য দেবতাকে কিরূপে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই গল্পেই তাহা বুঝা যায়। ব্রহ্মা, যিনি চারি বেদের চতুর্মুখ বিগ্রহস্বরূপ, তিনি বেদবিদ্রোহী বৌদ্ধ-যুগে অধঃকৃত হইয়াছিলেন। বিষ্ণু, যিনি বেদে ব্রাহ্মণদের দেবতা ছিলেন, তিনিও এক সময়ে হীনবল হইয়া এই শ্মশানচারী কপালমালী দিগম্বরের পশ্চাতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শিবের যখন প্রথম অভ্যুত্থান হইয়াছিল তখন বৈদিক দেবতারা যে তাঁহাকে আপনাদের মধ্যে স্থান দিতে চান নাই তাহা দক্ষযজ্ঞের বিবরণেই বুঝা যায়। বস্তুতই তখনকার অন্যান্য আর্যদেবতার সহিত এই ত্রিলোচনের অত্যন্ত প্রভেদ। দক্ষের মুখে যে-সকল নিন্দা বসানো হইয়াছিল তখনকার আর্যমণ্ডলীর মুখে সে নিন্দা স্বাভাবিক। সমস্ত দেবমণ্ডলীর মধ্যে ভূতপ্রেত-পিশাচের দ্বারা এই অদ্ভুত দেবতাকর্তৃক দক্ষযজ্ঞধ্বংস কেবল কাল্পনিক কথা নহে। ইহা একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের তুল্য। আর্যমণ্ডলীর যে বৈদিক যজ্ঞে প্রাচীন আর্যদেবতারা আহূত হইতেন সেই যজ্ঞে এই শ্মশানেশ্বরকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই এবং তাঁহাকে অনার্য অনাচারী বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছিল ; সেই কারণে তাঁহার সেবকদের সহিত আর্যদেবপূজকদের প্রচণ্ড বিরোধ বাধিয়াছিল। এই বিরোধে অনার্য ভূত-প্রেত-পিশাচের দ্বারা বৈদিক যজ্ঞ লণ্ডলণ্ড হইয়া যায় এবং সেই শোণিতাক্ত অপবিত্র যজ্ঞবেদীর উপরে নবাগত দেবতার প্রাধান্য বলপূর্বক স্থাপিত হয়।

আর্যদেবসমাজে এই অদ্ভুতাচারী দেবতা বলপূর্বক প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু ইঁহাকে অনেক জবাবদিহি করিতে হইয়াছিল। কথাসরিৎ-সাগরেই আছে, একদা পার্বতী শম্ভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নরকপালে এবং শ্মশানে তোমার এমন প্রীতি কেন ?'

এ প্রশ্ন তখনকার আর্যমণ্ডলীর প্রশ্ন। আমাদের আর্যদেবতারা স্বর্গবাসী ; তাঁহারা বিকৃতিহীন, সুন্দর, সম্পৎশালী। যে দেবতা স্বর্গবিহারী নহেন,

ভস্ম নৃমুণ্ড রুধিরাক্তহস্তীচর্ম যাঁহার সাজ, তাঁহার নিকট হইতে কোনো কৈফিয়ত না লইয়া তাঁহাকে দেবসভায় স্থান দেওয়া যায় না।

মহেশ্বর উত্তর করিলেন, 'কল্পাবসানে যখন জগৎ জলময় ছিল তখন আমি উরু ভেদ করিয়া একবিন্দু রক্তপাত করি। সেই রক্ত হইতে অণ্ড জন্মে, সেই অণ্ড হইতে ব্রহ্মার জন্ম হয়। তৎপরে আমি বিশ্বসৃজনের উদ্দেশে প্রকৃতিকে সৃজন করি। সেই প্রকৃতিপুরুষ হইতে অন্যান্য প্রজাপতি ও সেই প্রজাপতিগণ হইতে অখিল প্রজার সৃষ্টি হয়। তখন, আমিই চরাচরের সৃজনকর্তা বলিয়া ব্রহ্মার মনে দর্প হইয়াছিল। সেই দর্প সহ্য করিতে না পারিয়া আমি ব্রহ্মার মুণ্ডচ্ছেদ করি— সেই অবধি আমার এই মহাব্রত, সেই অবধিই আমি কপালপাণি ও শ্মশানপ্রিয়।'

এই গল্পের দ্বারা এক দিকে ব্রহ্মার পূর্বতন প্রাধান্যচ্ছেদন ও ধূর্জটির আর্যরীতিবহির্ভূত অদ্ভুত আচারেরও ব্যাখ্যা হইল। এই মুণ্ডমালী প্রেতেশ্বর ভীষণ দেবতা আর্যদের হাতে পড়িয়া ক্রমে কিরূপ পরমশান্ত যোগরত মঙ্গলমূর্তি ধারণ করিয়া বৈরাগ্যবানের ধ্যানের সামগ্রী হইয়াছিলেন তাহা কাহারও অগোচর নাই। কিন্তু তাহাও ক্রমশ হইয়াছিল। অধুনাতন কালে দেবী চণ্ডীর মধ্যে যে ভীষণচঞ্চল ভাবের আরোপ করা হইয়াছে এক সময়ে তাহা প্রধানত শিবের ছিল। শিবের এই ভীষণত্ব কালক্রমে চণ্ডীর মধ্যে বিভক্ত হইয়া শিব একান্ত শান্তনিশ্চল যোগীর ভাব প্রাপ্ত হইলেন।

কিন্নরজাতিসেবিত হিমাদ্রি লঙ্ঘন করিয়া কোন্ শুভ্রকায় রজতগিরিনিভ প্রবল জাতি এই দেবতাকে বহন করিয়া আনিয়াছে? অথবা ইনি লিঙ্গপূজক দ্রাবিড়গণের দেবতা, অথবা ক্রমে উভয় দেবতায় মিশ্রিত হইয়া ও আর্য-উপাসকগণকর্তৃক সংস্কৃত হইয়া এই দেবতার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষীয় আর্যদেবতত্ত্বের ইতিহাসে আলোচ্য। সে ইতিহাস এখনো লিখিত হয় নাই। আশা করি, তাহার অন্য ভাষা হইতে অনুবাদের অপেক্ষায়

আমরা বসিয়া নাই।

কখনো সাংখ্যের ভাবে, কখনো বেদান্তের ভাবে, কখনো মিশ্রিত ভাবে
বশক্তি, কখনো বা জড়িত হইয়া, কখনো বা স্বতন্ত্র হইয়া, ভারতবর্ষে
র্তিত হইতেছিলেন। এই রূপান্তরের কালনির্ণয় দুরূহ। ইহার বীজ
ন ছড়ানো হইয়াছিল এবং কোন্ বীজ কখন অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িয়া
ঠিয়াছে তাহা সন্ধান করিতে হইবে। ইহা নিঃসন্দেহ যে, এই-সকল
পরিবর্তনের মধ্যে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়াছে।
বিপুল ভারতসমাজ-গঠনে নানাজাতীয় স্তর যে মিশ্রিত হইয়াছে, তাহা
নিয়তই আমাদের ধর্মপ্রণালীর নানা বিসদৃশ ব্যাপারের বিরোধ ও সমন্বয়-চেষ্টায় স্পষ্টই বুঝা যায়। ইহাও বুঝা যায়, অনার্যগণ মাঝে মাঝে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং আর্যগণ তাহাদের অনেক আচারব্যবহার-পূজা-পদ্ধতির দ্বারা অভিভূত হইয়াও আপন প্রতিভাবলে সে-সমস্তকে দার্শনিক ইন্দ্রজাল-দ্বারা আর্য আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করিয়া লইতেছিলেন। সেইজন্য আমাদের প্রত্যেক দেবদেবীর কাহিনীতে এত বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা, একই পদার্থের মধ্যে এত বিরুদ্ধ ভাবের ও মতের সমাবেশ।

এক কালে ভারতবর্ষে প্রবলতাপ্রাপ্ত অনার্যদের সহিত ব্রাহ্মণপ্রধান আর্যদের দেবদেবী ক্রিয়াকর্ম লইয়া এই-যে বিরোধ বাধিয়াছিল সেই বহুকালব্যাপী বিপ্লবের মৃদুতর আন্দোলন সেদিন পর্যন্ত বাংলাকেও আঘাত করিতেছিল, দীনেশবাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পড়িলে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্য পড়িলে দেখিতে পাই, শিব যখন ভারত-বর্ষের মহেশ্বর তখন কালিকা অন্যান্য মাতৃকাগণের পশ্চাতে মহাদেবের অনুচরীবৃত্তি করিয়াছিলেন। ক্রমে কখন তিনি করালমূর্তি ধারণ করিয়া শিবকেও অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইলেন তাহার ক্রমপরম্পরা নির্দেশ করার স্থান ইহা নহে, ক্ষমতাও আমার নাই। কুমারসম্ভব কাব্যে বিবাহকালে

শিব যখন হিমাদ্রিভবনে চলিয়াছিলেন তখন তাঁহার পশ্চাতে [illegible]
এবং—

তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং
কালী কপালাভরণা চকাশে।

তাঁহাদেরও পশ্চাতে কপালভূষণা কালী প্রকাশ পাইতেছিলেন। এই কালীর সহিত মহাদেবের কোনো ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ ব্যক্ত হয় নাই।

মেঘদূতে গোপবেশী বিষ্ণুর কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু মেঘের ভ্রমণ-কালে কোনো মন্দির উপলক্ষ্য করিয়া বা উপমাচ্ছলে কালিকাদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্পষ্টই দেখা যায়, তৎকালে ভদ্রসমাজের দেবতা ছিলেন মহেশ্বর। মালতীমাধবেরও করালাদেবীর পূজোপচারে যে নৃশংস বীভৎসতা দেখা যায় তাহা কখনোই আর্যসমাজের ভদ্রমণ্ডলীর অনুমোদিত ছিল বলিয়া মনে করিতে পারি না।

এক সময়ে এই দেবীপূজা যে ভদ্রসমাজের বহির্ভূত ছিল তাহা কাদম্বরীতে দেখা যায়। মহাশ্বেতাকে শিবমন্দিরেই দেখি; কিন্তু কবি ঘৃণার সহিত অনার্য শবরের পূজা-পদ্ধতির যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায়, পশুরুধিরের দ্বারা দেবতার্চন ও মাংসদ্বারা বলিকর্ম তখন ভদ্রমণ্ডলীর কাছে নিন্দিত ছিল। কিন্তু সেই ভদ্রমণ্ডলীও পরাস্ত হইয়াছিলেন। সেই সামাজিক মহোৎপাতের দিনে নীচের জিনিস উপরে এবং উপরের জিনিস নীচে বিক্ষিপ্ত হইতেছিল।

বঙ্গসাহিত্যের আরম্ভস্তরে সেই-সকল উৎপাতের চিহ্ন লিখিত আছে। দীনেশবাবু অদ্ভুত পরিশ্রমে ও প্রতিভায় এই সাহিত্যের স্তরগুলি যথাক্রমে বিন্যাস করিয়া বঙ্গসমাজের নৈসর্গিক প্রক্রিয়ার ইতিহাস আমাদের দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন।

তিনি যে ধর্মকলহব্যাপারের সম্মুখে আমাদিগকে দণ্ডায়মান করিয়াছেন সেখানে বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের দেবতা শিবের বড়ো দুর্গতি। তাঁহার এত-

কালের প্রাধান্য 'মেয়ে দেবতা' কাড়িয়া লইবার জন্য রণভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; শিবকে পরাস্ত হইতে হইল।

স্পষ্টই দেখা যায় এই কলহ বিশিষ্ট দলের সহিত ইতরসাধারণের কলহ। উপেক্ষিত সাধারণ যেন তাহাদের প্রচণ্ডশক্তি মাতৃদেবতার আশ্রয় লইয়া ভদ্রসমাজের শান্তসমাহিত নিশ্চেষ্ট বৈদান্তিক যোগীশ্বরকে উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

এক সময়ে বেদ তাহার দেবতাগণকে লইয়া ভারতবর্ষের চিত্তক্ষেত্র হইতে দূরে গিয়াছিল বটে ; কিন্তু বেদান্ত এই স্থাণুকে ধ্যানের আশ্রয়স্বরূপ অবলম্বন করিয়া জ্ঞানী গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীদের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কিন্তু এই জ্ঞানীর দেবতা অজ্ঞানীদিগকে আনন্দদান করিত না, জ্ঞানীরাও অজ্ঞানীদিগকে অবজ্ঞাভরে আপন অধিকার হইতে দূরে রাখিতেন। ধন এবং দারিদ্র্যের মধ্যেই হউক, উচ্চপদ ও হীনপদের মধ্যেই হউক, বা জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যেই হউক, যেখানে এতবড়ো একটা বিচ্ছেদ ঘটে সেখানে ঝড় না আসিয়া থাকিতে পারে না। গুরুতর পার্থক্যমাত্রই ঝড়ের কারণ।

আর্য-অনার্য যখন মেশে নাই তখনো ঝড় উঠিয়াছিল, আবার ভদ্র-অভদ্র-মণ্ডলীতে জ্ঞানী-অজ্ঞানীর ভেদ যখন অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল তখনো ঝড় উঠিয়াছে।

শংকরাচার্যের ছাত্রগণ যখন বিদ্যাকেই প্রধান করিয়া তুলিয়া জগৎকে মিথ্যা ও কর্মকে বন্ধন বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছিলেন তখন সাধারণে মায়াকেই, শান্তস্বরূপের শক্তিকেই, মহামায়া বলিয়া শক্তীশ্বরের ঊর্ধ্বে দাঁড় করাইবার জন্য খেপিয়া উঠিয়াছিল। মায়াকে মায়াধিপতির চেয়ে বড়ো বলিয়া ঘোষণা করা, এই এক বিদ্রোহ।

ভারতবর্ষে এই বিদ্রোহের প্রথম সূত্রপাত কবে হইয়াছিল বলা যায় না, কিন্তু এই বিদ্রোহ দেখিতে দেখিতে সর্বসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ

করিয়াছিল। কারণ, ব্রহ্মের সহিত জগৎকে ও আত্মাকে প্রেমের সম্বন্ধে যোগ করিয়া না দেখিলে হৃদয়ের পরিতৃপ্তি হয় না। তাঁহার সহিত জগতের সম্বন্ধ স্বীকার না করিলেই জগৎ মিথ্যা, সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই জগৎ সত্য। যেখানে ব্রহ্মের শক্তি বিরাজমান সেইখানেই ভক্তের অধিকার, যেখানে তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সেখানে ভক্তির মাৎসর্য উপস্থিত হয়। ব্রহ্মের শক্তিকে ব্রহ্মের চেয়ে বড়ো বলা ভক্তির মাৎসর্য, কিন্তু তাহা ভক্তি। শক্তির পরিচয়কে একেবারেই অসত্য বলিয়া গণ্য করাতে ও তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুখ হইবার চেষ্টা করাতেই ক্ষুব্ধ ভক্তি যেন আপনার তীর লঙ্ঘন করিয়া উদ্‌বেল হইয়াছিল।

এইরূপ বিদ্রোহ-কালে শক্তিকে উৎকটরূপে প্রকাশ করিতে গেলে প্রথমে তাহার প্রবলতা, তাহার ভীষ্মতাই জাগাইয়া তুলিতে হয়। তাহা ভয় হইতে রক্ষা করিবার সময় মাতা ও ভয় জন্মাইবার সময় চণ্ডী। তাহার ইচ্ছা কোনো বিধিবিধানের দ্বারা নিয়মিত নহে, তাহা বাধাবিহীন লীলা। কখন কী করে, কেন কী রূপ ধরে, তাহা বুঝিবার জো নাই, এইজন্য তাহা ভয়ংকর।

নিশ্চেষ্টতার বিরুদ্ধে এই প্রচণ্ডতার ঝড়। নারী যেমন স্বামীর নিকট হইতে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যের স্বাদবিহীন মৃদুতা অপেক্ষা প্রবল শাসন ভালো-বাসে, বিদ্রোহী ভক্ত সেইরূপ নির্‌গুণ নিষ্ক্রিয়কে পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছাময়ী শক্তিকে ভীষণতার মধ্যে সর্বান্তঃকরণে অনুভব করিতে ইচ্ছা করিল।

শিব আর্যসমাজে ভিড়িয়া যে ভীষণতা, যে শক্তির চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিলেন, নিম্নসমাজে তাহা নষ্ট হইতে দিল না। যোগানন্দের শান্ত ভাবকে তাহারা উচ্চশ্রেণীর জন্য রাখিয়া ভক্তির প্রবল উত্তেজনার আশায় শক্তির উগ্রতাকেই নাচাইয়া তুলিল। তাহারা শক্তিকে শিব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া বিশেষভাবে শক্তির পূজা খাড়া করিয়া তুলিল।

কিন্তু কী আধ্যাত্মিক, কী আধিভৌতিক, ঝড় কখনোই চিরদিন

থাকিতে পারে না। ভক্তহৃদয় এই চণ্ডীশক্তিকে মাধুর্যে পরিণত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম আশ্রয় করিল। প্রেম সকল শক্তির পরিণাম; তাহা চূড়ান্ত শক্তি বলিয়াই তাহার শক্তিরূপ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। ভক্তির পথ কখনোই প্রচণ্ডতার মধ্যে গিয়া থামিতে পারে না; প্রেমের আনন্দেই তাহার অবসান হইতে হইবে। বস্তুত মাঝখানে শিবের ও শক্তির যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের মধ্যে সেই শিব-শক্তির কতকটা সম্মিলনচেষ্টা দেখা যাইতেছে। মায়াকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিলে তাহা ভয়ংকরী, ব্রহ্মকে মায়া হইতে স্বতন্ত্র করিলে ব্রহ্ম অনধিগম্য— ব্রহ্মের সহিত মায়াকে সম্মিলিত করিয়া দেখিলেই প্রেমের পরিতৃপ্তি।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে এই পরিবর্তনপরম্পরার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগ ও শিবপূজার কালে বঙ্গসাহিত্যের কী অবস্থা ছিল তাহা দীনেশবাবু খুঁজিয়া পান নাই। 'ধান ভানতে শিবের গীত' প্রবাদে বুঝা যায়, শিবের গীত এক সময়ে প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে-সমস্তই সাহিত্য হইতে অন্তর্ধান করিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের যে-সকল চিহ্ন ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় সে-সকলও বৌদ্ধযুগের বহুপরবর্তী। আমাদের চক্ষে বঙ্গসাহিত্যমঞ্চের প্রথম যবনিকাটি যখন উঠিয়া গেল তখন দেখি সমাজে একটি কলহ বাধিয়াছে, সে দেবতার কলহ। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থখানির পঞ্চম অধ্যায়ে দীনেশবাবু প্রাচীন শিবের প্রতি চণ্ডী বিষহরি ও শীতলার আক্রমণব্যাপার সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। এই-সকল স্থানীয় দেবদেবীরা জনসাধারণের কাছে বল পাইয়া কিরূপ দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের ব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমেই চোখে পড়ে, দেবী চণ্ডী নিজের পূজাস্থাপনের জন্য অস্থির। যেমন করিয়া হউক, ছলে বলে কৌশলে মর্তে পূজা প্রচার করিতে হইবেই। ইহাতে বুঝা যায়, পূজা লইয়া একটা বাদ-বিবাদ আছে। তাহার পর দেখি, যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া দেবী পূজা প্রচার করিতে উদ্যত

তাহারা উচ্চশ্রেণীর লোক নহে। যে নীচের তাহাকেই উপরে উঠাইবেন ইহাতেই দেবীর শক্তির পরিচয়। নিম্নশ্রেণীর পক্ষে এমন সান্ত্বনা, এমন বলের কথা আর কী আছে! যে দরিদ্র দুইবেলা আহার জোটাইতে পারে না সেই শক্তির লীলায় সোনার ঘড়া পাইল; যে ব্যাধ নীচজাতীয়, ভদ্রজনের অবজ্ঞাভাজন, সেই মহত্ত্বলাভ করিয়া কলিঙ্গরাজের কন্যাকে বিবাহ করিল। ইহাই শক্তির লীলা।

তাহার পরে দেখি, শিবের পূজাকে হতমান করিয়াই নিজের পূজা প্রচার করা দেবীর চেষ্টা। শিব তাঁহার স্বামী বটেন, কিন্তু তাহাতে কোনো সংকোচ নাই। শিবের সহিত শক্তির এই লড়াই। এই লড়াইয়ে পদে পদে দয়ামায়া বা ন্যায়-অন্যায় পর্যন্ত উপেক্ষিত হইয়াছে।

কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ব্যাধের গল্পে দেখিতে পাই, শক্তির ইচ্ছায় নীচ উচ্চে উঠিয়াছে। কেন উঠিয়াছে তাহার কোনো কারণ নাই; ব্যাধ যে ভক্ত ছিল এমনও পরিচয় পাই না। বরঞ্চ সে দেবীর বাহন সিংহকে মারিয়া দেবীর ক্রোধভাজন হইতেও পারিত। কিন্তু দেবী নিতান্তই যথেচ্ছাক্রমে তাহাকে দয়া করিলেন। ইহাই শক্তির খেলা।

ব্যাধকে যেমন বিনা কারণে দেবী দয়া করিলেন, কলিঙ্গরাজকে তেমনি তিনি বিনা দোষে নিগ্রহ করিলেন। তাহার দেশ জলে ডুবাইয়া দিলেন। জগতে ঝড়-জলপ্লাবন-ভূমিকম্পে যে শক্তির প্রকাশ দেখি তাহার মধ্যে ধর্মনীতিসংগত কার্যকারণমালা দেখা যায় না এবং সংসারে সুখদুঃখ-বিপৎসম্পদের যে আবর্তন দেখিতে পাই তাহার মধ্যেও ধর্মনীতির সুসংগতি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। দেখিতেছি, যে শক্তি নির্বিচারে পালন করিতেছে সেই শক্তিই নির্বিচারে ধ্বংস করিতেছে। এই অহৈতুক পালনে এবং অহৈতুক বিনাশে সাধু-অসাধুর ভেদ নাই। এই দয়ামায়াহীন ধর্মাধর্ম-বিবর্জিত শক্তিকে বড়ো করিয়া দেখা তখনকার কালের পক্ষে বিশেষ স্বাভাবিক ছিল।

তখন নীচের লোকের আকস্মিক অভ্যুত্থান ও উপরের লোকের হঠাৎ পতন সর্বদাই দেখা যাইত। হীনাবস্থার লোক কোথা হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া অরণ্য কাটিয়া নগর বানাইয়াছে এবং প্রতাপশালী রাজা হঠাৎ পরাস্ত হইয়া লাঞ্ছিত হইয়াছে। তখনকার নবাব-বাদশাহদের ক্ষমতাও বিধিবিধানের অতীত ছিল; তাঁহাদের খেয়ালমাত্রে সমস্ত হইতে পারিত। ইঁহারা দয়া করিলেই সকল বাধা অতিক্রম করিয়া নীচ মহৎ হইত, ভিক্ষুক রাজা হইত। ইঁহারা নির্দয় হইলে ধর্মের দোহাইও কাহাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিতে পারিত না। ইহাই শক্তি।

এই শক্তির প্রসন্ন মুখ মাতা, এই শক্তির অপ্রসন্ন মুখ চণ্ডী। ইঁহারই 'প্রসাদোঽপি ভয়ংকরঃ'; সেইজন্য সর্বদাই করজোড়ে বসিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু যতক্ষণ ইনি যাহাকে প্রশ্রয় দেন ততক্ষণ তাহার সাত-খুন মাপ; যতক্ষণ সে প্রিয়পাত্র ততক্ষণ তাহার সংগত-অসংগত সকল আবদারই অনায়াসে পূর্ণ হয়।

এইরূপ শক্তি ভয়ংকরী হইলেও মানুষের চিত্তকে আকর্ষণ করে। কারণ, ইহার কাছে প্রত্যাশার কোনো সীমা নাই। আমি অন্যায় করিলেও জয়ী হইতে পারি, আমি অক্ষম হইলেও আমার দুরাশার চরমতম স্বপ্ন সফল হইতে পারে। যেখানে নিয়মের বন্ধন, ধর্মের বিধান আছে, সেখানে দেবতার কাছেও প্রত্যাশাকে খর্ব করিয়া রাখিতে হয়।

এই-সকল কারণে যে-সময় বাদশাহ ও নবাবের অপ্রতিহত ইচ্ছা জনসাধারণকে ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল এবং ন্যায়-অন্যায় সম্ভব-অসম্ভবের ভেদচিহ্নকে ক্ষীণ করিয়া আনিয়াছিল, হর্ষশোক-বিপৎসম্পদের অতীত শান্তসমাহিত বৈদান্তিক শিব সে-সময়কার সাধারণের দেবতা হইতে পারেন না। রাগদ্বেষ-প্রসাদ-অপ্রসাদের-লীলা-চঞ্চলা যদৃচ্ছাচারিণী শক্তিই তখনকার কালের দেবত্বের চরমাদর্শ। সেই-জন্যই তখনকার লোকে ঈশ্বরকে অপমান করিয়া বলিত: দিল্লীশ্বরো বা

জগদীশ্বরো বা !

কবিকঙ্কণে দেবী এই-যে ব্যাধের দ্বারা নিজের পূজা মর্তে প্রচার করিলেন, স্বয়ং ইন্দ্রের পুত্র যে ব্যাধরূপে মর্তে জন্মগ্রহণ করিল, বাংলাদেশের এই লোকপ্রচলিত কথার কি কোনো ঐতিহাসিক অর্থ নাই ? পশুবলি প্রভৃতির দ্বারা যে ভীষণ পূজা এক কালে ব্যাধের মধ্যে প্রচলিত ছিল সেই পূজাই কি কালক্রমে উচ্চসমাজে প্রবেশলাভ করে নাই ? কাদম্বরীতে বর্ণিত শবর-নামক ক্রূরকর্মা ব্যাধজাতির পূজাপদ্ধতিতেও ইহারই কি প্রমাণ দিতেছে না ? উড়িষ্যাই কলিঙ্গদেশ। বৌদ্ধধর্ম-লোপের পর উড়িষ্যায় শৈবধর্মের প্রবল অভ্যুদয় হইয়াছিল, ভুবনেশ্বর তাহার প্রমাণ। কলিঙ্গের রাজারাও প্রবল রাজা ছিলেন। এই কলিঙ্গরাজত্বের প্রতি শৈবধর্মবিদ্বেষীদের আক্রোশপ্রকাশ, ইহার মধ্যেও দূর ইতিহাসের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়।

ধনপতির গল্পে দেখিতে পাই, উচ্চজাতীয় ভদ্রবৈশ্য শিবোপাসক। শুদ্ধমাত্র এই পাপে চণ্ডী তাঁহাকে নানা দুর্গতির দ্বারা পরাস্ত করিয়া আপন মাহাত্ম্য প্রমাণ করিলেন।

বস্তুত সংসারিক সুখদুঃখ বিপৎসম্পদের দ্বারা নিজের ইষ্টদেবতার বিচার করিতে গেলে, সেই অনিশ্চয়তার কালে শিবের পূজা টিঁকিতে পারে না। অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার তরঙ্গ যখন চারি দিকে জাগিয়া উঠিয়াছে তখন যে দেবতা ইচ্ছাসংযমের আদর্শ তাঁহাকে সাংসারিক উন্নতির উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দুর্গতি হইলেই মনে হয় আমার নিশ্চেষ্ট দেবতা আমার জন্য কিছুই করিতেছেন না, ভোলানাথ সমস্ত ভুলিয়া বসিয়া আছেন। চণ্ডীর উপাসকেরাই কি সকল দুর্গতি এড়াইয়া উন্নতিলাভ করিতেছিলেন ? অবশ্যই নহে। কিন্তু শক্তিকে দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলাইবার উপায় থাকে। শক্তিপূজক দুর্গতির মধ্যেও শক্তি অনুভব করিয়া ভীত হয়, উন্নতিতেও শক্তি

অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। 'আমারই প্রতি বিশেষ অকৃপা' ইহার ভয় যেমন আত্যন্তিক 'আমারই প্রতি বিশেষ দয়া' ইহার আনন্দও তেমনি অতিশয়। কিন্তু যে দেবতা বলেন 'সুখদুঃখ দুর্গতিসদ্‌গতি— ও কিছুই নয়, ও কেবল মায়া, ও দিকে দৃক্‌পাত করিয়ো না' সংসারে তাঁহার উপাসক অল্পই অবশিষ্ট থাকে। সংসার মুখে যাহাই বলুক, মুক্তি চায় না, ধনজনমান চায়। ধনপতির মতো ব্যবসায়ী লোক সংযমী সদাশিবকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিল না; বহুতর নৌকা ডুবিল, ধনপতিকে শেষকালে শিবের উপাসনা ছাড়িয়া শক্তি-উপাসক হইতে হইল।

কিন্তু তখনকার নানাবিভীষিকাগ্রস্ত পরিবর্তনব্যাকুল দুর্গতির দিনে শক্তিপূজারূপে এই-যে প্রবলতার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা আমাদের মনুষ্যত্বকে চিরদিন পরিতৃপ্ত রাখিতে পারে না। যে ফলের মিষ্ট হইবার ক্ষমতা আছে সে প্রথম অবস্থার তীব্র অম্লত্ব পক্ব অবস্থায় পরিহার করে। যথার্থ ভক্তি সুতীব্রকঠিন শক্তিকে গোড়ায় যদি বা প্রাধান্য দেয় শেষকালে তাহাকে উত্তরোত্তর মধুর কোমল ও বিচিত্র করিয়া আনে। বাংলাদেশে অত্যুগ্র চণ্ডী ক্রমশ মাতা অন্নপূর্ণার রূপে, ভিখারির গৃহলক্ষ্মীরূপে, বিচ্ছেদবিধুর পিতামাতার কন্যারূপে— মাতা পত্নী ও কন্যা রমণীর এই ত্রিবিধ মঙ্গলসুন্দর রূপে— দরিদ্র বাঙালির ঘরে যে রসসঞ্চার করিয়াছেন চণ্ডীপূজার সেই পরিণামরমণীয়তার দৃশ্য দীনেশবাবু তাঁহার এই গ্রন্থে বঙ্গসাহিত্য হইতে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্ধার করিয়া দেখান নাই। কালিদাসের কুমারসম্ভব সাহিত্যে দাম্পত্যপ্রেমকে মহীয়ান করিয়া এই মঙ্গলভাবটিকে মূর্তিমান করিয়াছিল। বাংলাসাহিত্যে এই ভাবের সম্পূর্ণ পরিস্ফুটতা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তথাপি বাঙালির দরিদ্রগৃহের মধ্যে এই মঙ্গলমাধুর্যসিক্ত দেবভাবের অবতারণা কবিকঙ্কণচণ্ডীতে কিয়ৎপরিমাণে আপনাকে অঙ্কিত করিয়াছে, অন্নদামঙ্গলও তাহার উপর রঙ ফলাইয়াছে।

কিন্তু মাধুর্যের ভাব গীতিকবিতার সম্পত্তি। চণ্ডীপূজা ক্রমে যখন ভক্তিতে স্নিগ্ধ ও রসে মধুর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন তাহা মঙ্গলকাব্য ত্যাগ করিয়া খণ্ড খণ্ড গীতে উৎসারিত হইল। এই-সকল বিজয়া-আগমনীর গীত ও গ্রাম্য খণ্ডকবিতাগুলি বাংলাদেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। বৈষ্ণবপদাবলীর ন্যায় এগুলি সংগৃহীত হয় নাই। ক্রমে ইহারা নষ্ট ও বিকৃত হইবে, এমন সম্ভাবনা আছে। এক সময়ে 'ভারতী'তে 'গ্রাম্য সাহিত্য'[১] -নামক প্রবন্ধে আমি এই কাব্যগুলির আলোচনা করিয়াছিলাম।

চণ্ডী যেমন প্রচণ্ড উপদ্রবে আপনার পূজা প্রতিষ্ঠা করেন মনসা-শীতলাও তেমনি তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। শৈব চাঁদ-সদাগরের দুরবস্থা সকলেই জানেন। বিষহরি, দক্ষিণরায়, সত্যপীর প্রভৃতি আরও অনেক ছোটোখাটো দেবতা আপন আপন বিক্রম প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। এমনি করিয়া সমাজের নিম্নস্তরগুলি প্রবল ভূমিকম্পে সমাজের উপরের স্তরে উঠিবার জন্য কিরূপ চেষ্টা করিয়াছিল দীনেশবাবুর গ্রন্থে পাঠকেরা তাহার বিবরণ পাইবেন— এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা সম্ভব নহে।

কিন্তু দীনেশবাবুর সাহায্যে বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, সাহিত্যে বৈষ্ণবই জয়লাভ করিয়াছেন। শংকরের অভ্যুত্থানের পর শৈবধর্ম ক্রমশই অদ্বৈতবাদকে আশ্রয় করিতেছিল। বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়, জনসাধারণের ভক্তি-ব্যাকুল হৃদয়সমুদ্র হইতে শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুই দ্বৈতবাদের ঢেউ উঠিয়া সেই শৈবধর্মকে ভাঙিয়াছে। এই উভয় ধর্মেই ঈশ্বরকে বিভক্ত করিয়া দেখিয়াছে। শাক্তের বিভাগ গুরুতর। যে শক্তি ভীষণ, যাহা খেয়ালের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা আমাদিগকে দূরে রাখিয়া স্তব্ধ করিয়া দেয়; সে আমার সমস্ত দাবি করে, তাহার উপর

১ 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত

আমার কোনো দাবি নাই। শক্তিপূজায় নীচকে উচ্চে তুলিতে পারে, কিন্তু উচ্চ-নীচের ব্যবধান সমানই রাখিয়া দেয়, সক্ষম-অক্ষমের প্রভেদকে সুদৃঢ় করে। বৈষ্ণবধর্মের শক্তি হ্লাদিনী শক্তি ; সে শক্তি বলরূপিণী নহে, প্রেমরূপিণী। তাহাতে ভগবানের সহিত জগতের যে দ্বৈতবিভাগ স্বীকার করে তাহা প্রেমের বিভাগ, আনন্দের বিভাগ। তিনি বল ও ঐশ্বর্য বিস্তার করিবার জন্য শক্তিপ্রয়োগ করেন নাই ; তাঁহার শক্তি সৃষ্টির মধ্যে নিজেতে নিজে আনন্দিত হইতেছে, এই বিভাগের মধ্যে তাঁহার আনন্দ নিয়ত মিলনরূপে প্রতিষ্ঠিত। শাক্তধর্মে অনুগ্রহের অনিশ্চিত সম্বন্ধ, বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের নিশ্চিত সম্বন্ধ। শক্তির লীলায় কে দয়া পায় কে না পায় তাহার ঠিকানা নাই ; কিন্তু বৈষ্ণবধর্মে প্রেমের সম্বন্ধ যেখানে সেখানে সকলেরই নিত্য দাবি। শাক্তধর্মে ভেদকেই প্রাধান্য দিয়াছে ; বৈষ্ণবধর্মে এই ভেদকে নিত্যমিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

বৈষ্ণব এইরূপে ভেদের উপরে সাম্যস্থাপন করিয়া প্রেমপ্লাবনে সমাজের সকল অংশকে সমান করিয়া দিয়াছিলেন। এই প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব স্বাধীনতা প্রবলবেগে বাংলা সাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে যাহা পূর্বাপরের তুলনা করিয়া দেখিলে হঠাৎ খাপছাড়া বলিয়া বোধ হয়। তাহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা, উপমা ও আবেগের প্রবলতা, সমস্ত বিচিত্র ও নূতন। তাহার পূর্ববর্তী বঙ্গভাষা বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত দীনতা কেমন করিয়া এক মুহূর্তে দূর হইল, অলংকারশাস্ত্রের পাষাণবন্ধনসকল কেমন করিয়া এক মুহূর্তে বিদীর্ণ হইল, ভাষা এত শক্তি পাইল কোথায়, ছন্দ এত সংগীত কোথা হইতে আহরণ করিল? বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নহে, প্রবীণ সমালোচকের অনুশাসনে নহে— দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া আপনার গান ধরিল। প্রকাশ করিবার আনন্দ এত, আবেগ এত যে, তখনকার উন্নত মার্জিত কালোয়াতি সংগীত থই পাইল

না; দেখিতে দেখিতে দশে মিলিয়া এক অপূর্ব সংগীতপ্রণালী তৈরি করিল, আর-কোনো সংগীতের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া শক্ত। মুক্তি কেবল জ্ঞানীর নহে, ভগবান কেবল শাস্ত্রের নহেন, এই মন্ত্র যেমনি উচ্চারিত হইল অমনি দেশের যত পাখি সুপ্ত হইয়া ছিল সকলেই এক নিমেষে জাগরিত হইয়া গান ধরিল।

ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, বাংলাদেশ আপনাকে যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছিল বৈষ্ণবযুগে। সেই সময়ে এমন একটি গৌরব সে প্রাপ্ত হইয়াছিল যাহা অলোকসামান্য, যাহা বিশেষরূপে বাংলাদেশের, যাহা এ দেশ হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া অন্যত্র বিস্তারিত হইয়াছিল। শাক্তযুগে তাহার দীনতা ঘোচে নাই, বরঞ্চ নানারূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল; বৈষ্ণবযুগে অযাচিত-ঐশ্বর্য-লাভে সে আশ্চর্যরূপে চরিতার্থ হইয়াছে।

শাক্ত যে পূজা অবলম্বন করিয়াছিল তাহা তখনকার কালের অনুগামী। অর্থাৎ সমাজে তখন যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, যে শক্তির খেলা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছিল, যে-সকল আকস্মিক উত্থানপতন লোককে প্রবলবেগে চকিত করিয়া দিতেছিল, মনে মনে তাহাকেই দেবত্ব দিয়া শাক্তধর্ম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বৈষ্ণবধর্ম এক ভাবের উচ্ছ্বাসে সাময়িক অবস্থাকে লঙ্ঘন করিয়া তাহাকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। সাময়িক অবস্থার বন্ধন হইতে এক বৃহৎ আনন্দের মধ্যে সকলকে নিষ্কৃতিদান করিয়াছিল। শক্তি যখন সকলকে পেষণ করিতেছিল, উচ্চ যখন নীচকে দলন করিতেছিল, তখনই সে প্রেমের কথা বলিয়াছিল। তখনই সে ভগবানকে তাঁহার রাজসিংহাসন হইতে আপনাদের খেলাঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল, এমন-কি প্রেমের স্পর্ধায় সে ভগবানের ঐশ্বর্যকে উপহাস করিয়াছিল। ইহাতে করিয়া যে ব্যক্তি তৃণাদপি নীচ সেও গৌরব লাভ করিল; যে ভিক্ষার ঝুলি লইয়াছে সেও সম্মান পাইল; যে ম্লেচ্ছাচারী সেও পবিত্র হইল। তখন সাধারণের হৃদয় রাজার পীড়ন

সমাজের শাসনের উপরে উঠিয়া গেল। বাহ্য অবস্থা সমানই রহিল, কিন্তু মন সেই অবস্থার দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া নিখিলজগৎসভার মধ্যে স্থানলাভ করিল। প্রেমের অধিকারে, সৌন্দর্যের অধিকারে, ভগবানের অধিকারে, কাহারও কোনো বাধা রহিল না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই-যে ভাবোচ্ছ্বাস ইহা স্থায়ী হইল না কেন। সমাজে ইহা বিকৃত ও সাহিত্য হইতে ইহা অন্তর্হিত হইল কেন? ইহার কারণ এই যে, ভাবসৃজনের শক্তি প্রতিভার, কিন্তু ভাব রক্ষা করিবার শক্তি চরিত্রের। বাংলাদেশে ক্ষণে ক্ষণে ভাববিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার পরিণাম দেখিতে পাই না। ভাব আমাদের কাছে সম্ভোগের সামগ্রী, তাহা কোনো কাজের সৃষ্টি করে না, এইজন্য বিকারেই তাহার অবসান হয়।

আমরা ভাব উপভোগ করিয়া অশ্রুজলে নিজেকে প্লাবিত করিয়াছি; কিন্তু পৌরুষলাভ করি নাই, দৃঢ়নিষ্ঠা পাই নাই। আমরা শক্তিপূজায় নিজেকে শিশু কল্পনা করিয়া মা মা করিয়া আবদার করিয়াছি এবং বৈষ্ণব সাধনায় নিজেকে নায়িকা কল্পনা করিয়া মান-অভিমানে বিরহ-মিলনে ব্যাকুল হইয়াছি। শক্তির প্রতি ভক্তি আমাদের মনকে বীর্যের পথে লইয়া যায় নাই, প্রেমের পূজা আমাদের মনকে কর্মের পথে প্রেরণ করে নাই। আমরা ভাববিলাসী বলিয়াই আমাদের দেশে ভাবের বিকার ঘটিতে থাকে, এবং এইজন্যই চরিতকাব্য আমাদের দেশে পূর্ণ সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। এক দিকে দুর্গায় ও আর-এক দিকে রাধায় আমাদের সাহিত্যে নারীভাবই অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বেহুলা ও অন্যান্য নায়িকার চরিত্র-সমালোচনায় দীনেশবাবু তাহার আভাস দিয়াছেন। পৌরুষের অভাব ও ভাবরসের প্রাচুর্য বঙ্গসাহিত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বঙ্গসাহিত্যে দুর্গা ও রাধাকে অবলম্বন করিয়া দুই ধারা দুই পথে গিয়াছে; প্রথমটি গেছে বাংলার গৃহের মধ্যে, দ্বিতীয়টি গেছে বাংলার গৃহের

বাহিরে। কিন্তু এই দুইটি ধারারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রমণী এবং এই দুইটিরই স্রোত ভাবের স্রোত।

যাহা হউক, বঙ্গসাহিত্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাবের সম্বন্ধে যে আলোচনা করা গেল তাহা হইতে সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা একটি সাধারণ তত্ত্ব লাভ করিতে পারি। সমাজের চিত্ত যখন নিজের বর্তমান অবস্থা-বন্ধনে বদ্ধ থাকে এবং সমাজের চিত্ত যখন ভাবপ্রাবল্যে নিজের অবস্থার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয় এই দুই অবস্থার সাহিত্যের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক।

সমাজ যখন নিজের চতুর্দিগ্‌বর্তী বেষ্টনের মধ্যে, নিজের বর্তমান অবস্থার মধ্যেই সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ থাকে, তখনো সে বসিয়া বসিয়া আপনার সেই অবস্থাকে কল্পনার দ্বারা দেবত্ব দিয়া মণ্ডিত করিতে চেষ্টা করে। সে যেন কারাগারের ভিত্তিতে ছবি আঁকিয়া কারাগারকে প্রাসাদের মতো সাজাইতে চেষ্টা পায়। সেই চেষ্টার মধ্যে মানবচিত্তের যে বেদনা, যে ব্যাকুলতা আছে তাহা বড়ো সকরুণ। সাহিত্যে সেই চেষ্টার বেদনা ও করুণা আমরা শাক্তযুগের মঙ্গলকাব্যে দেখিয়াছি। তখন সমাজের মধ্যে যে উপদ্রব-উৎপীড়ন, আকস্মিক উৎপাত, যে অন্যায়, যে অনিশ্চয়তা ছিল, মঙ্গলকাব্য তাহাকেই দেবমর্যাদা দিয়া সমস্ত দুঃখ-অবমাননাকে ভীষণ দেবতার অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করিতেছিল এবং দুঃখক্লেশকে ভাঙাইয়া ভক্তির স্বর্ণমুদ্রা গড়িতেছিল। এই চেষ্টা কারাগারের মধ্যে কিছু আনন্দ কিছু সান্ত্বনা আনে বটে, কিন্তু কারাগারকে প্রাসাদ করিয়া তুলিতে পারে না। এই চেষ্টা সাহিত্যকে তাহার বিশেষ দেশকালের বাহিরে লইয়া যাইতে পারে না।

কিন্তু সমাজ যখন পরিব্যাপ্ত ভাবাবেগে নিজের অবস্থাবন্ধনকে লঙ্ঘন করিয়া আনন্দে ও আশায় উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে তখনই সে হাতের কাছে যে তুচ্ছ ভাষা পায় তাহাকেই অপরূপ করিয়া তোলে, যে সামান্য উপকরণ পায় তাহার দ্বারাই ইন্দ্রজাল ঘটাইতে পারে। এইরূপ অবস্থায়

যে কী হইতে পারে ও না পারে তাহা পূর্ববর্তী অবস্থা হইতে কেহ অনুমান করিতে পারে না।

একটি নূতন আশার যুগ চাই। সেই আশার যুগে মানুষ নিজের সীমা দেখিতে পায় না, সমস্তই সম্ভব বলিয়া বোধ করে। সমস্তই সম্ভব বলিয়া বোধ করিবামাত্র যে বল পাওয়া যায় তাহাতেই অনেক অসাধ্য সাধ্য হয় এবং যাহার যতটা শক্তি আছে তাহা পূর্ণমাত্রায় কাজ করে।

শ্রাবণ ১৩০৯

ঐতিহাসিক উপন্যাস

মানবসমাজের সে বাল্যকাল কোথায় গেল যখন প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, ঘটনা এবং কল্পনা, কয়টি ভাইবোনের মতো একান্নে এবং একত্রে খেলা করিতে করিতে মানুষ হইয়াছিল? আজ তাহাদের মধ্যে যে এতবড়ো একটা গৃহবিচ্ছেদ ঘটিবে তাহা কখনো কেহ স্বপ্নেও জানিত না।

এক সময়ে রামায়ণ-মহাভারত ছিল ইতিহাস। এখনকার ইতিহাস তাহার সহিত কুটুম্বিতা স্বীকার করিতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়; বলে কাব্যের সহিত পরিণীত হইয়া উহার কুল নষ্ট হইয়াছে। এখন তাহার কুল উদ্ধার করা এতই কঠিন হইয়াছে যে, ইতিহাস তাহাকে কাব্য বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করে। কাব্য বলে, ভাই ইতিহাস, তোমার মধ্যে অনেক মিথ্যা আছে, আমার মধ্যেও অনেক সত্য আছে; এসো আমরা পূর্বের মতো আপোস করিয়া থাকি। ইতিহাস বলে, না ভাই, পরস্পরের অংশ বাঁটোয়ারা করিয়া বুঝিয়া লওয়া ভালো। জ্ঞান-নামক আমিন সর্বত্রই সেই বাঁটোয়ারা-কার্য আরম্ভ করিয়াছে। সত্যরাজ্য এবং কল্পনারাজ্যের মধ্যে একটা পরিষ্কার রেখা টানিবার জন্য সে বদ্ধপরিকর।

ইতিহাসের ব্যতিক্রম করা অপরাধে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিরুদ্ধে যে নালিশ উত্থাপিত হইয়াছে তাহাতে বর্তমানকালে সাহিত্যপরিবারের এই গৃহবিচ্ছেদ প্রমাণ হয়।

এ নালিশ কেবল আমাদের দেশে নয়, কেবল নবীনবাবু এবং বঙ্কিম-বাবু অপরাধী নহেন, ঐতিহাসিক উপন্যাস -লেখকদের আদি এবং আদর্শ স্কট্‌ও নিষ্কৃতি পান নাই।

আধুনিক ইংরাজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে ফ্রীম্যান সাহেবের নাম সুবিখ্যাত। উপন্যাসে ইতিহাসের যে বিকার ঘটে সেটার উপরে তিনি আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যাঁহারা য়ুরোপের ধর্মযুদ্ধযাত্রা-

যুগ (The Age of the Crusades) সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা যেন স্কটের আইভ্যান্‌হো পড়িতে বিরত থাকেন।

অবশ্য, য়ুরোপের ধর্মযুদ্ধযাত্রা-যুগ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানা আবশ্যক সন্দেহ নাই, কিন্তু স্কটের আইভ্যান্‌হোর মধ্যে চিরন্তন মানব-ইতিহাসের যে নিত্যসত্য আছে তাহাও আমাদের জানা আবশ্যক। এমন-কি তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের এত বেশি যে, ক্রুজেড-যুগ সম্বন্ধে ভুল সংবাদ পাইবার আশঙ্কাসত্ত্বেও ছাত্রগণ অধ্যাপক ফ্রীম্যানকে লুকাইয়া আইভ্যান্‌হো পাঠ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিবে না।

এখন আলোচ্য এই যে, ইতিহাসের বিশেষ সত্য এবং সাহিত্যের নিত্যসত্য উভয় বাঁচাইয়াই কি স্কট্‌ আইভ্যান্‌হো লিখিতে পারিতেন না?

পারিতেন কি না সে কথা আমাদের পক্ষে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। দেখিতেছি তিনি সে কাজ করেন নাই।

এমন হইতে পারে, তিনি যে ইচ্ছা করিয়া করেন নাই তাহা নহে। অধ্যাপক ফ্রীম্যান ক্রুজেড-যুগ সম্বন্ধে যতটা জানিতেন স্কট্‌ ততটা জানিতেন না। স্কটের সময় প্রমাণবিশ্লেষণ এবং ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান এতদূর অগ্রসর হয় নাই।

প্রতিবাদী বলিবেন, যখন লিখিতে বসিয়াছেন তখন ভালো করিয়া জানিয়া লেখাই উচিত ছিল।

কিন্তু ঐ জানার শেষ হইবে কবে? কবে নিশ্চয় জানিব ক্রুজেড সম্বন্ধে সমস্ত প্রমাণ নিঃশেষ হইয়া গেছে? কেমন করিয়া বুঝিব অদ্য যে ঐতিহাসিক সত্য ধ্রুব বলিয়া জানিব কল্য নূতনাবিষ্কৃত দলিলের জোরে তাহাকে ঐতিহাসিক সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে না? অদ্যকার প্রচলিত ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া যিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিবেন কল্যকার নূতন ইতিহাসবেত্তা তাঁহাকে নিন্দা করিলে কী বলিব?

প্রতিবাদী বলিবেন, সেইজন্যই বলি, উপন্যাস যত ইচ্ছা লেখো, কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়ো না। এমন কথা আজিও এ দেশে কেহ তোলেন নাই বটে, কিন্তু ইংরাজি সাহিত্যে এ আভাস সম্প্রতি পাওয়া গেছে। সার ফ্রান্সিস প্যাল্‌গ্রেভ বলেন, ঐতিহাসিক উপন্যাস যেমন এক দিকে ইতিহাসের শত্রু তেমনি অন্য দিকে গল্পেরও মস্ত রিপু। অর্থাৎ উপন্যাসলেখক গল্পের খাতিরে ইতিহাসকে আঘাত করেন, আবার সেই আহত ইতিহাস তাঁহার গল্পকেই নষ্ট করিয়া দেয়; ইহাতে গল্প-বেচারার শ্বশুরকুল পিতৃকুল দুই কুলই মাটি।

এমন বিপদ সত্ত্বেও কেন ঐতিহাসিক কাব্য-উপন্যাস সাহিত্যে স্থান পায়? আমরা তাহার যে কারণ মনে জানি সেটা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করি।

আমাদের অলংকারশাস্ত্রে রসাত্মক বাক্য বলিয়া কাব্যের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক সংজ্ঞা আর কোথাও দেখি নাই। অবশ্য, রস কাহাকে বলে সে আর বুঝাইবার জো নাই। যে-কোনো ব্যক্তির আস্বাদনশক্তি আছে রস শব্দের ব্যাখ্যা তাহার নিকট অনাবশ্যক; যাহার ওই শক্তি নাই তাহার এ-সমস্ত কথা জানিবার কোনো প্রয়োজনই নাই।

আমাদের অলংকারে নয়টি মূলরসের নামোল্লেখ আছে। কিন্তু অনেক-গুলি অনির্বচনীয় মিশ্ররস আছে, অলংকারশাস্ত্রে তাহার নামকরণের চেষ্টা হয় নাই।

সেই-সমস্ত অনির্দিষ্ট রসের মধ্যে একটিকে ঐতিহাসিক রস নাম দেওয়া যাইতে পারে। এই রস মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ।

ব্যক্তিবিশেষের সুখদুঃখ তাহার নিজের পক্ষে কম নহে, জগতের বড়ো বড়ো ঘটনা তাহার নিকট ছায়ায় পড়িয়া যায়। এইরূপ ব্যক্তি-বিশেষের অথবা গুটিকতক জীবনের উত্থানপতন ঘাতপ্রতিঘাত উপন্যাসে তেমন করিয়া বর্ণিত হইলে রসের তীব্রতা বাড়িয়া উঠে; এই রসাবেশ

আমাদিগকে অত্যন্ত নিকটে আসিয়া আক্রমণ করে। আমাদের অধিকাংশেরই সুখদুঃখের পরিধি সীমাবদ্ধ; আমাদের জীবনের তরঙ্গক্ষোভ কয়েকজন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের মধ্যেই অবসান হয়। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র-সূর্যমুখী-কুন্দনন্দিনীর বিপদ্‌সম্পদ্ হর্ষবিষাদ আমরা আপনার করিয়া বুঝিতে পারি; কারণ, সে-সমস্ত সুখদুঃখের কেন্দ্রস্থল নগেন্দ্রের পরিবারমণ্ডলী। নগেন্দ্রকে আমাদের নিকটপ্রতিবেশী বলিয়া মনে করিতে কিছুই বাধে না।

কিন্তু পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক লোকের অভ্যুদয় হয় যাঁহাদের সুখদুঃখ জগতের বৃহৎব্যাপারের সহিত বদ্ধ। রাজ্যের উত্থানপতন, মহাকালের সুদূর কার্যপরম্পরা, যে সমুদ্রগর্জনের সহিত উঠিতেছে পড়িতেছে সেই মহান্ কলসংগীতের সুরে তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিরাগ-অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে থাকে। তাঁহাদের কাহিনী যখন গীত হইতে থাকে তখন রুদ্রবীণার একটা তারে মূলরাগিণী বাজে এবং বাদকের অবশিষ্ট চার আঙুল পশ্চাতের সরু মোটা সমস্ত তারগুলিতে অবিশ্রাম একটা বিচিত্রগম্ভীর, একটা সুদূরবিস্তৃত ঝংকার জাগ্রত করিয়া রাখে।

এই-যে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে কালের গতি ইহা আমাদের প্রতিদিনের প্রত্যক্ষগোচর নহে। যদি বা তেমন কোনো জাতীয় ইতিহাস -স্রষ্টা মহাপুরুষ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকেন তথাপি কোনো খণ্ড ক্ষুদ্র বর্তমান কালে তিনি এবং সেই বৃহৎ ইতিহাস একসঙ্গে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। অতএব সুযোগ হইলেও এমন-সকল ব্যক্তিকে আমরা কখনো ঠিকমত তাঁহাদের যথার্থ প্রতিষ্ঠাভূমিতে উপযুক্তভাবে দেখিতে পাই না। তাঁহাদিগকে কেবল ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া নহে, পরন্তু মহাকালের অঙ্গস্বরূপ দেখিতে হইলে, দূরে দাঁড়াইতে হয়, অতীতের মধ্যে তাঁহাদিগকে স্থাপন করিতে হয়, তাঁহারা যে সুবৃহৎ রঙ্গভূমিতে নায়কস্বরূপ ছিলেন সেটা-সুদ্ধ তাঁহাদিগকে এক করিয়া দেখিতে হয়।

এই-যে আমাদের প্রতিদিনের সাধারণ সুখদুঃখ হইতে দূরত্ব— আমরা

যখন চাকরি করিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া খাইয়া-দাইয়া কাল কাটাইতেছি তখন-যে জগতের রাজপথ দিয়া বড়ো বড়ো সারথিরা কালরথ চালনা করিয়া লইয়া চলিতেছেন, ইহাই অকস্মাৎ ক্ষণকালের জন্য উপলব্ধি করিয়া ক্ষুদ্র পরিধি হইতে মুক্তিলাভ— ইহাই ইতিহাসের প্রকৃত রসস্বাদ।

এরূপ ব্যাপার আগাগোড়া কল্পনা হইতে সৃজন করা যায় না যে তাহা নহে। কিন্তু যাহা স্বভাবতই আমাদের হইতে দূরস্থ, যাহা আমাদের অভিজ্ঞতার বহির্বর্তী, তাহাকে কোনো একটা ছুতায় খানিকটা প্রকৃত ঘটনার সহিত বাঁধিয়া দিতে পারিলে পাঠকের প্রত্যয়-উৎপাদন লেখকের পক্ষে সহজ হয়। রসের সৃজনটাই উদ্দেশ্য, অতএব সেজন্য ঐতিহাসিক উপকরণ যে পরিমাণে যতটুকু সাহায্য করে সে পরিমাণে ততটুকু লইতে কবি কুণ্ঠিত হন না।

শেক্‌স্‌পীয়রের 'অ্যাণ্টনি এবং ক্লিয়োপাট্রা' নাটকের যে মূল-ব্যাপারটি তাহা সংসারের প্রাত্যহিক পরীক্ষিত ও পরিচিত সত্য। অনেক অখ্যাত অজ্ঞাত সুযোগ্য লোক কুহকিনীনারীমায়ার জালে আপন ইহকাল-পরকাল বিসর্জন করিয়াছে। এইরূপ ছোটোখাটো মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের শোচনীয় ভগ্নাবশেষে সংসারের পথ পরিকীর্ণ।

আমাদের সুপ্রত্যক্ষ নরনারীর বিষামৃতময় প্রণয়লীলাকে কবি একটি সুবিশাল ঐতিহাসিক রঙ্গভূমির মধ্যে স্থাপিত করিয়া তাহাকে বিরাট করিয়া তুলিয়াছেন। হৃদ্‌বিপ্লবের পশ্চাতে রাষ্ট্রবিপ্লবের মেঘাড়ম্বর, প্রেম-দ্বন্দ্বের সঙ্গে এক বন্ধনের দ্বারা বদ্ধ রোমের প্রচণ্ড আত্মবিচ্ছেদের সমরায়োজন। ক্লিয়োপাট্রার বিলাসকক্ষে বীণা বাজিতেছে, দূরে সমুদ্রতীর হইতে ভৈরবের সংহারশৃঙ্গধ্বনি তাহার সঙ্গে এক সুরে মন্দ্রিত হইয়া উঠিতেছে। আদি এবং করুণ রসের সহিত কবি ঐতিহাসিক রস মিশ্রিত করিতেই তাহা এমন একটি চিত্তবিস্ফারক দূরত্ব ও বৃহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইতিহাসবেত্তা মম্‌সেন পণ্ডিত যদি শেক্‌স্‌পীয়রের এই নাটকের উপরে

প্রমাণের তীক্ষ্ণ আলোক নিক্ষেপ করেন তবে সম্ভবত ইহাতে অনেক কালবিরোধ-দোষ (anachronism), অনেক ঐতিহাসিক ভ্রম বাহির হইতে পারে। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়র পাঠকের মনে যে মোহ উৎপাদন করিয়াছেন, ভ্রান্ত বিকৃত ইতিহাসের দ্বারাও যে-একটি ঐতিহাসিক রসের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসের নূতন তথ্য-আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইবে না।

সেইজন্য আমরা ইতিপূর্বে কোনো-একটি সমালোচনায় লিখিয়াছিলাম, 'ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোনো খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস -উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে-ধনে-হলুদ-সর্ষে সন্ধান করেন। মশলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন তিনি দিন, যিনি বাঁটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া থাকেন তাঁহার সঙ্গেও আমার কোনো বিবাদ নাই ; কারণ, স্বাদই এ স্থলে লক্ষ্য, মশলা উপলক্ষমাত্র।'

অর্থাৎ লেখক ইতিহাসকে অখণ্ড রাখিয়াই চলুন আর খণ্ড করিয়াই রাখুন, সেই ঐতিহাসিক রসের অবতারণায় সফল হইলেই হইল।

তাই বলিয়া কি রামচন্দ্রকে পামর এবং রাবণকে সাধুরূপে চিত্রিত করিলে অপরাধ নাই ? অপরাধ আছে। কিন্তু তাহা ইতিহাসের বিরুদ্ধে অপরাধ নহে, কাব্যেরই বিরুদ্ধে অপরাধ। সর্বজনবিদিত সত্যকে একেবারে উন্টা করিয়া দাঁড় করাইলে রসভঙ্গ হয়, হঠাৎ পাঠকদের যেন একেবারে মাথায় বাড়ি পড়ে। সেই একটা দমকাতেই কাব্য একেবারে কাত হইয়া ডুবিয়া যায়।

এমন-কি যদি কোনো ঐতিহাসিক মিথ্যাও সর্বসাধারণের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া বরাবর চলিয়া আসে, ইতিহাস এবং সত্যের পক্ষ লইয়া

কাব্য তাহার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিলে দোষের হইতে পারে। মনে করো আজ যদি নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে সুরাসক্ত অনাচারী যদুবংশ গ্রীক-জাতীয় এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বাধীন বনবিহারী বংশীবাদক গ্রীসীয় রাখাল, যদি জানা যায় যে তাঁহার বর্ণ জ্যেষ্ঠ বলদেবের বর্ণের ন্যায় শুভ্র ছিল, যদি স্থির হয় নির্বাসিত অর্জুন এশিয়া-মাইনরের কোনো গ্রীক রাজ্য হইতে যুনানী রাজকন্যা সুভদ্রাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং দ্বারকা সমুদ্রতীরবর্তী কোনো গ্রীক উপদ্বীপ, যদি প্রমাণ হয় নির্বাসনকালে পাণ্ডবগণ বিশেষ রণবিজ্ঞানবেত্তা প্রতিভাশালী গ্রীসীয় বীর কৃষ্ণের সহায়তা লাভ করিয়া স্বরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহার অপূর্ব বিজাতীয় রাজনীতি যুদ্ধনৈপুণ্য এবং কর্মপ্রধান ধর্মতত্ত্ব বিস্মিত ভারতবর্ষে তাঁহাকে অবতাররূপে দাঁড় করাইয়াছে— তথাপি বেদব্যাসের মহাভারত বিলুপ্ত হইবে না এবং কোনো নবীন কবি সাহসপূর্বক কালাকে গোরা করিতে পারিবেন না।

আমাদের এইগুলি সাধারণ কথা। নবীনবাবু ও বঙ্কিমবাবু তাঁহাদের কাব্যে এবং উপন্যাসে প্রচলিত ইতিহাসের বিরুদ্ধে এতদূর গিয়াছেন কি না যাহাতে কাব্যরস নষ্ট হইয়াছে তাহা তাঁহাদের গ্রন্থের বিশেষ সমালোচনা-স্থলে বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে কর্তব্য কী? ইতিহাস পড়িব না আইভ্যান্‌হো পড়িব? ইহার উত্তর অতি সহজ। দুইই পড়ো। সত্যের জন্য ইতিহাস পড়ো, আনন্দের জন্য আইভ্যান্‌হো পড়ো। পাছে ভুল শিখি এই সতর্কতায় কাব্যরস হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিলে স্বভাবটা শুকাইয়া শীর্ণ হইয়া যায়।

কাব্যে যদি ভুল শিখি ইতিহাসে তাহা সংশোধন করিয়া লইব। কিন্তু যে ব্যক্তি ইতিহাস পড়িবার সুযোগ পাইবে না, কাব্যই পড়িবে, সে হতভাগ্য। কিন্তু যে ব্যক্তি কাব্য পড়িবার অবসর পাইবে না, ইতিহাস পড়িবে, সম্ভবত তাহার ভাগ্য আরও মন্দ।

আশ্বিন ১৩০৫

কবিজীবনী

কবি টেনিসনের পুত্র তাঁহার পরলোকগত পিতার চিঠিপত্র ও জীবনী বৃহৎ দুইখণ্ড পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রাচীন কবিদের জীবনের বিস্তৃত বিবরণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তখন জীবনীর শখ লোকের ছিল না; তাহা ছাড়া তখন বড়ো-ছোটো সকল লোকেই এখনকার চেয়ে অপ্রকাশ্যে বাস করিত। চিঠিপত্র, খবরের কাগজ, সভাসমিতি, সাহিত্যের বাদবিরোধ এমন প্রবল ছিল না। সুতরাং প্রতিভাশালী ব্যক্তির জীবন-ব্যাপারকে নানা দিক হইতে প্রতিফলিত দেখিবার সুযোগ তখন ঘটিত না।

অনেক ভ্রমণকারী বড়ো বড়ো নদীর উৎস খুঁজিতে দুর্গম স্থানে গিয়াছে। বড়ো কাব্যনদীর উৎস খুঁজিতেও কৌতূহল হয়। আধুনিক কবির জীবনচরিতে এই কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে পারে এমন আশা মনে জন্মে। মনে হয় আধুনিক সমাজে কবির আর লুকাইবার স্থান নাই; কাব্যস্রোতের উৎপত্তি যে শিখরে সে পর্যন্ত রেলগাড়ি চলিতেছে।

সেই আশা করিয়াই পরমাগ্রহে বৃহৎ দুইখণ্ড বই শেষ করা গেল। কিন্তু কবি কোথায়, কাব্যস্রোত কোন্ গুহা হইতে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা তো খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ইহা টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে, কিন্তু কবির জীবনচরিত নহে। আমরা বুঝিতে পারিলাম না, কবি কবে মানবহৃদয়সমুদ্রের মধ্যে জাল ফেলিয়া এত জ্ঞান ও ভাব আহরণ করিলেন এবং কোথায় বসিয়া বিশ্বসংগীতের সুরগুলি তাঁহার বাঁশিতে অভ্যাস করিয়া লইলেন।

কবি কবিতা যেমন করিয়া রচনা করিয়াছেন জীবন তেমন করিয়া রচনা করেন নাই। তাঁহার জীবন কাব্য নহে; যাঁহারা কর্মবীর তাঁহারা নিজের জীবনকে নিজে সৃজন করেন। কবি যেমন ভাষার বাধার মধ্য

হইতে ছন্দকে গাঁথিয়া তোলেন, যেমন সামান্য ভাবকে অসামান্য সুর এবং ছোটো কথাকে বড়ো অর্থ দিয়া থাকেন, তেমনি কর্মবীরগণ সংসারের কঠিন বাধার মধ্যে নিজের জীবনের ছন্দ নির্মাণ করেন এবং চারি দিকের ক্ষুদ্রতাকে অপূর্ব ক্ষমতাবলে বড়ো করিয়া লন। তাঁহারা হাতের কাছে যে-কিছু সামান্য মাল-মশলা পান তাহা দিয়াই নিজের জীবনকে মহৎ করেন এবং তাহাদিগকেও বৃহৎ করিয়া তোলেন। তাঁহাদের জীবনের কর্মই তাঁহাদের কাব্য, সেইজন্য তাঁহাদের জীবনী মানুষ ফেলিতে পারে না।

কিন্তু কবির জীবন মানুষের কী কাজে লাগিবে? তাহাতে স্থায়ী পদার্থ কী আছে? কবির নামের সঙ্গে বাঁধিয়া তাহাকে উচ্চে টাঙাইয়া রাখিলে, ক্ষুদ্রকে মহতের সিংহাসনে বসাইয়া লজ্জিত করা হয়। জীবন-চরিত মহাপুরুষের এবং কাব্য মহাকবির।

কোনো ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে এবং জীবনের কর্মে উভয়তই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারেন; কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল। তাঁহাদের কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে। দান্তের কাব্যে দান্তের জীবন জড়িত হইয়া আছে, উভয়কে একত্রে পাঠ করিলে জীবন এবং কাব্যের মর্যাদা বেশি করিয়া দেখা যায়।

টেনিসনের জীবন সেরূপ নহে। তাহা সৎলোকের জীবন বটে, কিন্তু তাহা কোনো অংশেই প্রশস্ত বৃহৎ বা বিচিত্রফলশালী নহে। তাহা তাঁহার কাব্যের সহিত সমান ওজন রাখিতে পারে না। বরঞ্চ তাঁহার কাব্যে যে অংশে সংকীর্ণতা আছে, বিশ্বব্যাপকতার অভাব আছে, আধুনিক বিলাতি সভ্যতার দোকান-কারখানার সত্ত গন্ধ কিছু অতিমাত্রায় আছে, জীবনীর মধ্যে সেই অংশের প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়; কিন্তু যে ভাবে তিনি বিরাট— যে ভাবে তিনি মানুষের সহিত মানুষকে, সৃষ্টির সহিত সৃষ্টিকর্তাকে একটি উদার সংগীতরাজ্যে সমগ্র করিয়া দেখাইয়াছেন, তাঁহার সেই বৃহৎ

ভাবটি জীবনীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে নাই।

আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনো কবির জীবনচরিত নাই। আমি সেজন্য চিরকৌতূহলী, কিন্তু দুঃখিত নহি। বাল্মীকি সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে তাহাকে ইতিহাস বলিয়া কেহই গণ্য করিবেন না। কিন্তু আমাদের মতে তাহাই কবির প্রকৃত ইতিবৃত্ত। বাল্মীকির পাঠকগণ বাল্মীকির কাব্য হইতে যে জীবনচরিত সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন তাহা বাল্মীকির প্রকৃত জীবনের অপেক্ষা অধিক সত্য। কোন্ আঘাতে বাল্মীকির হৃদয় ভেদ করিয়া কাব্য-উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল? করুণার আঘাতে। রামায়ণ করুণার অশ্রুনির্ঝর। ক্রৌঞ্চবিরহীর শোকার্ত ক্রন্দন রামায়ণ-কথার মর্মস্থলে ধ্বনিত হইতেছে। রাবণও ব্যাধের মতো প্রেমিকযুগলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে; লঙ্কাকাণ্ডের যুদ্ধব্যাপার উন্মত্ত বিরহীর পাখার ঝট্‌পটি। রাবণ যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিল মৃত্যুবিচ্ছেদের অপেক্ষাও তাহা ভয়ানক। মিলনের পরেও এ বিচ্ছেদের প্রতিকার হইল না।

সুখের আয়োজনটি কেমন সুন্দর হইয়া আসিয়াছিল! পিতার স্নেহ, প্রজাদের প্রীতি, ভ্রাতার প্রণয়, তাহারই মাঝখানে ছিল নবপরিণীত রামসীতার যুগলমিলন। যৌবরাজ্যের অভিষেক এই সুখসম্ভোগকে সম্পূর্ণ এবং মহীয়ান করিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছিল। ঠিক এমন সময়েই ব্যাধ শর লক্ষ করিল, সেই শর বিদ্ধ হইল সীতাহরণকালে। তাহার পরে শেষ পর্যন্ত বিরহের আর অন্ত রহিল না। দাম্পত্যসুখের নিবিড়তম আরম্ভের সময়েই দাম্পত্যসুখের দারুণতম অবসান।

ক্রৌঞ্চমিথুনের গল্পটি রামায়ণের মূল ভাবটির সংক্ষিপ্ত রূপক। স্থূল কথা এই, লোকে এই সত্যটুকু নিঃসন্দেহ আবিষ্কার করিয়াছে যে, মহাকবির নির্মল অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃপ্রবাহ করুণার উত্তাপেই বিগলিত হইয়া স্যন্দমান হইয়াছে, অকালে দাম্পত্যপ্রেমের চিরবিচ্ছেদ-ঘটনই ঋষির করুণার্দ্র কবিত্বকে উন্মথিত করিয়াছে।

আবার আর-একটি গল্প আছে, রত্নাকরের কাহিনী। সে আর-এক ভাবের কথা। রামায়ণের কাব্যপ্রকৃতির আর-এক দিকের সমালোচনা। এই গল্প রামায়ণের রামচরিত্রের প্রতি লক্ষ করিয়াছে। এই গল্পে বলিতেছে, রামসীতার বিচ্ছেদদুঃখের অপরিসীম করুণাই যে রামায়ণের প্রধান অবলম্বন তাহা নহে, রামচরিত্রের প্রতি ভক্তিই ইহার মূল। দস্যুকে কবি করিয়া তুলিয়াছে রামের এমন চরিত্র, ভক্তির এমন প্রবলতা! রামায়ণের রাম যে ভারতবর্ষের চক্ষে কতবড়ো হইয়া দেখা দিয়াছেন এই গল্পে যেন তাহা মাপিয়া দিতেছে।

এই দুটি গল্পেই বলিতেছে, প্রতিদিনের কথাবার্তা চিঠিপত্র দেখাসাক্ষাৎ কাজকর্ম শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে কবিত্বের মূল নাই ; তাহার মূলে একটি বৃহৎ আবেগের সঞ্চার, যেন একটি আকস্মিক অলৌকিক আবির্ভাবের মতো— তাহা কবির আয়ত্তের অতীত। কবিকঙ্কণ যে কাব্য লিখিয়াছিলেন তাহাও স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া, দেবীর প্রভাবে।

কালিদাসের সম্বন্ধে যে গল্প আছে তাহাও এইরূপ। তিনি মূর্খ অরসিক ও বিদুষী স্ত্রীর পরিহাসভাজন ছিলেন। অকস্মাৎ দৈবপ্রভাবে তিনি কবিত্বরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। বাল্মীকি নিষ্ঠুর দস্যু ছিলেন এবং কালিদাস অরসিক মূর্খ ছিলেন, এই উভয়ের একই তাৎপর্য। বাল্মীকির রচনায় দয়াপূর্ণ পবিত্রতা এবং কালিদাসের রচনায় রসপূর্ণ বৈদগ্ধ্যের অদ্ভুত অলৌকিকতা প্রকাশ করিবার জন্য ইহা চেষ্টামাত্র।

এই গল্পগুলি জনগণ কবির জীবন হইতে সংগ্রহ করে নাই, তাঁহার কাব্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছে। কবির জীবন হইতে যে-সকল তথ্য পাওয়া যাইতে পারিত কবির কাব্যের সহিত তাহার কোনো গভীর ও চিরস্থায়ী যোগ থাকিত না। বাল্মীকির প্রাত্যহিক কথাবার্তা-কাজকর্ম কখনোই তাঁহার রামায়ণের সহিত তুলনীয় হইতে পারিত না। কারণ, সেই-সকল ব্যাপার সাময়িক, অনিত্য ; রামায়ণ তাঁহার অন্তর্গত নিত্য-

প্রকৃতির— সমগ্র প্রকৃতির— সৃষ্টি, তাহা একটি অনির্বচনীয় অপরিমেয় শক্তির বিকাশ, তাহা অন্যান্য কাজকর্মের মতো ক্ষণিকবিক্ষোভজনিত নহে।

টেনিসনের কাব্যগত জীবনচরিত একটি লেখা যাইতে পারে— বাস্তব-জীবনের পক্ষে তাহা অমূলক, কিন্তু কাব্যজীবনের পক্ষে তাহা সমূলক। কল্পনার সাহায্য ব্যতীত তাহাকে সত্য করা যাইতে পারে না। তাহাতে লেডি শ্যালট ও রাজা আর্থরের কালের সহিত ভিক্টোরিয়ার কালের অদ্ভুতরকম মিশ্রণ থাকিবে; তাহাতে মার্লিনের জাদু এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কার একত্র হইবে। বর্তমান যুগ বিমাতার ন্যায় তাঁহাকে বাল্যকালে কল্পনারণ্যে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছিল— সেখানে প্রাচীনকালের ভগ্নদুর্গের মধ্যে একাকী বাস করিয়া কেমন করিয়া আলাদিনের প্রদীপটি পাইয়াছিলেন, কেমন করিয়া রাজকন্যার সহিত তাঁহার মিলন হইল, কেমন করিয়া প্রাচীনকালের ধনসম্পদ বহন করিয়া তিনি বর্তমান কালের মধ্যে রাজবেশে বাহির হইলেন, সেই সুদীর্ঘ আখ্যায়িকা লেখা হয় নাই। যদি হইত তবে একজনের সহিত আর-একজনের লেখার ঐক্য থাকিত না, টেনিসনের জীবন ভিন্ন ভিন্ন কালে ও ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখে নূতন নূতন রূপ ধারণ করিত।

আষাঢ় ১৩০৮

কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট

বুদ্ধিগম্য বিষয় বুঝিতে না পারিলে লোকে লজ্জিত হয়। হয় বুঝিয়াছি বলিয়া ভান করে, নাহয় বুঝিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পায়। কিন্তু ভাবগম্য সাহিত্য বুঝিতে না পারিলে অধিকাংশ লোক সাহিত্যকেই দোষী করে। কবিতা বুঝিতে না পারিলে কবির প্রতিই লোকের অশ্রদ্ধা জন্মে, তাহাতে আত্মাভিমান কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। ইহা অধিকাংশ লোকে মনে করে না যে, যেমন গভীর তত্ত্ব আছে তেমনি গভীর ভাবও আছে। সকলে সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারে না, সকলে সকল ভাবও বুঝিতে পারে না। ইহাতে প্রমাণ হয়, লোকের যেমন বুদ্ধির তারতম্য আছে তেমনি ভাবুকতারও তারতম্য আছে।

মুশকিল এই যে, তত্ত্ব অনেক করিয়া বুঝাইলে কোনো ক্ষতি হয় না, কিন্তু সাহিত্যে যতটুকু নিতান্ত আবশ্যক তাহার বেশি বলিবার যো নাই। তত্ত্ব আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে, নহিলে সে বিফল; সাহিত্যকে বুঝিয়া লইতে হইবে, নিজের টীকা নিজে করিতে গেলে সে ব্যর্থ। তুমি যদি বুঝিতে না পারো তো তুমি চলিয়া যাও, তোমার পরবর্তী পথিক আসিয়া হয়তো বুঝিতে পারিবে; দৈবাৎ যদি সমজদারের চক্ষে না পড়িল, তবে অজ্ঞাতসারে ফুলের মতো ফুটিয়া হয়তো ঝরিয়া যাইবে; কিন্তু তাই বলিয়া বড়ো অক্ষরের বিজ্ঞাপনের দ্বারা লোককে আহ্বান করিবে না এবং গায়ে পড়িয়া ভাষ্যদ্বারা আপনার ব্যাখ্যা করিবে না।

একটা হাসির কথা বলিলাম, তুমি যদি না হাসো তবে তৎক্ষণাৎ হার মানিতে হয়, দীর্ঘ ব্যাখ্যা করিয়া হাস্য প্রমাণ করিতে পারি না। করুণ উক্তি শুনিয়া যদি না কাঁদো তবে গলা টিপিয়া ধরিয়া কাঁদাইতে হয়, আর কোনো উপায় নাই। কপালকুণ্ডলার শেষ পর্যন্ত শুনিয়া তবু যদি ছেলেমানুষের মতো জিজ্ঞাসা কর 'তার পরে' তবে দামোদর বাবুর নিকটে

তোমাকে জিম্মা করিয়া দিয়া হাল ছাড়িয়া দিতে হয়। সাহিত্য এইরূপ নিতান্ত নাচার। তাহার নিজের মধ্যে নিজের আনন্দ যদি না থাকিত, যদি কেবলই তাহাকে পথিকের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইত তবে অধিকাংশ স্থলে সে মারা পড়িত।

জ্ঞানদাস গাহিতেছেন : হাসি-মিশা বাঁশি বায়। হাসির সহিত মিশিয়া বাঁশি বাজিতেছে। ইহার অর্থ করা যায় না বলিয়াই ইহার মধ্যে গভীর সৌন্দর্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। বাঁশির স্বরের সহিত হাসি মিশিতে পারে এমন যুক্তিহীন কথা কে বলিতে পারে? বাঁশির স্বরের মধ্যে হাসিটুকুর অপূর্ব আস্বাদ যে পাইয়াছে সেই পারে। ফুলের মধ্যে মধুর সন্ধান মধুকরই পাইয়াছে ; কিন্তু বাছুর আসিয়া তাহার দীর্ঘ জিহ্বা বিস্তার করিয়া সমগ্র ফুলটা, তাহার পাপড়ি, তাহার বৃন্ত, তাহার আশপাশের গোটা-পাঁচ-ছয়-পাতা-সুদ্ধ মুখের মধ্যে নাড়িয়া-চাড়িয়া চিবাইয়া গলাধঃকরণ করে এবং সানন্দমনে হাম্বারব করিতে থাকে— তখন তাহাকে তর্ক করিয়া মধুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া দেয় এমন কে আছে?

কাব্যে অনেক সময়ে দেখা যায় ভাষা ভাবকে ব্যক্ত করিতে পারে না, কেবল লক্ষ করিয়া নির্দেশ করিয়া দিবার চেষ্টা করে। সে স্থলে সেই অনতিব্যক্ত ভাষাই একমাত্র ভাষা। এইপ্রকার ভাষাকে কেহ বলেন 'ধুঁয়া', কেহ বলেন 'ছায়া', কেহ বলেন 'ভাঙা ভাঙা' এবং কিছুদিন হইল নবজীবনের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদকমহাশয় কিঞ্চিৎ হাস্যরসাবতারণার চেষ্টা করিতে গিয়া তাহাকে 'কাব্যি' নাম দিয়াছেন। ইহাতে কবি অথবা নবজীবনের সম্পাদক কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। উভয়েরই অদৃষ্টের দোষ বলিতে হইবে।

ভবভূতি লিখিয়াছেন : স তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়োজনঃ। সে তাহার কী-জানি-কী যে যাহার প্রিয়জন! যদি কেবলমাত্র ভাষার দিক দিয়া দেখ, তবে ইহা ধুঁয়া নয়তো কী, ছায়া নয়তো কী! ইহা কেবল অস্পষ্টতা, কুয়াশা। ইহাতে কিছুই বলা হয় নাই। কিন্তু ভাবের দিক দিয়া

দেখিবার ক্ষমতা যদি থাকে তো দেখিবে ভাবের অস্পষ্টতা নাই। তুমি যদি বলিতে 'প্রিয়জন অত্যন্ত আনন্দের সামগ্রী' তবে ভাষা স্পষ্ট হইত সন্দেহ নাই, তবে ইহাকে ছায়া অথবা ধুঁয়া অথবা কাব্যি বলিবার সম্ভাবনা থাকিত না, কিন্তু ভাব এত স্পষ্ট হইত না। ভাবের আবেগে ভাষায় একপ্রকার বিহ্বলতা জন্মে। ইহা সহজ সত্য, কাব্যে তাহার ব্যতিক্রম হইলে কাব্যের ব্যাঘাত হয়।

সীতার স্পর্শসুখে-আকুল রাম বলিয়াছেন: সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা! কী জানি ইহা সুখ না দুঃখ! এমন ছায়ার মতো, ধুঁয়ার মতো কথা কহিবার তাৎপর্য কী? যাহা হয় একটা স্পষ্ট করিয়া বলিলেই হইত। স্পষ্ট কথা অধিকাংশ স্থলে অত্যাবশ্যক ইহা নবজীবন-সম্পাদকের সহিত এক বাক্যে স্বীকার করিতে হয়, তথাপি এ স্থলে আমরা স্পষ্ট কথা শুনিতে চাহি না। যদি কেবল রথচক্র আঁকিতে চাও তবে তাহার প্রত্যেক অর স্পষ্ট আঁকিয়া দিতে হইবে, কিন্তু যখন তাহার ঘূর্ণগতি আঁকিতে হইবে, তাহার বেগ আঁকিতে হইবে, তখন অরগুলিকে ধুঁয়ার মতো করিয়া দিতে হইবে— ইহার অন্য উপায় নাই। সে সময়ে যদি হঠাৎ আবদার করিয়া বস আমি ধুঁয়া দেখিতে চাহি না, আমি অরগুলিকে স্পষ্ট দেখিতে চাই, তবে চিত্রকরকে হার মানিতে হয়। ভবভূতি ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের আবেগ প্রকাশ করিতে গিয়াই বলিয়াছেন 'সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা'। নহিলে স্পষ্ট কথায় সুখকে সুখ বলাই ভালো তাহার আর সন্দেহ নাই।

বলরামদাস লিখিয়াছেন—

আধ চরণে আধ চলনি,
আধ মধুর হাস!

ইহাতে যে কেবল ভাষার অস্পষ্টতা তাহা নহে, অর্থের দোষ। 'আধ চরণ' অর্থ কী? কেবল পায়ের আধখানা অংশ? বাকি আধখানা না চলিলে সে আধখানা চলে কী উপায়ে! একে তো আধখানি চলনি, আধখানি

হাসি, তাহাতে আবার আধখানা চরণ! এগুলো পুরা করিয়া না দিলে এ কবিতা হয়তো অনেকের কাছে অসম্পূর্ণ ঠেকিতে পারে। কিন্তু যে যা বলে বলুক, উপরি-উদ্‌ধৃত দুটি পদে পরিবর্তন চলে না। 'আধ চরণে আধ চলনি' বলিলে ভাবুকের মনে যে একপ্রকার চলন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, ভাষা ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিলে সেরূপ সম্ভবে না।

অত্যন্ত স্পষ্ট কবিতা নহিলে যাঁহারা বুঝিতে পারেন না তাঁহারা স্পষ্ট কবিতার একটি নমুনা দিয়াছেন। তাঁহাদের ভূমিকা-সমেত উদ্‌ধৃত করি। 'বাঙ্গলার মঙ্গল-কাব্যগুলিও জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা। কবিকঙ্কণের দারিদ্র্য-দুঃখ-বর্ণনা— যে কখনো দুঃখের মুখ দেখে নাই তাহাকেও দীনহীনের কষ্টের কথা বুঝাইয়া দেয়।

দুঃখ করো অবধান, দুঃখ করো অবধান।
আমানি খাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান।'

এই দুইটি পদের ভাষ্য করিয়া লেখক বলিয়াছেন, 'ইহাই সার্থক কবিত্ব; সার্থক কল্পনা; সার্থক প্রতিভা।' পড়িয়া সহসা মনে হয় এ কথাগুলি হয় গোঁড়ামি, নাহয় তর্কের মুখে অত্যুক্তি। আমানি খাবার গর্ত দেখাইয়া দারিদ্র্য সপ্রমাণ করার মধ্যে কতকটা নাট্যনৈপুণ্য থাকিতেও পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে কাব্যরস কোথায়? দুটো ছত্র, কবিত্বে সিক্ত হইয়া উঠে নাই; ইহার মধ্যে অনেকখানি আমানি আছে, কিন্তু কবির অশ্রুজল নাই। ইহাই যদি সার্থক কবিত্ব হয় তবে 'তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে' সে তো আরো কবিত্ব। ইহার ব্যাখ্যা এবং ভাষ্য করিতে গেলে হয়তো ভাষ্যকারের করুণরস উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিতেও পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সকলেই স্বীকার করিবেন ইহা কাব্যও নহে, কাব্যিও নহে, যাঁহার নামকরণের ক্ষমতা আছে তিনি ইহার আর-কোনো নাম দিন। যিনি ভঙ্গী করিয়া কথা কহেন তিনি নাহয় ইহাকে কাব্যি বলুন, শুনিয়া দৈবাৎ কাহারও হাসি পাইতেও পারে।

প্রকৃতির নিয়ম-অনুসারে কবিতা কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট, সম্পাদক এবং সমালোচকেরা তাহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত এবং আন্দোলন করিলেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার যো নাই। চিত্রেও যেমন কাব্যেও তেমনি— দূর অস্পষ্ট, নিকট স্পষ্ট; বেগ অস্পষ্ট, অচলতা স্পষ্ট; মিশ্রণ অস্পষ্ট, স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। আগাগোড়া সমস্তই স্পষ্ট, সমস্তই পরিষ্কার, সে কেবল ব্যাকরণের নিয়মের মধ্যে থাকিতে পারে; কিন্তু প্রকৃতিতেও নাই, কাব্যেও নাই। অতএব ভাবুকেরা স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট লইয়া বিবাদ করেন না, তাঁহারা কাব্যরসের প্রতি মনোযোগ করেন। 'আমানি খাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান' ইহা স্পষ্ট বটে, কিন্তু কাব্য নহে। কিন্তু বিদ্যাপতির—

সখি, এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর

স্পষ্টও বটে কাব্যও বটে। ইহা কেবল বর্ণনা বা কথার কথা মাত্র নহে, কেবল একটুকু পরিষ্কার উক্তি নহে, ইহার মধ্য হইতে গোপনে বিরহিণীর নিশ্বাস নিশ্বসিত হইয়া আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতেছে।—

শিশুকাল হৈতে বঁধুর সহিতে
পরানে পরানে লেহা

ইহা শুনিবামাত্র হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে, স্পষ্ট কথা বলিয়া যে তাহা নহে, কাব্য বলিয়া। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ইহাও কি সকলের কাছে স্পষ্ট? এমন কি অনেকে নাই যাঁহারা বলিবেন, 'আচ্ছা বুঝিলাম, ভরা বাদল, ভাদ্র মাস এবং শূন্য গৃহ, কিন্তু ইহাতে কবিতা কোথায়? ইহাতে হইল কী?' ইহাকে আরও স্পষ্ট না করিলে হয়তো অনেক সমালোচকের 'কর্ণে কেবল ঝীম ঝীম রব' করিবে এবং 'শিরায় শিরায় রীণ্ রীণ্' করিতে থাকিবে। ইহাকে ফেনাইয়া ফুলাইয়া তুলিয়া ইহার মধ্যে ধড়্‌ফড়্ ছট্‌ফট্ বিষ ছুরি এবং দড়ি-কলসী না লাগাইলে অনেকের কাছে হয়তো ইহা যথেষ্ট পরিস্ফুট, যথেষ্ট স্পষ্ট হইবে না; হয়তো ধুঁয়া এবং ছায়া এবং

'কাব্যি' বলিয়া ঠেকিবে। এত নিরতিশয় স্পষ্ট যাঁহাদের আবশ্যক তাঁহাদের পক্ষে কেবল পাঁচালি ব্যবস্থা; যাঁহারা কাব্যের সৌরভ ও মধু-উপভোগে অক্ষম তাঁহারা বায়রনের 'জলন্ত' চুল্লিতে হাঁক-ডাক ঝাল-মশলা ও খরতর ভাষার ঘণ্ট পাকাইয়া খাইবেন।

যাঁহারা মনোবৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, যেমন জগৎ আছে তেমনি অতিজগৎ আছে। সেই অতিজগৎ জানা এবং না-জানার মধ্যে, আলোক এবং অন্ধকারের মাঝখানে, বিরাজ করিতেছে। মানব এই জগৎ এবং জগদতীত রাজ্যে বাস করে। তাই তাহার সকল কথা জগতের সঙ্গে মেলে না। এইজন্য মানবের মুখ হইতে এমন অনেক কথা বাহির হয় যাহা আলোকে অন্ধকারে মিশ্রিত; যাহা বুঝা যায় না, অথচ বুঝা যায়। যাহাকে ছায়ার মতো অনুভব করি, অথচ প্রত্যক্ষের অপেক্ষা অধিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। সেই সর্বত্রব্যাপী অসীম অতিজগতের রহস্য কাব্যে যখন কোনো কবি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন তখন তাঁহার ভাষা সহজে রহস্যময় হইয়া উঠে। সে স্থলে কেহ বা কেবলই ধুঁয়া এবং ছায়া দেখিয়া ফিরিয়া যায়, কেহ বা অসীমের সমুদ্রবায়ু সেবন করিয়া অপার আনন্দ লাভ করে।

পুনর্বার বলিতেছি, বুদ্ধিমানের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ন্যায় প্রকৃতিতে যে সমস্তই স্পষ্ট এবং পরিষ্কার তাহা নহে। সমালোচকেরা যাহাই মনে করুন, প্রকৃতি অতি বৃহৎ, অতি মহৎ, সর্বত্র আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। ইহাতে নিকটের অপেক্ষা দূর, প্রত্যক্ষের অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ, প্রামাণ্যের অপেক্ষা অপ্রামাণ্যই অধিক। অতএব যদি কোনো প্রকৃত কবির কাব্যে ছায়া দেখিতে পাওয়া যায় তবে বুদ্ধিমান সমালোচক যেন ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, তাহা এই অসীম প্রকৃতির সৌন্দর্যময়ী রহস্যচ্ছায়া।

চৈত্র ১২৯৩

সাহিত্যের উদ্দেশ্য

বিষয়ী লোকে বিষয় খুঁজিয়া মরে। লেখা দেখিলেই বলে, বিষয়টা কী? কিন্তু লিখিতে হইলে যে বিষয় চাই-ই এমন কোনো কথা নাই। বিষয় থাকে তো থাক্, না থাকে তো নাই থাক্, সাহিত্যের তাহাতে কিছু আসে যায় না। বিষয় বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রাণ নহে। প্রকৃত সাহিত্যের মধ্য হইতে তাহার উদ্দেশ্যটুকু টানিয়া বাহির করা সহজ নহে। তাহার মর্মটুকু সহজে ধরা দেয় না। মানুষের সর্বাঙ্গে প্রাণের বিকাশ— সেই প্রাণটুকু নাশ করিবার জন্য নানা দেশে নানা অস্ত্র আছে, কিন্তু দেহ হইতে সেই প্রাণটুকু স্বতন্ত্র বাহির করিয়া আয়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য কোনো অস্ত্র বাহির হয় নাই।

আমাদের বঙ্গভাষায় সাহিত্যসমালোচকেরা আজকাল লেখা পাইলেই তাহার উদ্দেশ্য বাহির করিতে চেষ্টা করেন। বোধ করি তাহার প্রধান কারণ এই, একটা উদ্দেশ্য ধরিতে না পারিলে তাঁহাদের লিখিবার তেমন সুবিধা হয় না। যে শিক্ষকের ঝুঁটি ধরিয়া মারা অভ্যাস সহসা ছাত্রের মুণ্ডিত মস্তক তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত শোকের কারণ হয়।

মনে করো তুমি যদি অত্যন্ত বুদ্ধির প্রভাবে বলিয়া বস 'এই তরঙ্গ-ভঙ্গময়, এই চূর্ণ-বিচূর্ণ সূর্যালোকে খচিত, অবিশ্রাম প্রবহমাণ জাহ্নবীর জলটুকু মারিয়া কেবল ইহার বিষয়টুকু বাহির করিব' এবং এই উদ্দেশে প্রবল অধ্যবসায়-সহকারে ঘড়া ঘড়া জল তুলিয়া চুলির উপরে উত্থাপন কর তবে পরিশ্রমের পুরস্কার-স্বরূপ বিপুল বাষ্প ও প্রচুর পঙ্ক লাভ করিবে— কিন্তু কোথায় তরঙ্গ! কোথায় সূর্যালোক! কোথায় কলধ্বনি! কোথায় জাহ্নবীর প্রবাহ!

উদ্দেশ্য হাৎড়াইতে গিয়া কিছু-না-কিছু হাতে উঠেই। যেমন গঙ্গায় তলাইয়া অন্বেষণ করিলে তাহার পঙ্ক হইতে চিংড়িমাছ বাহির হইয়া পড়ে।

ধীবরের পক্ষে সে কিছু কম লাভ নহে, কিন্তু আমার বলিবার তাৎপর্য এই যে চিংড়িমাছ না থাকিলেও গঙ্গার মূলগত কোনো প্রভেদ হয় না। কিন্তু গঙ্গার প্রবাহ নাই, গঙ্গার ছায়ালোকবিচিত্র তরঙ্গমালা নাই, গঙ্গার প্রশান্ত প্রবল উদারতা নাই, এমন যদি হয় তবে গঙ্গাই নাই। কিন্তু প্রবাহ আয়ত্ত করা যায় না, ছিপ ফেলিয়া ছায়ালোক ধরা যায় না, গঙ্গার প্রশান্তভাব কেবল অনুভব করা যায়— কিন্তু কোনো উপায়ে ডাঙায় তোলা যায় না। উপরি-উক্ত চিংড়িমাছ গঙ্গার মধ্যে সহজে অনুভব করা যায় না, কিন্তু সহজেই ধরা যায়। অতএব বিষয়ী সমালোচকের পক্ষে মৎস্য-নাম-ধারী উক্ত কীটবিশেষ সকল হিসাবেই সুবিধাজনক।

(বিশুদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে উদ্দেশ্য বলিয়া যাহা হাতে ঠেকে তাহা আনুষঙ্গিক। এবং তাহাই ক্ষণস্থায়ী। যাহার উদ্দেশ্য আছে তাহার অন্য নাম— কোনো-একটা বিশেষ তত্ত্ব -নির্ণয় বা কোনো-একটা বিশেষ ঘটনা -বর্ণনা যাহার উদ্দেশ্য তাহার লক্ষণ-অনুসারে তাহাকে দর্শন বিজ্ঞান বা ইতিহাস বা আর-কিছু বলিতে পারো। কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য নাই।)

ঐতিহাসিক রচনাকে কখন সাহিত্য বলিব ? যখন জানিব যে তাহার ঐতিহাসিক অংশটুকু অসত্য বলিয়া প্রমাণ হইয়া গেলেও তাহা বাঁচিয়া থাকিতে পারে। অর্থাৎ যখন জানিব ইতিহাস উপলক্ষমাত্র, লক্ষ্য নহে। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি অন্য বিভাগ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না, নির্মাণের উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। ফুল কেন ফোটে তাহা কাহার সাধ্য অনুমান করে, কিন্তু ইটের পাঁজা কেন পোড়ে, সুরকির কল কেন চলে, তাহা সকলেই জানে। সাহিত্য সেইরূপ সৃজনধর্মী ; দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি নির্মাণধর্মী। /সৃষ্টির ন্যায়, সাহিত্যই সাহিত্যের উদ্দেশ্য।

যদি কোনো উদ্দেশ্য নাই তবে সাহিত্যে লাভ কী। যাঁহারা সকলের চেয়ে হিসাব ভালো বুঝেন তাঁহারা এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। উত্তর

দেওয়া সহজ নহে। গোটাকতক সন্দেশ খাইলে যে রসনার তৃপ্তি ও উদরের পূর্তি -সাধন হয় ইহা প্রমাণ করা সহজ, যদি অজ্ঞানবশত কেহ প্রতিবাদ করে তবে তাহার মুখে দুটো সন্দেশ পুরিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মুখ বন্ধ করা যায়। কিন্তু সমুদ্রতীরে থাকিলে যে এক বিশাল আনন্দ অলক্ষ্যে শরীর-মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বাস্থ্যবিধান করে তাহা হাতে হাতে প্রমাণ করা যায় না।

সাহিত্যের প্রভাবে আমরা হৃদয়ের দ্বারা হৃদয়ের যোগ অনুভব করি, হৃদয়ের প্রবাহ রক্ষা হয়, হৃদয়ের সহিত হৃদয় খেলাইতে থাকে, হৃদয়ের জীবন ও স্বাস্থ্য-সঞ্চার হয়। যুক্তিশৃঙ্খলের দ্বারা মানবের বুদ্ধি ও জ্ঞানের ঐক্যবন্ধন হয়, কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধিবার তেমন কৃত্রিম উপায় নাই। সাহিত্য স্বত উৎসারিত হইয়া সেই যোগসাধন করে। সাহিত্য অর্থেই একত্র থাকিবার ভাব— মানবের 'সহিত' থাকিবার ভাব— মানবকে স্পর্শ করা, মানবকে অনুভব করা। সাহিত্যের প্রভাবে হৃদয়ে হৃদয়ে শীতাতপ সঞ্চারিত হয়, বায়ু প্রবাহিত হয়, ঋতুচক্র ফিরে, গন্ধ গান ও রূপের হাট বসিয়া যায়। উদ্দেশ্য না থাকিয়া সাহিত্যে এইরূপ সহস্র উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

বন্ধুতে বন্ধুতে মিলন হইলে আমরা কত বাজে কথাই বলিয়া থাকি। তাহাতে করিয়া হৃদয়ের কেমন বিকাশ হয়! কত হাস্য, কত আলাপ, কত আনন্দ! পরস্পরের নয়নের হর্ষজ্যোতির সহিত মিশিয়া সূর্যালোক কত মধুর বলিয়া মনে হয়! বিষয়ী লোকের পরামর্শমত কেবলই যদি কাজের কথা বলি, সকল কথার মধ্যেই যদি কীটের মতো উদ্দেশ্য ও অর্থ লুকাইয়া থাকে, তবে কোথায় হাস্যকৌতুক, কোথায় প্রেম, কোথায় আনন্দ! তবে চারি দিকে দেখিতে পাইব শুষ্ক দেহ, লম্ব মুখ, শীর্ণ গণ্ড, উচ্চ হনু, হাস্যহীন শুষ্ক ওষ্ঠাধর, কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু— মানবের উপছায়া-সকল পরস্পরের কথার উপরে পড়িয়া খুদিয়া খুদিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া অর্থ ই

বাহির করিতেছে, অথবা পরস্পরের পলিতকেশ মুণ্ড লক্ষ্য করিয়া উদ্দেশ্য-কঠিন কথার লোষ্ট্র বর্ষণ করিতেছে।

(অনেক সাহিত্য এইরূপ হৃদয়মিলন-উপলক্ষে বাজে কথা এবং মুখোমুখি, চাহাচাহি, কোলাকুলি। সাহিত্য এইরূপ বিকাশ এবং স্ফূর্তি মাত্র। আনন্দই তাহার আদি অন্ত মধ্য। আনন্দই তাহার কারণ এবং আনন্দই তাহার উদ্দেশ্য। না বলিলে নয় বলিয়াই বলা ও না হইলে নয় বলিয়াই হওয়া।)

বৈশাখ ১২৯৪

সাহিত্য ও সভ্যতা

বোধ করি সকলেই দেখিয়াছেন, বিলাতি কাগজে আজকাল সাহিত্যরসের বিশেষ অভাব দেখা যায়। আগাগোড়া কেবল রাজনীতি ও সমাজনীতি। মুক্ত বাণিজ্য, জামার দোকান, সুদানের যুদ্ধ, রবিবারে যাদুঘর খোলা থাকা উচিত, ঘুষ দেওয়া সম্বন্ধে নূতন আইন, ডাব্লিন দুর্গ ইত্যাদি। ভালো কবিতা ও সাহিত্য সম্বন্ধে দুই-একটা ভালো প্রবন্ধ শুনিতে পাই বিস্তর টাকা দিয়া কিনিতে হয়। তাহাতে সাহিত্যের আদর প্রমাণ হয় না সাহিত্যের দুর্মূল্যতা প্রমাণ হয় কে জানে! স্পেক্‌টেটর র‍্যাম্‌ব্‌লার প্রভৃতি কাগজের সহিত এখনকার কাগজের তুলনা করিয়া দেখো, তখন কী প্রবল সাহিত্যের নেশাই ছিল! জেফ্রি, ডিকুইন্সি, হ্যাজ্‌লিট, সাদি, লে হাণ্ট, ল্যাম্বের আমলেও পত্র ও পত্রিকায় সাহিত্যের নির্ঝরিণী কী অবাধে প্রবাহিত হইত! কিন্তু আধুনিক ইংরাজি পত্রে সাহিত্যপ্রবাহ রুদ্ধ দেখিতেছি কেন। মনে হইতেছে আগেকার চেয়ে সাহিত্যের মূল্য বাড়িতেছে, কিন্তু চাষ কমিতেছে। ইহার কারণ কী?

আমার বোধ হয়, ইংলণ্ডে কাজের ভিড় কিছু বেশি বাড়িয়াছে। রাজ্য ও সমাজতন্ত্র উত্তরোত্তর জটিল হইয়া পড়িতেছে। এত বর্তমান অভাব-নিরাকরণ এত উপস্থিত সমস্যার মীমাংসা আবশ্যক হইয়াছে, প্রতিদিনের কথা প্রতিদিন এত জমা হইতেছে যে, যাহা নিত্য, যাহা মানবের চিরদিনের কথা, যে-সকল অনন্ত প্রশ্নের মীমাংসার ভার এক যুগ অন্য যুগের হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিয়া যায়, মানবাত্মার যে-সকল গভীর বেদনা এবং গভীর আশার কাহিনী, সে আর উত্থাপিত হইবার অবসর পায় না। চিরনবীন চিরপ্রবীণ প্রকৃতি তাহার নিবিড় রহস্যময় অসীম সৌন্দর্য লইয়া পূর্বের ন্যায় তেমনি ভাবেই চাহিয়া আছে, চারি দিকে সেই শ্যামল তরুপল্লব, কালের চুপিচুপি রহস্যকথার মতো অরণ্যের সেই মর্মরধ্বনি, নদীর সেই

চিরপ্রবাহময় অথচ চির-অবসরপূর্ণ কলগীতি; প্রকৃতির অবিরামনিশ্বসিত বিচিত্র বাণী এখনও নিঃশেষিত হয় নাই; কিন্তু যাহার আপিসের তাড়া পড়িয়াছে, কেরানিগিরির সহস্র খুচরা দায় যাহার শাম্‌লার মধ্যে বাসা বাঁধিয়া কিচিকিচি করিয়া মরিতেছে, সে বলে— 'দূর করো তোমার প্রকৃতির মহত্ত্ব, তোমার সমুদ্র ও আকাশ, তোমার মানবহৃদয়, তোমার মানবহৃদয়ের সহস্রবাহী সুখ দুঃখ ঘৃণা ও প্রীতি, তোমার মহৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ ও গভীর রহস্যপিপাসা, এখন হিসাব ছাড়া আর-কোনো কথা হইতে পারে না।' আমার বোধ হয় কল-কারখানার কোলাহলে ইংরেজেরা বিশ্বের অনন্ত সংগীতধ্বনির প্রতি মনোযোগ দিতে পারিতেছে না; উপস্থিত মুহূর্তগুলো পঙ্গপালের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া অনন্তকালকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।

আমরা আর-একটি প্রবন্ধে[১] লিখিয়াছি—স্থষ্টির সহিত সাহিত্যের তুলনা হয়। এই অসীম সৃষ্টিকার্য অসীম অবসরের মধ্যে নিমগ্ন। চন্দ্রসূর্য গ্রহনক্ষত্র অপার অবসরসমুদ্রের মধ্যে সহস্র কুমুদ কহ্লার পদ্মের মতো ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কার্যের শেষও নাই, অথচ তাড়াও নাই। বসন্তের একটি শুভ প্রভাতের জন্য শুভ্র চামেলি সৃষ্টির কোন্‌ অন্তঃপুরে অপেক্ষা করিয়া আছে, বর্ষার মেঘস্নিগ্ধ আর্দ্র সন্ধ্যার জন্য একটি শুভ্র জুঁই সমস্ত বৎসর তাহার পূর্বজন্ম যাপন করিতেছে। সাহিত্যও সেইরূপ অবসরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। ইহার জন্য অনেকখানি আকাশ, অনেকখানি সূর্যালোক, অনেকখানি শ্যামল ভূমির আবশ্যক। কার্যালয়ের শান-বাঁধানো মেজে খুঁড়িয়া যেমন মাধবীলতা উঠে না তেমনি সাহিত্যও উঠে না।

উত্তরোত্তর ব্যাপমান বিস্তৃত রাজ্যভার, জটিল কর্তব্যশৃঙ্খল, অবিশ্রাম দলাদলি ও রাজনৈতিক কূটতর্ক, বাণিজ্যের জুয়াখেলা, জীবিকাসংগ্রাম,

১ পূর্ববর্তী প্রবন্ধে

রাশীকৃত সম্পদ ও অগাধ দারিদ্র্যের একত্র অবস্থানে সামাজিক সমস্যা— এই-সকল লইয়া ইংরাজ মানবহৃদয় ভারাক্রান্ত। তাহার মধ্যে স্থানও নাই, সময়ও নাই। সাহিত্য সম্বন্ধে যদি কোনো কথা থাকে তো সংক্ষেপে সারো, আরো সংক্ষেপ করো। প্রাচীন সাহিত্য ও বিদেশী সাহিত্যের সার-সংকলন করিয়া পিলের মতো গুলি পাকাইয়া গলার মধ্যে চালান করিয়া দাও। কিন্তু সাহিত্যের সার-সংকলন করা যায় না। ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞানের সার-সংকলন করা যাইতে পারে। মালতীলতাকে হামান্‌দিস্তায় ঘুঁটিয়া তাল পাকাইলে সেই তালটাকে মালতীলতার সার-সংকলন বলা যাইতে পারে না। মালতীলতার হিল্লোল, তাহার বাহুর বন্ধন, তাহার প্রত্যেক শাখা-প্রশাখার ভঙ্গিমা, তাহার পূর্ণযৌবনভার, হামান্‌দিস্তার মধ্যে ঘুঁটিয়া তোলা ইংরাজেরও অসাধ্য।

ইহা প্রায় দেখা যায়, অতিরিক্ত কার্যভার যাহার স্কন্ধে সে কিছু নেশার বশ হয়। যো সো করিয়া একটু অবসর পাইলে উৎকট আমোদ নহিলে তাহার তৃপ্তি হয় না। যেমন উৎকট কাজ তেমনি উৎকট অবসর। কিন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে নেশার তীব্রতা নাই। ভালো সন্দেশে যেমন চিনির আতিশয্য থাকে না তেমনি উন্নত সাহিত্যে প্রচণ্ড বেগ এবং প্রশান্ত মাধুরী থাকে বটে, কিন্তু, উগ্র মাদকতা থাকে না। এইজন্য নিরতিশয় ব্যস্ত লোকের কাছে সাহিত্যের আদর নাই। নেশা চাই। ইংলণ্ডে দেখো খবরের নেশা। সে নেশা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। খবরের জন্য কাড়াকাড়ি তাড়াতাড়ি, যে খবর দুই ঘণ্টা পরে পাইলে কাহারও কোনো ক্ষতি হয় না সেই খবর দুই ঘণ্টা আগে যোগাইবার জন্য ইংলণ্ড্ ধনপ্রাণ অকাতরে বিসর্জন দিতেছে। সমস্ত পৃথিবী ঝাঁটাইয়া প্রতিদিনের খবরের টুকরা ইংলণ্ড্ দ্বারের নিকট স্তূপাকার করিয়া তুলিতেছে। সেই টুকরাগুলো চা দিয়া ভিজাইয়া বিস্কুটের সঙ্গে মিলাইয়া ইংলণ্ডের আবালবৃদ্ধবনিতা প্রতিদিন প্রভাতে এবং প্রদোষে পরমানন্দে

পায় করিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যে কোনো খবর পাওয়া যায় না। কারণ, যে-সকল খবর সকলেই জানে অধিকাংশ সাহিত্য তাহাই লইয়া।

উপস্থিত বিষয় উপস্থিত ঘটনার মধ্যে যেমন নেশা স্থায়ী বিষয়ের মধ্যে তেমন নেশা নাই। গোলদিঘির ধারে মারামারি বা চক্রবর্তীপরিবারের গৃহবিচ্ছেদ যত তুমুল বলিয়া বোধ হয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও এমন মনে হয় না। অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি মহাশয় যখন কালো আল্‌পাকার চাপকান পরিয়া, ছাতা হাতে, ক্যাপ মাথায়, চাঁদার খাতা লইয়া ব্যস্ত হইয়া বেড়ান তখন লোকে মনে করে পৃথিবীর আর-সমস্ত কাজ কর্ম বন্ধ আছে। যখন কোনো আর্য আর-কোনো আর্যকে অনার্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য গলা জাহির করেন ও দল পাকাইয়া তোলেন তখন নস্যরেণু তাম্রকূটধূম এবং আর্য-অভিমানে আচ্ছন্ন হইয়া তিনি এবং তাঁহার দলবল ভুলিয়া যান যে তাঁহাদের চণ্ডিমণ্ডপের বাহিরেও বৃহৎ বিশ্বসংসার ছিল এবং এখনও আছে। ইংলণ্ডে না জানি আরো কী কাণ্ড! সেখানে বিশ্বব্যাপী কারখানা এবং দেশব্যাপী দলাদলি লইয়া না জানি কী মত্ততা! সেখানে যদি বর্তমানই দানবাকার ধারণ করিয়া নিত্যকে গ্রাস করে তাহাতে আর আশ্চর্য কী!

বর্তমানের সহিত অনুরাগভরে সংলগ্ন হইয়া থাকা যে মানুষের স্বভাব এবং কর্তব্য তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। তাই বলিয়া বর্তমানের আতিশয্যে মানবের সমস্তটা চাপা পড়িয়া যাওয়া কিছু নয়। গাছের কিয়দংশ মাটির নীচে থাকা আবশ্যক বলিয়া যে সমস্ত গাছটাকে মাটির নীচে পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। তাহার পক্ষে অনেকখানি ফাঁকা অনেকখানি আকাশ আবশ্যক। যে মাটির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে সেই মাটি ফুঁড়িয়াও মানবকে অনেক ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে, তবেই তাহার মনুষ্যত্বসাধন হইবে। কিন্তু ক্রমাগতই যদি সে ধূলি-চাপা পড়ে, আকাশে উঠিবার যদি সে অবসর না পায়, তবে তাহার কী দশা!

(যেমন বদ্ধ গৃহে থাকিলে মুক্ত বায়ুর আবশ্যক অধিক তেমনি সভ্যতার সহস্র বন্ধনের অবস্থাতেই বিশুদ্ধ সাহিত্যের আবশ্যকতা অধিক হয়। সভ্যতার শাসন-নিয়ম, সভ্যতার কৃত্রিমশৃঙ্খল যতই আঁট হয়— হৃদয়ে হৃদয়ে স্বাধীন মিলন, প্রকৃতির অনন্ত ক্ষেত্রের মধ্যে কিছুকালের জন্য রুদ্ধ হৃদয়ের ছুটি, ততই নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। সাহিত্যই সেই মিলনের স্থান, সেই খেলার গৃহ, সেই শান্তিনিকেতন। সাহিত্যই মানব-হৃদয়ে সেই ধ্রুব অসীমের বিকাশ।) অনেক পণ্ডিত ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রচার করেন যে সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের বিনাশ হইবে। তা যদি হয় তবে সভ্যতারও বিনাশ হইবে। কেবল পাকা রাস্তাই যে মানুষের পক্ষে আবশ্যক তাহা নয়, শ্যামল ক্ষেত্র তাহা অপেক্ষা অধিক আবশ্যক। প্রকৃতির বুকের উপরে পাথর ভাঙিয়া আগাগোড়া সমস্তটাই যদি পাকা রাস্তা করা যায়, কাঁচা কিছুই না থাকে, তবে সভ্যতার অতিশয় বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই অতিবৃদ্ধিতেই তাহার বিনাশ। লণ্ডন শহর অত্যন্ত সভ্য ইহা কে না বলিবে, কিন্তু এই লণ্ডনরূপী সভ্যতা যদি দৈত্য-শিশুর মতো বাড়িতে বাড়িতে সমস্ত দ্বীপটাকে তাহার ইষ্টককঙ্কালের দ্বারা চাপিয়া বসে তবে সেখানে মানব কেমন করিয়া টিকে! মানব তো পণ্ডিত-বিশেষের দ্বারা নির্মিত কল-বিশেষ নহে।

দূর হইতে ইংলণ্ডের সাহিত্য ও সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু বলা হয়তো আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা। এ বিষয়ে অভ্রান্ত বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয় এবং সেরূপ যোগ্যতাও আমার নাই। আমাদের এই রৌদ্রতাপিত নিদ্রাতুর নিস্তব্ধ গৃহের এক প্রান্তে বসিয়া কেমন করিয়া ধারণা করিব সেই সুরাসুরের রণরঙ্গভূমি ইউরোপীয় সমাজের প্রচণ্ড আবেগ, উত্তেজনা, উদ্যম, সহস্রমুখী বাসনার উদ্দাম উচ্ছ্বাস, অবিশ্রাম মথ্যমান ক্ষুব্ধ জীবন-মহাসমুদ্রের আঘাত ও প্রতিঘাত— তরঙ্গ ও প্রতিতরঙ্গ— ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি, উৎক্ষিপ্ত সহস্র হস্তে পৃথিবী বেষ্টন করিবার বিপুল আকাঙ্ক্ষা!

দুই-একটা লক্ষণ মাত্র দেখিয়া, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থার মধ্যে লিপ্ত না থাকিয়া, বাহিরের লোকের মনে সহসা যে কথা উদয় হয় আমি সেই কথা লিখিয়া প্রকাশ করিলাম এবং এই সুযোগে সাহিত্য সম্বন্ধে আমার মত কথঞ্চিৎ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিলাম।

বৈশাখ ১২৯৪

আলস্য ও সাহিত্য

অবসরের মধ্যেই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ সাহিত্যের বিকাশ, কিন্তু তাই বলিয়া আলস্যের মধ্যে নহে। মানবের সহস্র কার্যের মধ্যে সাহিত্যও একটি কার্য। সুকুমার বিকশিত পুষ্প যেমন সমগ্র কঠিন ও বৃহৎ বৃক্ষের নিয়ত শ্রমশীল জীবনের লক্ষণ তেমনি সাহিত্যও মানবসমাজের জীবন স্বাস্থ্য ও উদ্যমেরই পরিচয় দেয়, যেখানে সকল জীবনের অভাব সেখানে যে সাহিত্য জন্মিবে ইহা আশা করা দুরাশা। বৃহৎ বটবৃক্ষ জন্মিতে ফাঁকা জমির আবশ্যক, কিন্তু মরুভূমির আবশ্যক এমন কথা কেহই বলিবে না।

সুশৃঙ্খল অবসর সে তো প্রাণপণ পরিশ্রমের ফল, আর উচ্ছৃঙ্খল জড়ত্ব অলসের অনায়াসলব্ধ অধিকার। উন্নত সাহিত্য, যাহাকে সাহিত্য নাম দেওয়া যাইতে পারে, তাহা উদ্যমপূর্ণ সজীব সভ্যতার সহিত সংলগ্ন স্বাস্থ্যময়, সৌন্দর্যময়, আনন্দময় অবসর। যে পরিমাণে জড়ত্ব সাহিত্য সেই পরিমাণে খর্ব ও সুষমারহিত, সেই পরিমাণে তাহা কল্পনার উদার দৃষ্টি ও হৃদয়ের স্বাধীন গতির প্রতিরোধক। অযত্নে যে সাহিত্য ঘনাইয়া উঠে তাহা জঙ্গলের মতো আমাদের স্বচ্ছ নীলাকাশ, শুভ্র আলোক, বিশুদ্ধ সুগন্ধ সমীরণকে বাধা দিয়া রোগ ও অন্ধকারকে পোষণ করিতে থাকে।

দেখো, আমাদের সমাজে কার্য নাই, আমাদের সমাজে কল্পনাও নাই, আমাদের সমাজে অনুভাবশক্তিও তেমন প্রবল নহে। অথচ একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে,বাঙালিদের অনুভাবশক্তি ও কল্পনাশক্তি সবিশেষ তীব্র। বাঙালিরা যে কাজের লোক এ কথা এপর্যন্ত সাহস করিয়া কেহই বলিতে পারে নাই। কিন্তু বাঙালিরা যে অত্যন্ত কাল্পনিক ও সহৃদয় এ কথার প্রতিবাদ করিতে গেলে বিস্তর অপবাদের ভাগী হইতে হয়।

কাজ যাহারা করে না তাহারা যে কল্পনা করে ও অনুভব করে এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়! সুস্থ কল্পনা ও সরল অনুভাবের গতিই

কাজের দিকে, আশমান ও আলস্যের দিকে নহে। চিত্রকরের কল্পনা তাহাকে ছবি আঁকিতেই প্রবৃত্ত করে; ছবিতেই সে কল্পনা আপনার পরিণাম লাভ করে। আমাদের মানসিক সমুদয় বৃত্তিই নানা আকারে প্রকাশ পাইবার জন্য ব্যাকুল। বাঙালির মন সে নিয়মের বহির্ভূত নহে! যদি এ কথা স্বীকার করা হয় সহজে বাঙালিকে কাজে প্রবৃত্ত করা যায় না, তবে এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে বাঙালির মনোবৃত্তি-সকল দুর্বল।

কল্পনা যাহাদের প্রবল বিশ্বাস তাহাদের প্রবল, বিশ্বাস যাহাদের প্রবল তাহারা আশ্চর্য বলের সহিত কাজ করে। কিন্তু বাঙালি জাতির ন্যায় বিশ্বাসহীন জাতি নাই। ভূত-প্রেত, হাঁচি-টিক্‌টিকি, আধ্যাত্মিক জাতিভেদ ও বিজ্ঞানবহির্ভূত অপূর্ব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-সকলের প্রতি একপ্রকার জীবনহীন জড় বিশ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু মহত্ত্বের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস নাই। আফিস-যানের চক্রচিহ্নিত পথ ছাড়িলে বৃহৎ জগতে আর-কোথাও যে কোনো গন্তব্য পাওয়া যাইবে ইহা কিছুতেই মনে লয় না। বড়ো ভাব ও বড়ো কাজকে যাহারা নীহার ও মরীচিকা বলিয়া মনে করে তাহাদের কল্পনা যে সবিশেষ সজীব তাহার প্রমাণ কী? স্পেন্‌দেশ কলম্বসকে বিশ্বাস করিতে বহু বিলম্ব করিয়াছিল; কিন্তু যদি কোনো সুযোগে, বিধির কোনো বিপাকে, বঙ্গদেশে কোনো কলম্বস জন্মগ্রহণ করিত তবে দালান ও দাওয়ার আর্য দলপতি এবং আফিসের হেড্‌ কেরানিগণ কী কাণ্ডটাই করিত! দুই-চারিজন অনুগ্রহপূর্বক সরলভাবে তাহাকে পাগল ঠাহরাইত এবং অবশিষ্ট সুচতুরবর্গ যাহারা কিছুতেই ঠকে না এবং যাহাদের যুক্তিশক্তি অতিশয় প্রখর, অর্থাৎ যাহারা সর্বদা সজাগ এবং কথায় কথায় চোখ টিপিয়া থাকে, তাহারা বক্রবুদ্ধিতে দুই-চারি প্যাঁচ লাগাইয়া আমাদের কৃষ্ণকায় কলম্বসের সহস্র সংকীর্ণ নিগূঢ় মৎলব আবিষ্কার করিত এবং আপন আফিস ও দর-দালানের স্থানসংকীর্ণতা হেতুই অতিশয় আরাম অনুভব করিত।

বাঙালিরা কাজের লোক নহে, কিন্তু বিষয়ী লোক। অর্থাৎ, তাহারা

সর্বদাই বলিয়া থাকে, 'কাজ কী বাপু!' ভরসা করিয়া তাহারা বুদ্ধিকে ছাড়া দিতে পারে না ; সমস্তই কোলের কাজে জমা করিয়া রাখে এবং যত-সব ক্ষুদ্র কাজে সমস্ত বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া বুদ্ধিকে অত্যন্ত প্রচুর বলিয়া বোধ করে। সুতরাং বড়ো কাজ, মহৎ লক্ষ্য, সুদূর সাধনাকে ইহারা সর্বদা উপহাস অবিশ্বাস ও ভয় করিয়া থাকে। কিন্তু কল্পনাকে এইরূপ সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিবার ফল হয় এই, জগতের বৃহত্ত্ব দেখিতে না পাইয়া আপনাকে বড়ো বলিয়া ভুল হয়। নিরুদ্যম কল্পনা অধিকতর নিরুদ্যম হইয়া মৃতপ্রায় হয়। তাহার আকাঙ্ক্ষার পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং অভিমানস্ফীত হৃদয়ের মধ্যে রুদ্ধ কল্পনা, রুগ্ণ ও রোগের আকর হইয়া বিরাজ করিতে থাকে।

ইহার প্রমাণস্বরূপে দেখো, আমরা আজকাল আপনাকে কতই বড়ো মনে করিতেছি। চতুর্দিকে অষ্টাদশ সংহিতা এবং বিংশতি পুরাণ গাঁথিয়া তুলিয়া তাহার মধ্যে ক্রমাগত অন্ধকার ও অহংকার সঞ্চয় করিতেছি। বহু সহস্র বৎসর পূর্বে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্বজাতিকে পার্শ্ববর্তী কৃষ্ণচর্ম অসভ্য জাতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন বলিয়া, আমরা তাঁহাদের ও তাঁহাদের দাসবর্গের হীনবুদ্ধি ক্ষীণকায় দীনপ্রাণ অজ্ঞান-অধীনতায় অভিভূত সন্ততি ও পোষ্যসন্ততিগণ আপনাকে পবিত্র, আর্য ও সর্বাপেক্ষা মহৎ বলিয়া আস্ফালন করিতেছি এবং প্রভাতের স্ফীতপুচ্ছ ঊর্ধ্বগ্রীব কুক্কুটের ন্যায় সমস্ত জাগ্রত জগতের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলার তারস্বর উত্থাপন করিতেছি! পশ্চিমের বৃহৎ সাহিত্য ও বিচিত্র জ্ঞানের প্রভাবে এক অত্যুন্নত, তেজস্বী, নিয়তগতিশীল, জীবন্ত মানবসমাজের বিদ্যুৎপ্রাণিত স্পর্শ লাভ করিয়াও তাহাদের মহত্ত্ব যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না এবং বিবিধভঙ্গিসহকারে ক্ষীণ তীক্ষ্ণ সানুনাসিক স্বরে তাহাকে ম্লেচ্ছ ও অনুন্নত বলিয়া প্রচার করিতেছি। ইহাতে কেবলমাত্র আমাদের অজ্ঞতার অন্ধ অভিমান প্রকাশ পাইতেছে না, ইহাতে আমাদের কল্পনার জড়ত্ব

প্রমাণ করিতেছে। আপনাকে বড়ো বলিয়া ঠাহরাইতে অধিক কল্পনার আবশ্যক করে না, কিন্তু যথার্থ বড়োকে বড়ো বলিয়া সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে উন্নত কল্পনার আবশ্যক।

অলস কল্পনা পবিত্র জীবনের অভাবে দেখিতে দেখিতে এইরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। আলস্যের সাহিত্যও তদনুসারে বিকৃত আকার ধারণ করে। ছিন্নবল্গ রথভ্রষ্ট অশ্বের ন্যায় অসংযত কল্পনা পথ হইতে বিপথে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে দক্ষিণও যেমন বামও তেমনি ; কেন যে এ দিকে না গিয়া ও দিকে যাই তাহার কোনো কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেখানে আকার-আয়তনের মাত্রা পরিমাণ থাকে না। বলা নাই কহা নাই সুন্দর হঠাৎ কদর্য হইয়া উঠে। সুন্দরীর দেহ সুমেরু ডমরু মেদিনী গৃধিনী শুকচঞ্চু কদলী হস্তিশুণ্ড প্রভৃতির বিষম সংযোগে গঠিত হইয়া রাক্ষসী মূর্তি গ্রহণ করে। হৃদয়ের আবেগ কল্পনার তেজ হারাইয়া কেবল বঙ্কিম কথা-কৌশলে পরিণত হয়, যথা—

অদ্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ততে মে
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা।

...

এখনো সে মোর মনে আছয়ে সর্বথা,
একরাতি মোর দোষে না কহিল কথা।
বিস্তর যতনে নারি কথা কহাইতে
ছলে হাঁচিলাম ‘জীব’ বাক্য বলাইতে।
আমি জীলে রহে তার আয়তি নিশ্চল
জানায়ে পরিল কানে কনককুণ্ডল।

— বিদ্যাসুন্দর

এইরূপ অত্যদ্ভুত মানসিক ব্যায়ামচর্চার মধ্যে শৈশবকল্পনার আত্মবিস্মৃত সরলতাও নাই এবং পরিণত কল্পনার সুবিচারসংগত সংযমও নাই। শাসনমাত্রবিরহিত আদর ও আলস্যে পালিত হইলে মনুষ্য যেমন পুত্তলির মতো হইয়া উঠে, শৈশব হারায়, অথচ কোনো কালে বয়োলাভ করে না এবং এইরূপে একপ্রকার কিম্ভূত বিকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, অনিয়ন্ত্রিত আলস্যের মধ্যে পুষ্ট হইলে সাহিত্যও সেইরূপ অদ্ভুত বামনমূর্তি ধারণ করে।

চিরকালই, সকল বিষয়েই, আলস্যের সহিত দারিদ্র্যের যোগ। সাহিত্যেও তাহার প্রমাণ দেখা যায়। অলস কল্পনা আর-সমস্ত ছাড়িয়া উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করে। প্রকৃতির মহৎ সৌন্দর্যসম্পদে তাহার অধিকার থাকে না; পরম সন্তুষ্ট চিত্তে আবর্জনাকণিকার মধ্যে সে আপনার জীবিকা সঞ্চয় করিতে থাকে। কুমারসম্ভবের মহাদেবের সহিত অন্নদামঙ্গলের মহাদেবের তুলনা করো। কল্পনার দারিদ্র্য যদি দেখিতে চাও অন্নদামঙ্গলের মদনভস্ম পাঠ করিয়া দেখো। বদ্ধ মলিন জলে যেমন দূষিতবাষ্পস্ফীত গাঢ় বুদ্‌বুদশ্রেণী ভাসিয়া উঠে তেমনি আমাদের এই বিলাসকলুষিত অলস বঙ্গসমাজের মধ্য হইতে ক্ষুদ্রতা ও ইন্দ্রিয়বিকারে পরিপূর্ণ হইয়া অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর ভাসিয়া উঠিয়াছিল। নিরবচ্ছিন্ন আলস্যের মধ্যে এইরূপ সাহিত্যই সম্ভব।

ক্ষুদ্র কল্পনা হয় আপনাকে সহস্র মলিন ক্ষুদ্র বস্তুর সহিত লিপ্ত করিয়া রাখে, নয় সমস্ত আকার আয়তন পরিহার করিয়া বাষ্পরূপে মেঘরাজ্য নির্মাণ করিতে থাকে। তাহার ঠিক-ঠিকানা পাওয়া যায় না। স্থানে স্থানে দৈবাৎ এক-একটা আকৃতিমতী মূর্তির মতো দেখা যায়, কিন্তু মনোযোগ করিয়া দেখিতে গেলে তাহার মধ্যে কোনো অভিব্যক্তি বা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহাকে ঘন বলিয়া মনে হয় তাহা বাষ্প, যাহাকে সত্য বলিয়া ভ্রম হয় তাহা মরীচিকা। কেহ কেহ

বলিতেছেন, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এইরূপ কল্পনাকুজ্ঝটিকার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহা যদি সত্য হয় তবে ইহাও আমাদের ক্ষীণ ও অলস কল্পনার পরিচায়ক।

বলা বাহুল্য ইতিপূর্বে[১] যখন আমি লিখিয়াছিলাম যে অবসরের মধ্যেই সাহিত্যের বিকাশ তখন আমি এরূপ মনে করি নাই যে, অবসর ও আলস্য একই। কারণ, আলস্য কার্যের বিঘ্নজনক এবং অবসর কার্যের জন্মভূমি।

কতকগুলি কাজ আছে যাহা সমস্ত অবসর হরণ করিয়া লইবার প্রয়াস পায়। সেইরূপ কাজের বাহুল্যে সাহিত্যের ক্ষতি করে। যাহা নিতান্তই আপনার ছোটো কাজ, যাহার জন্য উর্ধ্বশ্বাসে দাপিয়া বেড়াইতে হয়, যাহার সঙ্গে সঙ্গে ঝঞ্চনি খিটিমিটি খুঁটিনাটি দুশ্চিন্তা লাগিয়াই আছে, তাহাই কল্পনার ব্যাঘাতজনক। বৃহৎ কাজ আপনি আপনার অবসর সঙ্গে লইয়া চলিতে থাকে। খুচরা কাজের অপেক্ষা তাহাতে কাজ বেশি এবং বিরামও বেশি। বৃহৎ কাজে মানবহৃদয় আপন সঞ্চরণের স্থান পায়। সে আপন কাজের মহত্ত্বে মহৎ আনন্দ লাভ করিতে থাকে। মহৎ কাজের মধ্যে বৃহৎ সৌন্দর্য আছে, সেই সৌন্দর্যই আপন বলে আকর্ষণ করিয়া হৃদয়কে কাজ করায় এবং সেই সৌন্দর্যই আপন সুধাহিল্লোলে হৃদয়ের শ্রান্তি দূর করে। মানুষ কখনো ভাবে মাতোয়ারা হইয়া কাজ করে, কখনো ঝঞ্ঝটে পড়িয়া কাজ করে। কতকগুলি কাজে তাহার জীবনের প্রসর বৃদ্ধি করিয়া দেয়, কতকগুলি কাজে তাহার জীবনকে একটা যন্ত্রের মধ্যে সংকুচিত করিয়া রাখে। কোনো কোনো কাজে সে আপনাকে কর্তা আপনাকে দেবসন্তান বলিয়া অনুভব করে, আবার কোনো কোনো কাজে সে আপনাকে কঠিন নিয়মে অবিশ্রাম পরিচালিত এই বৃহৎ যন্ত্রজগতের এক ক্ষুদ্র অংশ বলিয়া মনে করে। মানুষের মধ্যে মানবও আছে যন্ত্রও

১ পূর্ববর্তী প্রবন্ধে

আছে, উভয়েই এক সঙ্গে কাজ করিতে থাকে, কাজের গতিকে কেহ কখনও প্রবল হইয়া উঠে। যখন যন্ত্রই অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে তখন আনন্দ থাকে না, সাহিত্য চলিয়া যায় অথবা সাহিত্য যন্ত্রজাত জীবনহীন পরিপাটি পণ্যদ্রব্যের আকার ধারণ করে।

বাঙ্গালা দেশে এক দল লোক কোনো কাজ করে না, আর-এক দল লোক খুচরা কাজে নিযুক্ত। এখানে মহৎ উদ্দেশ্য ও বৃহৎ অনুষ্ঠান নাই, সুতরাং জাতির হৃদয়ে উন্নত সাহিত্যের চির আকরভূমি গভীর আনন্দ নাই। বসন্তের প্রভাতে যেমন বিহঙ্গেরা গান গাহে তেমনি বৃহৎ জীবনের আনন্দে সাহিত্য জাগ্রত হইয়া উঠে। সেই জীবন কোথায়? 'বঙ্গদর্শন' যখন ভগীরথের ন্যায় পাশ্চাত্যশিখর হইতে স্বাধীন ভাবস্রোত বাঙ্গালার হৃদয়ের মধ্যে আনয়ন করিলেন তখন বাঙ্গালা একবার নিদ্রোত্থিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার হৃদয়ে এক নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত বিহঙ্গের ন্যায় নূতন ভাবালোকে বিহার করিবার জন্য উড্ডীয়মান হইয়াছিল। সে এক সুন্দর ও মহৎ জীবনের সঙ্গসুখ লাভ করিয়া হৃদয়ের মধ্যে সহসা নবযৌবনের পুলক অনুভব করিতেছিল। পৃথিবীর কাজ করিবার জন্য একদিন বাঙালীর প্রাণ যেন ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল— সেই সময়ে বঙ্গসাহিত্য মুকুলিত হইতেছিল। এমন সময়ে কোথা হইতে বার্ধক্যের শীতবায়ু বহিল। প্রবীণ লোকেরা কহিতে লাগিল, 'একি মত্ততা! ছেলেরা সৌন্দর্য দেখিয়াই ভুলিল, এ দিকে তত্ত্বজ্ঞান যে ধুলিধূসর হইতেছে!' আমরা চিরদিনের সেই তত্ত্বজ্ঞানী জাতি। তত্ত্বজ্ঞানের আস্বাদ পাইয়া আবার সৌন্দর্য ভুলিলাম। প্রেমের পরিবর্তে অহংকার আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিল। এখন বলিতেছি, আমরা মস্ত লোক, কারণ আমরা কুলীন, আমাদের অপেক্ষা বড়ো কেহই নাই! পশ্চিমের শিক্ষা ভ্রান্ত শিক্ষা! মনু অভ্রান্ত! কথাগুলা আওড়াইতেছি, অথচ ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিতেছি

না। কূটবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া কুটিল ব্যাখ্যা-দ্বারা অবিশ্বাসকে বিশ্বাস বলিয়া প্রমাণ করিতেছি। এ উপায়ে প্রকৃত বিশ্বাস বাড়ে না, কিন্তু অহংকার বাড়ে, বুদ্ধিকৌশলে দেবতাকে গড়িয়া তুলিয়া আপনাকেই দেবতার দেবতা বলিয়া মনে হয়। দিন-কতকের জন্য অনুষ্ঠানের বাহুল্য হয়, কিন্তু ভক্তির সজীবতা থাকে না। যাহা আছে তাহাই ভালো, মিথ্যা তর্কের দ্বারা এইরূপ মন ভুলাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার ইচ্ছা হয়। জীবন্ত জগতের মধ্যে কোথাও যথার্থ মহত্ত্ব নাই, আছে কেবল এক মৃত জাতির অঙ্গবিকারের মধ্যে, এইরূপ বিশ্বাসের ভান করিয়া আমরা আরামে মৃত্যুকে আলিঙ্গন-পূর্বক পরম নিশ্চেষ্টভাবে শ্রেষ্ঠত্বগর্বসুখ ভোগ করিতে থাকি। এরূপ অবস্থায় উদ্যমহীন, আকাঙ্ক্ষাহীন, প্রেমহীন, ছিন্নপক্ষ সাহিত্য যে ধুলায় লুণ্ঠিত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য কী! এখন সকলে মিলিয়া কেবল তত্ত্বজ্ঞান ও আত্মাভিমান প্রচার করিতেছে।

এই জড়ত্ব অবিশ্বাস ও অহংকার চিরদিন থাকিবে না। দীপ আপন নির্বাপিত শিখার স্মৃতিমাত্র লইয়া কেবল অহর্নিশি দুর্গন্ধ ধূম বিস্তার করিয়াই আপনাকে সার্থক জ্ঞান করিবে তাহা বিশ্বাস হয় না। জ্বলন্ত প্রদীপের স্পর্শে সে আবার জ্বলিয়া উঠিবে এবং সে আলোক তাহার নিজেরই আলোক হইবে। দ্বাররোধপূর্বক অন্ধকারে ইহসংসারের মধ্যে আপনাকেই একাকী বিরাজমান মনে করিয়া একপ্রকার নিশ্চেষ্ট পরিতোষ লাভ করা যায় বটে, কিন্তু একবার যখন বাহির হইয়া সমগ্র মানবসমাজের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইব, এই বৃহৎ বিক্ষুব্ধ মানবজীবনের মধ্যে আপন জীবনের স্পন্দন অনুভব করিব, আপন নাভিপদ্মের উপর হইতে স্তিমিত দৃষ্টি উঠাইয়া লইয়া মুক্ত আকাশের মধ্যে বিকশিত আন্দোলিত জ্যোতির্ময় সংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিব, তখনই আমরা আমাদের যথার্থ মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব— তখন জানিতে পারিব, সহস্র মানবের জন্য আমার জীবন এবং আমার জন্য সহস্র মানবের জীবন। তখন সংকীর্ণ

সুখ ও অন্ধ গর্ব উপভোগ করিবার জন্য কতকগুলা ঘর-গড়া তুচ্ছ মিথ্যা-রাশি ও ক্ষুদ্রতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার আবশ্যকতা চলিয়া যাইবে। তখন যে সাহিত্য জন্মিবে তাহা সমস্ত মানবের সাহিত্য হইবে এবং সে সাহিত্য উপভোগ করিবার জন্য ব্যক্তিবিশেষের ক্ষুদ্র মত ও বুদ্ধি-মানের ব্যাখ্যাকৌশলের প্রয়োজন থাকিবে না।

শ্রাবণ ১২৯৪

আলোচনা

(পত্র)

লেখা সম্বন্ধে তুমি যে প্রস্তাব করেছ সে অতি উত্তম। মাসিক পত্রে লেখা অপেক্ষা বন্ধুকে পত্র লেখা অনেক সহজ। কারণ, আমাদের অধিকাংশ ভাবই বুনো হরিণের মতো, অপরিচিত লোক দেখলেই দৌড় দেয়। আবার পোষা ভাব এবং পোষা হরিণের মধ্যে স্বাভাবিক বন্যশ্রী পাওয়া যায় না।

কাজটা দু রকমে নিষ্পন্ন হতে পারে। এক, কোনো-একটা বিশেষ বিষয় স্থির করে দু জনে বাদপ্রতিবাদ করা— কিন্তু তার একটা আশঙ্কা আছে, মীমাংসা হবার পূর্বেই বিষয়টা ক্রমে একঘেয়ে হয়ে যেতে পারে। আর-এক, কেবল চিঠি লেখা— অর্থাৎ কোনো উদ্দেশ্য না রেখে লেখা, কেবল লেখার জন্যেই লেখা। অর্থাৎ ছুটির দিনে দুই বন্ধুতে মিলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়া ; তার পরে যেখানে গিয়ে পড়ি তাতে কিছু আসে যায় না, এবং পথ হারালেও কোনো মনিবের কাছে কৈফিয়ত দেবার নেই।

দস্তুরমত রাস্তায় চলতে গেলে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলবার জো থাকে না। কিন্তু প্রাপ্য জিনিসের চেয়ে ফাউ যেমন বেশি ভালো লাগে তেমনি অধিকাংশ সময়েই অপ্রাসঙ্গিক কথাটায় বেশি আমোদ পাওয়া যায় ; মূল কথাটার চেয়ে তার আশপাশের কথাটা বেশি মনোরম বোধ হয় ; অনেক সময়ে রামের চেয়ে হনুমান এবং লক্ষ্মণ, যুধিষ্ঠিরের চেয়ে ভীষ্ম এবং ভীম, সূর্যমুখীর চেয়ে কমলমণি বেশি প্রিয় বলে বোধ হয়।

অবশ্য, সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক কথা বললে একেবারে পাগলামি করা হয় ; কিন্তু তাই বলে নিজের নাসাগ্রভাগের সমসূত্র ধরে ভূমিকা থেকে উপসংহার পর্যন্ত একেবারে সোজা লাইনে চললে নিতান্ত কলে তৈরি

'আলোচনা' এবং পরবর্তী তিনটি প্রবন্ধ লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে পত্ররূপে লিখিত

প্রবন্ধের সৃষ্টি হয়, মানুষের হাতের কাজের মতো হয় না। সেরকম আঁটা-আঁটি প্রবন্ধের বিশেষ আবশ্যক আছে এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না; কিন্তু সর্বত্র তারই বড়ো বাহুল্য দেখা যায়। সেগুলো পড়লে মনে হয় যেন সত্য তার সমস্ত সুসংলগ্ন যুক্তিপরম্পরা নিয়ে একেবারে সম্পূর্ণভাবে কোথা থেকে আবির্ভূত হল। মানুষের মনের মধ্যে সে যে মানুষ হয়েছে, সেখানে তার যে আরও অনেকগুলি সমবয়সী সহোদর ছিল, একটি বৃহৎ বিস্তৃত মানসপুরে যে তার একটি বিচিত্র বিহারভূমি ছিল, লেখকের প্রাণের মধ্যে থেকেই সে যে প্রাণ লাভ করেছে, তা তাকে দেখে মনে হয় না; এমন মনে হয় যেন কোনো ইচ্ছাময় দেবতা যেমন বললেন 'অমুক প্রবন্ধ হউক' অমনি অমুক প্রবন্ধ হল: লেট দেয়ার বি লাইট অ্যাণ্ড্ দেয়ার ওআজ় লাইট। এইজন্য তাকে নিয়ে কেবল আমাদের মাথার খাটুনি হয়, কেবলমাত্র মগজ দিয়ে সেটাকে হজম করবার চেষ্টা করা হয়; আমাদের মানসপুরে যেখানে আমাদের নানাবিধ জীবন্ত ভাব জন্মাচ্ছে খেলছে এবং বাড়ছে সেখানে তার স্বর পরিচিত ভাবে প্রবেশ করতে পারে না; প্রস্তুত হয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে হয়, সাবধান হয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে হয়; তার সঙ্গে কেবল আমাদের একাংশের পরিচয় হয় মাত্র, ঘরের লোকের মতো সর্বাংশের পরিচয় হয় না।

ম্যাপে এবং ছবিতে অনেক তফাত। ম্যাপে পার্স্পেক্টিভ থাকতে পারে না; দূর নিকটের সমান ওজন, সর্বত্রই অপক্ষপাত; প্রত্যেক অংশকেই সূক্ষ্মবিচারমত তার যথাপরিমাণ স্থান নির্দেশ করে দিতে হয়। কিন্তু ছবিতে অনেক জিনিস বাদ পড়ে; অনেক বড়ো ছোটো হয়ে যায়; অনেক ছোটো বড়ো হয়ে ওঠে। কিন্তু তবু ম্যাপের চেয়ে তাকে সত্য মনে হয়, তাকে দেখবামাত্রই এক মুহূর্তে আমাদের সমস্ত চিত্ত তাকে চিনতে পারে। আমরা চোখে যে ভুল দেখি তাকে সংশোধন করতে গেলে ছবি হয় না, ম্যাপ হয়, তাকে মাথা খাটিয়ে আয়ত্ত করতে হয়। কিন্তু

এইরকম আংশিক চেষ্টা ভারী শ্রান্তিজনক। যাতে আমাদের সমস্ত প্রকৃতি উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেয় না, পরস্পরের ভার লাঘব করে না, নিজ নিজ অংশ বণ্টন করে নেয় না, তাতে আমাদের তেমন পরিপুষ্টি-সাধন হয় না। যে কারণে খনিজ পদার্থের চেয়ে প্রাণিজ পদার্থ আমরা শীঘ্র গ্রহণ এবং পরিপাক করতে পারি, সেই কারণে একেবারে অমিশ্র খাঁটি সত্য কঠিন যুক্তি-আকারে আমাদের অধিকাংশ পাকযন্ত্রের পক্ষেই গুরুপাক। এইজন্য সত্যকে মানবের জীবনাংশের সঙ্গে মিশ্রিত করে দিলে সেটা লাগে ভালো।

সেই কাজ করতে গেলেই, প্রথমত একটা সত্যকে এক দমে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আগাগোড়া দেওয়া যায় না। কারণ, অধিকাংশ সত্যই আমরা মনের মধ্যে আভাসরূপে পাই এবং তার পশ্চাতে আমাদের মাথাটাকে প্রেরণ ক'রে গ'ড়ে পিটে তার একটা আগাগোড়া খাড়া করে তুলতে চেষ্টা করি। সেটাকে বেশ একটা সংগত এবং সম্পূর্ণ আকার না দিলে একটা চলনসই প্রবন্ধ হল না, মনে করি। এইজন্যে নানাবিধ কৃত্রিম কাঠ খড় দিয়ে তাকে নিয়ে একটা বড়োগোছের তাল পাকিয়ে তুলতে হয়।

আমি ইংরিজি কাগজ এবং বইগুলো যখন পড়ি তখন অধিকাংশ সময়েই আমার এই কথা মনে হয় যে, একটা কথাকে একটা প্রবন্ধ কিম্বা একটা গ্রন্থে পরিণত করতেই হবে এই চেষ্টা থাকাতে প্রতিদিনকার ইংরাজি সাহিত্যে যে কত বাজে বকুনির প্রাদুর্ভাব হয়েছে তার আর সংখ্যা নেই— এবং সত্যটুকুকে খুঁজে বের করা কত দুঃসাধ্য হয়েছে! যে কথাটা বলা হচ্ছে সেটা আসলে কত সহজ এবং সংক্ষিপ্ত, সেটাকে না-হক কত দুরূহ এবং বৃহৎ করে তোলা হয়! আমার বোধ হয় ইংরাজি সাহিত্যের মাপকাঠিটা বড়ো বেশি বেড়ে গেছে— তিন ভল্যুম না হলে নভেল হয় না এবং মাসিক পত্রের এক-একটা প্রবন্ধ দেখলে ভয় লাগে। আমার বোধ

হয় 'নাইন্টীন্থ্ সেন্চুরি' যদি অত বড়ো আয়তনের কাগজ না হত তা হলে ওর লেখাগুলো ঢের বেশি পাঠ্য এবং খাঁটি হত।

আমার তো মনে হয়, বঙ্কিমবাবুর নভেলগুলি ঠিক নভেল যত বড়ো হওয়া উচিত তার আদর্শ। ভাগ্যে তিনি ইংরাজি নভেলিস্টের অনুকরণে বাংলায় বৃহদায়তনের দস্তুর বেঁধে দেন নি, তা হলে বড়ো অসহ্য হয়ে উঠত— বিশেষত সমালোচকের পক্ষে। এক-একটা ইংরাজি নভেলে এত অতিরিক্ত বেশি কথা, বেশি ঘটনা, বেশি লোক যে, আমার মনে হয় ওটা একটা সাহিত্যের বর্বরতা। সমস্ত রাত্রি ধরে যাত্রাগান করার মতো। প্রাচীনকালেই ওটা শোভা পেত। তখন ছাপাখানা এবং প্রকাশকসম্প্রদায় ছিল না, তখন একখানা বই নিয়ে বহুকাল জাওর কাটবার সময় ছিল। এমন-কি, জর্জ্ এলিয়টের নভেল যদিও আমার খুব ভালো লাগে তবু এটা আমার বরাবর মনে হয়, জিনিসগুলো বড়ো বেশি বড়ো— এত লোক, এত ঘটনা, এত কথার হিজিবিজি না থাকলে বইগুলো আরো ভালো হত। কাঁঠাল ফল দেখে যেমন মনে হয়— প্রকৃতি একটা ফলের মধ্যে ঠেসাঠেসি করে বিস্তর সারবান কোষ পূরতে চেষ্টা করে ফলটাকে আয়তনে খুব বৃহৎ এবং ওজনে খুব ভারী করেছেন বটে এবং একজন লোকের সংকীর্ণ পাকযন্ত্রের পক্ষে কম দুঃসহ করেন নি, কিন্তু হাতের কাজটা মাটি করেছেন। এরই একটাকে ভেঙে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটা ফল গড়লে সেগুলো দেখতে ভালো হত। জর্জ্ এলিয়টের এক-একটি নভেল এক-একটি সাহিত্যকাঁঠাল-বিশেষ। ক্ষমতা দেখে মানুষ আশ্চর্য হয় বটে, কিন্তু সৌন্দর্য দেখে মানুষ খুশি হয়। স্থায়িত্বের পক্ষে সহজতা সরলতা সৌন্দর্য যে প্রধান উপকরণ তার আর সন্দেহ নেই।

সত্যকে যথাসাধ্য বাড়িয়ে তুলে তাকে একটা প্রচলিত দস্তুরমত আকার দিয়ে সত্যের খর্বতা করা হয়, অতএব তায় কাজ নেই। তা ছাড়া সত্যকে এমনভাবে প্রকাশ করা যাক যাতে লোকে অবিলম্বে জানতে পারে যে

সেটা আমারই বিশেষ মন থেকে বিশেষভাবে দেখা দিচ্ছে। আমার ভালো লাগা, মন্দ লাগা, আমার সন্দেহ এবং বিশ্বাস, আমার অতীত এবং বর্তমান তার সঙ্গে জড়িত হয়ে থাক; তা হলেই সত্যকে নিতান্ত জড়পিণ্ডের মতো দেখাবে না।

আমার বোধ হয়, সাহিত্যের মূল ভাবটাই তাই। যখন কোনো-একটা সত্য লেখক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেখা দেয়, যখন সে জন্মভূমির সমস্ত ধূলি মুছে ফেলে এমন ছদ্মবেশ ধারণ করে যাতে ক'রে তাকে একটা অমানুষিক স্বয়ম্ভূ সত্য বলে মনে হয়, তখন তাকে বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি নানা নাম দেওয়া হয়। কিন্তু যখন সে সঙ্গে সঙ্গে আপনার জন্মভূমির পরিচয় দিতে থাকে, আপনার মানবাকার গোপন করে না, নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং জীবনের আন্দোলন প্রকাশ করে, তখনই সেটা সাহিত্যের শ্রেণীতে ভুক্ত হয়। এইজন্যে বিজ্ঞান দর্শন সবই সাহিত্যের মধ্যে মিশিয়ে থাকতে পারে এবং ক্রমেই মিশিয়ে যায়। প্রথম গজিয়ে তারা দিন-কতক অত্যন্ত খাড়া হয়ে থাকে, তার পরে মানবজীবনের সঙ্গে তারা যতই মিলে যায় ততই সাহিত্যের অন্তর্ভূত হতে থাকে, ততই তার উপর সহস্র মনের সহস্র ছাপ পড়ে এবং আমাদের মনোরাজ্যে তাদের আর প্রবাসীভাবে থাকতে হয় না।

এইরকম সাহিত্য-আকারে যখন সত্য পাই তখন সে সর্বতোভাবে সাধারণের ব্যবহারোপযোগী হয়।

কিন্তু সাধারণের সহজে ব্যবহারোপযোগী হয় বলেই সাধারণের কাছে অনেক সময় তার বিশেষ গৌরব চলে যায়। যেন সত্যকে মানবজীবন দিয়ে মণ্ডিত করে প্রকাশ করা কম কথা। সেটাকে সহজে গ্রহণ করা যায় বলে যেন সেটাকে সৃজন করাও সহজ। তাই আমাদের সারবান সমালোচকেরা প্রায়ই আক্ষেপ করে থাকেন, বাংলায় রাশি রাশি নাটক-নভেল-কাব্যের আমদানি হচ্ছে। কই হচ্ছে! যদি হত তা হলে আমাদের

ভাবনা কী ছিল!

আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না আমরা জ্ঞানতঃ কিম্বা অজ্ঞানতঃ মানুষকেই সব চেয়ে বেশি গৌরব দিয়ে থাকি? আমরা যদি কোনো সাহিত্যে অনেকগুলো ভ্রান্ত মতের সঙ্গে একটা জীবন্ত মানুষ পাই সেটাকে কি চিরস্থায়ী করে রেখে দিই নে? জ্ঞান পুরাতন এবং অনাদৃত হয়, কিন্তু মানুষ চিরকাল সঙ্গদান করতে পারে। সত্যকার মানুষ প্রতিদিন যাচ্ছে এবং আসছে; তাকে আমরা খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখি, এবং ভুলে যাই, এবং হারাই। অথচ মানুষকে আয়ত্ত করবার জন্যেই আমাদের জীবনের সর্ব-প্রধান ব্যাকুলতা। সাহিত্যে সেই চঞ্চল মানুষ আপনাকে বদ্ধ করে রেখে দেয়; তার সঙ্গে আপনার নিগূঢ় যোগ চিরকাল অনুভব করতে পারি। জীবনের অভাব সাহিত্যে পূরণ করে। চিরমনুষ্যের সঙ্গ লাভ ক'রে আমাদের পূর্ণ মনুষ্যত্ব অলক্ষিত ভাবে গঠিত হয়— আমরা সহজে চিন্তা করতে, ভালোবাসতে এবং কাজ করতে শিখি। সাহিত্যের এই ফলগুলি তেমন প্রত্যক্ষগোচর নয় ব'লে অনেকে একে শিক্ষার বিষয়ের মধ্যে নিকৃষ্ট আসন দিয়ে থাকেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, সাধারণতঃ দেখলে বিজ্ঞান-দর্শন-ব্যতীতও কেবল সাহিত্যে একজন মানুষ তৈরি হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য-ব্যতিরেকে কেবল বিজ্ঞান-দর্শনে মানুষ গঠিত হতে পারে না।

কিন্তু আমি তোমাকে কী বলছিলুম, সে কোথায় গেল! আমি বলছিলেম, কোনো-একটা বিশেষ প্রসঙ্গ নিয়ে তার আগাগোড়া তর্ক নাই হল। তার মীমাংসাই বা নাই হল। কেবল দুজনের মনের আঘাত-প্রতিঘাতে চিন্তাপ্রবাহের মধ্যে বিবিধ ঢেউ তোলা, যাতে করে তাদের উপর নানা বর্ণের আলোছায়া খেলতে পারে, এই হলেই বেশ হয়। সাহিত্যে এরকম সুযোগ সর্বদা ঘটে না, সকলেই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ মত প্রকাশ করতেই ব্যস্ত— এইজন্যে অধিকাংশ মাসিক পত্র মৃত মতের মিউজিয়াম বললেই হয়। মত-সকল জীবিত অবস্থায় যেখানে নানা ভঙ্গিতে সঞ্চরণ

করে সেখানে পাঠকদের প্রবেশলাভ দুর্লভ। অবশ্য, সেখানে কেবল গতি নৃত্য এবং আভাস দেখা যায় মাত্র— জিনিসটাকে সম্পূর্ণ হাতে তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করা যায় না— কিন্তু তাতে যে-এক রকমের জ্ঞান এবং সুখ পাওয়া যায় এমন অন্য কিছুতে পাবার সুবিধে নেই।

ফাল্গুন ১২৯৮

সাহিত্য

(পত্রোত্তর)

তুমি আমাকে খানিকটা ভুল বুঝেছ সন্দেহ নেই। আমিও বোধ করি কিঞ্চিৎ ঢিলে রকমে ভাব প্রকাশ করেছিলুম। কিন্তু সেজন্যে আমার কোনো দুঃখ নেই। কারণ, ভুল না বুঝলে অনেক সময় এক কথায় সমস্ত শেষ হয়ে যায়, অনেক কথা বলবার অবসর পাওয়া যায় না। খাবার জিনিস মুখে দেবামাত্র মিলিয়ে গেলে যেমন তার সম্পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করা যায় না তেমনি ভুল না বুঝলে, শোনবামাত্র অবাধে মতের ঐক্য হলে, কথাটা এক দমে উদরস্থ হয়ে যায়— র'য়ে ব'সে তার সমস্তটার পুরো আস্বাদ পাওয়া যায় না।

তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ, সে যে তোমার দোষ তা আমি বলতে চাই নে। আপনার ঠিক মতটি নির্ভুল করে ব্যক্ত করা ভারী শক্ত। এক মানুষের মধ্যে যেন দুটো মনুষ্য আছে, ভাবুক এবং লেখক। যে লোকটা ভাবে সেই লোকটাই যে সব সময় লেখে তা ঠিক মনে হয় না। লেখক-মনুষ্যটি ভাবুক-মনুষ্যটির প্রাইভেট সেক্রেটারি। তিনি অনেক সময় অনবধানতা কিম্বা অক্ষমতা -বশত ভাবুকের ঠিক ভাবটি প্রকাশ করেন না। আমি মনে করছি আমার যেটি বক্তব্য আমি সেটি ঠিক লিখে যাচ্ছি এবং সকলের কাছেই সেটা পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠছে, কিন্তু আমার লেখনী যে কখন পাশের রাস্তায় চলে গেছেন আমি হয়তো তা জানতেও পারি নি।

কিন্তু তার ভুলের জন্যে আমিই দায়ী ; তার উপরে দোষারোপ করে আমি নিষ্কৃতি পেতে পারি নে। এইজন্যে অনেক সময়ে দায়ে পড়ে তার পক্ষ সমর্থন করতে হয়। যেটা ঠিক আমার মত নয় সেইটেকেই আমার মত বলে ধরে নিয়ে প্রাণপণে লড়াই করে যেতে হয়। কারণ, আমার

নিজের মধ্যে যে একটা গৃহবিচ্ছেদ আছে সেটা বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করতে ইচ্ছে করে না।

সাহিত্য যে কেবল লেখকের আত্মপ্রকাশ, আমার চিঠিতে যদি এই কথা বেরিয়ে গিয়ে থাকে তা হলে অগত্যা যতক্ষণ পারা যায় তার হয়ে লড়তে হবে এবং সে কথাটার মধ্যে যতটুকু সত্য আছে তা সমস্তটা আদায় করে নিয়ে তার পরে তাকে ইক্ষুর চর্বিত অংশের মতো ফেলে দিলে কোনো ক্ষতি হবে না। আমরা যেভাবে চলেছি তাতে তাড়াতাড়ি একটা কথা সংশোধন করবার কোনো দরকার দেখি নে।

তুমি বলেছ, সাহিত্য যদি লেখকের আত্মপ্রকাশই হবে, তবে শেক্স্‌পীয়রের নাটককে কী বলবে। সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া অসম্ভব, অতএব একটু খোলসা করে বলি।

আত্মরক্ষা এবং বংশরক্ষা এই দুই নিয়ম জীবজগতে কার্য করে। এক হিসাবে দুটোকেই এক নাম দেওয়া যেতে পারে। কারণ, বংশরক্ষা প্রকৃতপক্ষে বৃহৎভাবে ব্যাপকভাবে সুদূরভাবে আত্মরক্ষা। সাহিত্যের কার্যকে তেমনি দুই অংশে ভাগ করা যেতে পারে। আত্মপ্রকাশ এবং বংশপ্রকাশ। গীতিকাব্যকে আত্মপ্রকাশ এবং নাট্যকাব্যকে বংশপ্রকাশ নাম দেওয়া যাক।

আত্মপ্রকাশ বলতে কী বোঝায় তার আর বাহুল্য বর্ণনার আবশ্যক নেই। কিন্তু বংশপ্রকাশ কথাটার একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক।

লেখকের নিজের অন্তরে একটি মানবপ্রকৃতি আছে এবং লেখকের বাহিরে সমাজে একটি মানবপ্রকৃতি আছে, অভিজ্ঞতাসূত্রে প্রীতিসূত্রে এবং নিগূঢ় ক্ষমতা -বলে এই উভয়ের সম্মিলন হয়; এই সম্মিলনের ফলেই সাহিত্যে নূতন নূতন প্রজা জন্মগ্রহণ করে। সেই-সকল প্রজার মধ্যে লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাহিরের মানবপ্রকৃতি দুইই সম্বদ্ধ হয়ে আছে, নইলে কখনোই জীবন্ত সৃষ্টি হতে পারে না। কালিদাসের দুষ্মন্ত-শকুন্তলা

এবং মহাভারতকারের দুষ্মন্ত-শকুন্তলা এক নয়, তার প্রধান কারণ কালিদাস এবং বেদব্যাস এক লোক নন, উভয়ের অন্তরপ্রকৃতি ঠিক এক ছাঁচের নয়; সেইজন্য তাঁরা আপন অন্তরের ও বাহিরের মানবপ্রকৃতি থেকে যে দুষ্মন্ত-শকুন্তলা গঠিত করেছেন তাদের আকারপ্রকার ভিন্ন রকমের হয়েছে। তাই ব'লে বলা যায় না যে, কালিদাসের দুষ্মন্ত অবিকল কালিদাসের প্রতিকৃতি; কিন্তু তবু এ কথা বলতেই হবে তার মধ্যে কালিদাসের অংশ আছে, নইলে সে অন্যরূপ হত। তেমনি শেক্‌স্‌পীয়রের অনেকগুলি সাহিত্যসন্তানের এক-একটি ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়েছে বলে যে তাদের মধ্যে শেক্‌স্‌পীয়রের আত্মপ্রকৃতির কোনো অংশ নেই তা আমি স্বীকার করতে পারি নে। সেরকম প্রমাণ অবলম্বন করতে গেলে পৃথিবীর অধিকাংশ ছেলেকেই পিতৃ-অংশ হতে বিচ্যুত হতে হয়। ভালো নাট্যকাব্যে লেখকের আত্মপ্রকৃতি এবং বাহিরের মানবপ্রকৃতি এমনি অবিচ্ছিন্ন ঐক্য রক্ষা করে মিলিত হয় যে উভয়কে স্বতন্ত্র করা দুঃসাধ্য।

অন্তরে বাহিরে এইরকম একীকরণ না করতে পারলে কেবলমাত্র বহুদর্শিতা এবং সূক্ষ্ম বিচারশক্তি -বলে কেবল রস্কুকো প্রভৃতির ন্যায় মানবচরিত্র ও লোকসংসার সম্বন্ধে পাকা প্রবন্ধ লিখতে পারা যায়। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর নাটকের পাত্রগণকে নিজের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন, অন্তরের নাড়ীর মধ্যে প্রবাহিত প্রতিভার মাতৃরস পান করিয়েছিলেন, তবেই তারা মানুষ হয়ে উঠেছিল; নইলে তারা কেবলমাত্র প্রবন্ধ হত। অতএব এক হিসাবে শেক্‌স্‌পীয়রের রচনাও আত্মপ্রকাশ, কিন্তু খুব সম্মিশ্রিত বৃহৎ এবং বিচিত্র।

সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে মানবজীবনের সম্পর্ক। মানুষের মানবিক জীবনটা কোন্‌খানে? যেখানে আমাদের বুদ্ধি এবং হৃদয়, বাসনা এবং অভিজ্ঞতা সবগুলি গ'লে গিয়ে, মিশে গিয়ে একটি সম্পূর্ণ ঐক্যলাভ করেছে। যেখানে আমাদের বুদ্ধি প্রবৃত্তি এবং রুচি সম্মিলিতভাবে কাজ

করে। এক কথায়, যেখানে আদত মানুষটি আছে। সেইখানেই সাহিত্যের জন্মলাভ হয়। মানুষ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশ পায়। সেই খণ্ড অংশগুলি বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি রচনা করে— পর্যবেক্ষণকারী মানুষ বিজ্ঞান রচনা করে, চিন্তাশীল মানুষ দর্শন রচনা করে, এবং সমগ্র মানুষটি সাহিত্য রচনা করে।

গেটে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব সম্বন্ধে বই লিখেছেন। তাতে উদ্ভিদ্‌রহস্য প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু গেটের কিছুই প্রকাশ পায় নি অথবা সামান্য এক অংশ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু গেটে যে-সমস্ত সাহিত্য রচনা করেছেন তার মধ্যে মূল মানবটি প্রকাশ পেয়েছেন বৈজ্ঞানিক গেটের অংশও অলক্ষিত মিশ্রিত ভাবে তার মধ্যে আছে। যিনি যাই বলুন শেক্‌স্‌পীয়রের কাব্যের কেন্দ্রস্থলেও একটি অমূর্ত ভাবশরীরী শেক্‌স্‌পীয়রকে পাওয়া যায় যেখান থেকে তাঁর জীবনের সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস বিরাগ অনুরাগ বিশ্বাস অভিজ্ঞতা সহজ জ্যোতির মতো চতুর্দিকে বিচিত্র শিখায় বিবিধ বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে ; যেখান থেকে ইয়াগোর প্রতি বিদ্বেষ, ওথেলোর প্রতি অনুকম্পা, ডেস্‌ডিমোনার প্রতি প্রীতি, ফল্‌স্টাফের প্রতি সকৌতুক সখ্য, লিয়ারের প্রতি সসম্ভ্রম করুণা, কর্ডেলিয়ার প্রতি সুগভীর স্নেহ শেক্‌স্‌পীয়রের মানবহৃদয়কে চিরদিনের জন্য ব্যক্ত ও বিকীর্ণ করছে।

সাহিত্যের সত্য কাকে বলা যেতে পারে এইবার সেটা বলবার অবসর হয়েছে।

লেখাপড়া দেখাশোনা কথাবার্তা ভাবাচিন্তা সবসুদ্ধ জড়িয়ে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সমগ্র জীবন দিয়ে নিজের সম্বন্ধে, পরের সম্বন্ধে, জগতের সম্বন্ধে একটা মোট সত্য পাই। সেইটেই আমাদের জীবনের মূল সুর। সমস্ত জগতের বিচিত্র সুরকে আমরা সেই সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিই, এবং আমাদের সমস্ত জীবনসংগীতকে সেই সুরের সঙ্গে বাঁধি। সেই মূলতত্ত্ব অনুসারে আমরা সংসারে বিরক্ত অথবা অনুরক্ত, স্বদেশবদ্ধ অথবা

সার্বভৌমক, পার্থিব অথবা আধ্যাত্মিক, কর্মপ্রিয় অথবা চিন্তাপ্রিয়। আমার জীবনের সেই মূলতত্ত্বটি, জগতের সমস্ত সত্য আমার জীবনের মধ্যে সেই-যে একটি জীবন্ত ব্যক্তিগত পরিণতি লাভ করেছে, সেইটি আমার রচনার মধ্যে প্রকাশ্যে অথবা অলক্ষিতভাবে আত্মা-স্বরূপে বিরাজ করবেই। আমি গীতিকাব্যই লিখি আর যাই লিখি কেবল তাতে যে আমার ক্ষণিক মনোভাবের প্রকাশ হয় তা নয়, আমার মর্মসত্যটিও তার মধ্যে আপনার ছাপ দেয়। মানুষের জীবনকেন্দ্রগত এই মূলসত্য সাহিত্যের মধ্যে আপনাকে নানা আকারে প্রতিষ্ঠিত করে; এইজন্যে একেই সাহিত্যের সত্য বলা যেতে পারে, জ্যামিতির সত্য কখনো সাহিত্যের সত্য হতে পারে না। এই সত্যটি বৃহৎ হলে পাঠকের স্থায়ী এবং গভীর তৃপ্তি হয়, এই সত্যটি সংকীর্ণ হলে পাঠকের বিরক্তি জন্মে।

দৃষ্টান্তস্বরূপে বলতে পারি, ফরাসি কবি গোতিয়ে-রচিত 'মাদ্‌মোয়াজেল দ্য মোপাঁ্যা' প'ড়ে (বলা উচিত আমি ইংরাজি অনুবাদ পড়েছিলুম) আমার মনে হয়েছিল, গ্রন্থটির রচনা যেমনই হোক তার মূলতত্ত্বটি জগতের যে অংশকে সীমাবদ্ধ করেছে সেটুকুর মধ্যে আমরা বাঁচতে পারি নে। গ্রন্থের মূল-ভাবটা হচ্ছে, একজন যুবক হৃদয়কে দূরে রেখে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেশদেশান্তরে সৌন্দর্যের সন্ধান করে ফিরছে। সৌন্দর্য যেন প্রস্ফুটিত জগৎ-শতদলের উপর লক্ষ্মীর মতো বিরাজ করছে না, সৌন্দর্য যেন মণিমুক্তার মতো কেবল অন্ধকার খনিগহ্বরে ও অগাধ সমুদ্র-তলে প্রচ্ছন্ন; যেন তা গোপনে আহরণ করে আপনার ক্ষুদ্র সম্পত্তির মতো কৃপণের সংকীর্ণ সিন্ধুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখবার জিনিস। এইজন্য এই গ্রন্থের মধ্যে হৃদয় অধিক ক্ষণ বাস করতে পারে না— রুদ্ধশ্বাস হয়ে তাড়াতাড়ি উপরে বেরিয়ে এসে যখন আমাদের প্রতিদিনের শ্যামল তৃণক্ষেত্র, প্রতিদিনের সূর্যালোক, প্রতিদিনের হাসিমুখগুলি দেখতে পাই তখনই বুঝতে পারি সৌন্দর্য এই তো আমাদের চারি দিকে, সৌন্দর্য এই

তো আমাদের প্রতিদিনের ভালোবাসার মধ্যে। এই বিশ্বব্যাপী সত্যকে সংকীর্ণ করে আনাতে পূর্বোক্ত ফরাসি গ্রন্থে সাহিত্যশিল্পের প্রাচুর্য-সত্ত্বেও সাহিত্য-সত্যের স্বল্পতা হয়েছে বলা যেতে পারে। মাদ্‌মোয়াজেল ছ মোপ্যাঁ এবং গোতিয়ে সম্বন্ধে আমার সমালোচনা ভ্রমাত্মক হবার সম্ভাবনা থাকতে পারে, কিন্তু এই দৃষ্টান্ত-দ্বারা আমার কথাটা কতকটা পরিষ্কার করা গেল। শেলি বলো, কীট্‌স্ বলো, টেনিসন বলো, সকলের লেখাতেই রচনার ভালো-মন্দর মধ্যেও একটা মর্মগত মূল-জিনিস আছে — তারই উপর ওই-সকল কবিতার ধ্রুবত্ব ও মহত্ত্ব নির্ভর করে। সেই জিনিসটাই ওই-সকল কবিতার সত্য। সেটাকে যে আমরা সকল সময়ে কবিতা বিশ্লেষণ করে সমগ্র বের করতে পারি তা নয়, কিন্তু তার শাসন আমরা বেশ অনুভব করতে পারি।

গোতিয়ের সহিত ওআর্ড্‌স্‌ওআর্থের তুলনা করা যেতে পারে। ওআর্ড্‌স্‌ওআর্থের কবিতার মধ্যে যে সৌন্দর্যসত্য প্রকাশিত হয়েছে তা পূর্বোক্ত ফরাসিস সৌন্দর্যসত্য অপেক্ষা বিস্তৃত। তাঁর কাছে পুষ্পপল্লব নদীনির্ঝর পর্বতপ্রান্তর সর্বত্রই নব নব সৌন্দর্য উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠছে। কেবল তাই নয়— তার মধ্যে তিনি একটা আধ্যাত্মিক বিকাশ দেখতে পাচ্ছেন, তাতে করে সৌন্দর্য অনন্ত বিস্তার এবং অনন্ত গভীরতা লাভ করেছে। তার ফল এই যে, এরকম কবিতায় পাঠকের শ্রান্তি তৃপ্তি বিরক্তি নেই; ওআর্ড্‌স্‌ওআর্থের কবিতার মধ্যে সৌন্দর্যের এই বৃহৎ সত্যটুকু থাকাতেই তার এত গৌরব এবং স্থায়িত্ব।

বৃহৎ সত্য কেন বলছি, অর্থাৎ বৃহৎই বা কেন বলি, সত্যই বা কেন বলি, তা আর-একটু পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করি। পরিষ্কার হবে কিনা বলতে পারি না, কিন্তু যতটা বক্তব্য আছে এই সুযোগে সমস্তটা বলে রাখা ভালো।

একটি পুষ্পের মধ্যে আমাদের হৃদয়ের প্রবেশ করবার একটিমাত্র পথ

আছে, তার বাহ্য সৌন্দর্য। ফুল চিন্তা করে না, ভালোবাসে না, ফুলের সুখদুঃখ নেই, সে কেবল সুন্দর আকৃতি নিয়ে ফোটে। এইজন্য সাধারণত ফুলের সঙ্গে মানুষের আর-কোনো সম্পর্ক নেই, কেবল আমরা ইন্দ্রিয়যোগে তার সৌন্দর্যটুকু উপলব্ধি করতে পারি মাত্র। এইজন্য সচরাচর ফুলের মধ্যে আমাদের সমগ্র মনুষ্যত্বের পরিতৃপ্তি নেই, তাতে কেবল আমাদের আংশিক আনন্দ; কিন্তু কবি যখন এই ফুলকে কেবলমাত্র জড় সৌন্দর্য-ভাবে না দেখে এর মধ্যে মানুষের মনোভাব আরোপ করে দেখিয়েছেন তখন তিনি আমাদের আনন্দকে আরও বৃহত্তর গাঢ়তর করে দিয়েছেন।

এ কথা একটা চিরসত্য যে, যাদের কল্পনাশক্তি আছে তারা সৌন্দর্যকে নির্জীব ভাবে দেখতে পারে না। তারা অনুভব করে যে, সৌন্দর্য যদিও বস্তুকে অবলম্বন করে প্রকাশ পায়, কিন্তু তা যেন বস্তুর অতীত, তার মধ্যে যেন একটা মনের ধর্ম আছে। এইজন্য মনে হয় সৌন্দর্যে যেন একটা ইচ্ছাশক্তি, একটা আনন্দ, একটা আত্মা আছে। ফুলের আত্মা যেন সৌন্দর্যে বিকশিত প্রফুল্ল হয়ে ওঠে, জগতের আত্মা যেন অপার বহিঃসৌন্দর্যে আপনাকে প্রকাশ করে। অন্তরের অসীমতা যেখানে বাহিরে আপনাকে প্রকাশ করতে পেরেছে সেইখানেই যেন সৌন্দর্য; সেই প্রকাশ যেখানে যত অসম্পূর্ণ সেইখানে তত সৌন্দর্যের অভাব, রূঢ়তা, জড়তা, চেষ্টা, দ্বিধা ও সর্বাঙ্গীণ অসামঞ্জস্য।

সে যাই হোক, সামান্যত ফুলের মধ্যে আমাদের সম্পূর্ণ আত্মপরি-তৃপ্তি জন্মে না। এইজন্য কেবল ফুলের বর্ণনামাত্র সাহিত্যে সর্বোচ্চ সমাদর পেতে পারে না। আমরা যে কবিতায় একত্রে যত অধিক চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ করি তাকে ততই উচ্চশ্রেণীর কবিতা বলে সম্মান করি। সাধারণতঃ যে জিনিসে আমাদের একটিমাত্র বা অল্পসংখ্যক চিত্তবৃত্তির তৃপ্তি হয় কবি যদি তাকে এমনভাবে দাঁড় করাতে পারেন যাতে তার দ্বারা আমাদের অধিকসংখ্যক চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয় তবে কবি

আমাদের আনন্দের একটি নূতন উপায় আবিষ্কার করে দিলেন বলে তাঁকে সাধুবাদ দিই। বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে আত্মার সৌন্দর্য সংযোগ করে দিয়ে কবি ওআর্ড্‌স্‌ওআর্থ্‌ এই কারণে আমাদের নিকট এত সম্মানাস্পদ হয়েছেন। ওআর্ড্‌স্‌ওআর্থ যদি সমস্ত জগৎকে অন্ধ যন্ত্রের ভাবে মনে করে কাব্য লিখতেন, তা হলে তিনি যেমনই ভালো ভাষায় লিখুন-না কেন, সাধারণ মানবহৃদয়কে বহুকালের জন্যে আকর্ষণ করে রেখে দিতে পারতেন না। জগৎ জড় যন্ত্র কিম্বা আধ্যাত্মিক বিকাশ এ দুটো মতের মধ্যে কোন্‌টা সত্য সাহিত্য তা নিয়ে তর্ক করে না; কিন্তু এই দুটো ভাবের মধ্যে কোন্‌ ভাবে মানুষের স্থায়ী এবং গভীর আনন্দ সেই সত্যটুকুই কবির সত্য, কাব্যের সত্য।

কিন্তু, যতদূর মনে পড়ে, আমার প্রথম পত্রে এ সত্য সম্বন্ধে আমি কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করি নি। কী বলেছি মনে নেই, কিন্তু যা বলতে চেয়েছিলুম তা হচ্ছে এই যে, যদি কোনো দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সত্যকে সাহিত্যের অন্তর্গত করতে চাই তবে তাকে আমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা আমাদের সন্দেহ বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত ক'রে আমাদের মানসিক প্রাণপদার্থের মধ্যে নিহিত করে দিতে হবে; নইলে, যতক্ষণ তাকে স্বপ্রকাশ সত্যের আকারে দেখাই ততক্ষণ তার অন্য নাম। যেমন নাইট্রোজেন তার আদিম আকারে বাষ্প, উদ্ভিদ অথবা জন্তুশরীরে রূপান্তরিত হলে তবেই সে আমাদের খাদ্য, তেমনি সত্য যখন মানব-জীবনের সঙ্গে মিশে যায় তখনই সাহিত্যে ব্যক্ত হতে পারে।

কিন্তু আমি যদি বলে থাকি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যের উপযোগিতা নেই তবে সেটা অত্যুক্তি। আমার বলবার অভিপ্রায় এই যে, সাহিত্যের উপযোগিতা সব চেয়ে বেশি। বসন না হলেও চলে (অবশ্য লোকে অসভ্য বলবে), কিন্তু অশন না হলে চলে না। হার্বার্ট্‌ স্পেন্‌সর উল্টো বলেন। তিনি বলেন সাহিত্য বসন এবং বিজ্ঞান অশন।

বিজ্ঞানশিক্ষা আমাদের প্রাণরক্ষা এবং জীবনযাত্রার অনেক সাহায্য করে স্বীকার করি, কিন্তু সে সাহায্য আমরা পরের কাছ থেকে নিতে পারি। ডাক্তারের কাছ থেকে স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ, কেমিস্টের কাছ থেকে ওষুধপত্র, যান্ত্রিকের কাছ থেকে যন্ত্র আমরা মূল্য দিয়ে নিতে পারি। কিন্তু সাহিত্য থেকে যা পাওয়া যায় তা আর-কারো কাছ থেকে ধার করে কিম্বা কিনে নিতে পারি নে। সেটা আমাদের সমস্ত প্রকৃতি দিয়ে আকর্ষণ করে নিতে হয়, সেটা আমাদের সমস্ত মনুষ্যত্বের পুষ্টি সাধন করে। আমাদের চতুর্দিগ্‌বর্তী মনুষ্যসমাজ তার সমগ্র উত্তাপ প্রয়োগ করে আমাদের প্রত্যেককে প্রতিক্ষণে ফুটিয়ে তুলছে, কিন্তু এই মানব-সমাজের বিচিত্র জটিল ক্রিয়া আমরা হিসাব করে পরিষ্কার জমাখরচের মধ্যে ধরে নিতে পারি নে; অথচ একজন ডাক্তার আমার যে উপকারটা করে তা খুব স্পষ্ট ধারণাগম্য। এইজন্যে হঠাৎ মনে হতে পারে, মনুষ্য-সমাজ আমাদের বিশেষ কিছু করে না, ডাক্তার তার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করে। কিন্তু সমাজের অন্যান্য সহস্র উপকার ছেড়ে দিয়ে, কেবলমাত্র তার সান্নিধ্য, মনুষ্যসাধারণের একটা আকর্ষণ, চারি দিকের হাসিকান্না ভালোবাসা বাক্যালাপ না পেলে আমরা যে মানুষ হতে পারতুম না সেটা আমরা ভুলে যাই। আমরা ভুলে যাই সমাজ নানারকম দুষ্পাচ্য কঠিন আহারকে পরিপাক করে সেটাকে জীবনরসে পরিণত করে আমাদের প্রতিনিয়ত পান করাচ্ছে। সাহিত্য সেইরকম মানসিক সমাজ। সাহিত্যের মধ্যে মানুষের হাসিকান্না, ভালোবাসা, বৃহৎ মনুষ্যের সংসর্গ এবং উত্তাপ, বহুজীবনের অভিজ্ঞতা, বহুবর্ষের স্মৃতি, সবসুদ্ধ মানুষের একটা ঘনিষ্ঠতা, পাওয়া যায়। সেইটেতে বিশেষ কী উপকার করে পরিষ্কার করে বলা শক্ত; এই পর্যন্ত বলা যায়, আমাদের সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বকে পরিস্ফুট করে তোলে।

প্রত্যেক মানুষের পক্ষে মানুষ হওয়া প্রথম দরকার। অর্থাৎ, মানুষের

সঙ্গে মানুষের যে লক্ষ লক্ষ সম্পর্কসূত্র আছে, যার দ্বারা প্রতিনিয়ত আমরা শিকড়ের মতো বিচিত্র রসাকর্ষণ করছি, সেইগুলোর জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তোলা, তার নূতন নূতন ক্ষমতা আবিষ্কার করা, চিরস্থায়ী মনুষ্যত্বের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগ-সাধন করে ক্ষুদ্র মানুষকে বৃহৎ করে তোলা— সাহিত্য এমনি করে আমাদের মানুষ করছে। সাহিত্যের শিক্ষাতেই আমরা আপনাকে মানুষের এবং মানুষকে আপনার বলে অনুভব করছি। তার পরে আমরা ডাক্তারি শিখে মানুষের চিকিৎসা করি, বিজ্ঞান শিখে মানুষের মধ্যে জ্ঞান প্রচার করতে প্রাণপণ করি। গোড়ায় যদি আমরা মানুষকে ভালোবাসতে না শিখতুম তা হলে সত্যকে তেমন ভালোবাসতে পারতুম কিনা সন্দেহ। অতএব সাহিত্য যে সব-গোড়াকার শিক্ষা এবং সাহিত্য যে চিরকালের শিক্ষা আমার তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।

এই তো গেল মোট কথাটা। ইংরিজি ম্যাগাজিন সম্বন্ধে তুমি যা বলেছ সে কথা ঠিক। তাদের নিতান্ত দরকারি কথা এত বেশি বেড়ে গেছে যে রসালাপের আর বড়ো সময় নেই। বিশেষত সাময়িক পত্রে সাময়িক জীবনের সমালোচনাই যুক্তিসংগত; চিরস্থায়ী সাহিত্যকে ওরকম একটা পত্রিকার প্রবাহের মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া ঠিক শোভা পায় কিনা বলা শক্ত।

কিন্তু বড়ো লেখা যে বড়ো বেশি বাড়ছে সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই। আজকাল ইংরিজিতে বেশ একটু আঁটসাঁট ছিপ্‌ছিপে লেখা দেখলে আশ্চর্য বোধ হয়। ওরা বোধ হয় সময় পায় না। কাজের অতিরিক্ত প্রাচুর্যে ওদের সাহিত্য যেন অপরিচ্ছন্ন মোটাসোটা ঢিলেঢালা প্রৌঢ়া গিন্নির মতো আকার ধারণ করেছে। হৃদয়ের গাঢ়তা আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে সৌন্দর্যের হ্রাস এবং বলের শৈথিল্য প্রকাশ পায়। যত বয়স বাড়ছে ওরা ততই যেন ওদের আদিম জর্মানিক প্রকৃতির দিকে ঝুঁকছে। আমার একটা অন্ধ সংস্কার আছে যে, সত্যকে যে অবস্থায় যতদূর পাওয়া সম্ভব

তাকে তার চেয়ে ঢের বেশি পাবার চেষ্টা করে জর্মানেরা তার চার দিকে বিস্তর মিথ্যা স্তূপাকার করে তোলে। ইংরাজেরও হয়তো সে রোগের কিঞ্চিৎ অংশ আছে। বলা বাহুল্য, এটা আমার একটা প্রাইভেট প্রগল্‌ভতা মাত্র ; গম্ভীরভাবে প্রতিবাদযোগ্য নয়।

বৈশাখ ১২৯৯

সাহিত্যের প্রাণ

একটিমাত্র গাছকে প্রকৃতি বলা যায় না। তেমনি কোনো একটিমাত্র বর্ণনাকে যদি সাহিত্য বলে ধর তা হলে আমার কথাটা বোঝানো শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। বর্ণনা সাহিত্যের অন্তর্গত সন্দেহ নেই, কিন্তু তার দ্বারা সাহিত্যকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। একটিমাত্র সূর্যাস্তবর্ণনার মধ্যে লেখকের জীবনাংশ এত অল্প থাকতে পারে যে, হয়তো সেটুকু বোধগম্য হওয়া দুরূহ। কিন্তু উপরি-উপরি অনেকগুলি বর্ণনা দেখলে লেখকের মর্মগত ভাবটুকু আমরা ধরতে পারতুম। আমরা বুঝতে পারতুম লেখক বাহ্য-প্রকৃতির মধ্যে একটা আত্মার সংস্রব দেখেন কিনা; প্রকৃতিকে তিনি মানবসংসারের চারিপার্শ্ববর্তী দেয়ালের ছবির মতো দেখেন না মানব-সংসারকে এই প্রকাণ্ড রহস্যময়ী প্রকৃতির একান্তবর্তীস্বরূপ দেখেন— কিম্বা মানবের সহিত প্রকৃতি মিলিত হয়ে, প্রাত্যহিক সহস্র নিকটসম্পর্কে বদ্ধ হয়ে, তাঁর সম্মুখে একটি বিশ্বব্যাপী গার্হস্থ্য দৃশ্য উপস্থিত করে।

সেই তত্ত্বটুকুকে জানানোই যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য তা নয়, কিন্তু সে অলক্ষিত ভাবে আমাদের মনের উপর কার্য করে— কখনো বেশি সুখ দেয়, কখনো অল্প সুখ দেয়; কখনো মনের মধ্যে একটা বৃহৎ বৈরাগ্যের আভাস আনে, কখনো বা অনুরাগের প্রগাঢ় আনন্দ উদ্রেক করে। সন্ধ্যার বর্ণনায় কেবল যে সূর্যাস্তের আভা পড়ে তা নয়, তার সঙ্গে লেখকের মানবহৃদয়ের আভা কখনো ম্লান শ্রান্তির ভাবে কখনো গভীর শান্তির ভাবে স্পষ্টত অথবা অস্পষ্টত মিশ্রিত থাকে এবং সেই আমাদের হৃদয়কে অনুরূপ ভাবে রঞ্জিত করে তোলে। নতুবা, তুমি যেরকম বর্ণনার কথা বলেছ সেরকম বর্ণনা ভাষায় অসম্ভব। ভাষা কখনোই রেখাবর্ণময় চিত্রের মতো অমিশ্র অবিকল প্রতিরূপ আমাদের সম্মুখে আনয়ন করতে পারে না।

বলা বাহুল্য, যেমন-তেমন লেখকের যেমন-তেমন বিশেষত্বই যে আমরা প্রার্থনীয় জ্ঞান করি তা নয়। মনে করো, পথ দিয়ে মস্ত একটা উৎসবের যাত্রা চলেছে। আমার এক বন্ধুর বারান্দা থেকে তার একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ দেখতে পাই, আর-এক বন্ধুর বারান্দা থেকে বৃহৎ অংশ এবং প্রধান অংশ দেখতে পাই— আর-এক বন্ধু আছেন তাঁর দোতালায় উঠে যে দিক থেকেই দেখতে চেষ্টা করি কেবল তাঁর নিজের বারান্দাটুকুই দেখি। প্রত্যেক লোক আপন আপন বিশেষত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে জগতের এক-একটা দৃশ্য দেখছে— কেউ বা বৃহৎ ভাবে দেখছে, কেউ বা কেবল আপনাকেই দেখছে। যে আপনাকে ছাড়া আর-কিছুই দেখাতে পারে না সাহিত্যের পক্ষে সে বাতায়নহীন অন্ধকার কারাগার মাত্র।

কিন্তু এ উপমায় আমার কথাটা পুরো বলা হল না এবং ঠিকটি বলা হল না। আমার প্রধান কথাটা এই— সাহিত্যের জগৎ মানেই হচ্ছে মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশ্রিত জগৎ। সূর্যাস্তকে তিন রকম ভাবে দেখা যাক। বিজ্ঞানের সূর্যাস্ত, চিত্রের সূর্যাস্ত এবং সাহিত্যের সূর্যাস্ত। বিজ্ঞানের সূর্যাস্ত হচ্ছে নিছক সূর্যাস্ত ঘটনাটি; চিত্রের সূর্যাস্ত হচ্ছে কেবল সূর্যের অন্তর্ধানমাত্র নয়, জল স্থল আকাশ মেঘের সঙ্গে মিশ্রিত করে সূর্যাস্ত দেখা; সাহিত্যের সূর্যাস্ত হচ্ছে সেই জল স্থল আকাশ মেঘের মধ্যবর্তী সূর্যাস্তকে মানুষের জীবনের উপর প্রতিফলিত করে দেখা— কেবলমাত্র সূর্যাস্তের ফোটোগ্রাফ তোলা নয়, আমাদের মর্মের সঙ্গে তাকে মিশ্রিত করে প্রকাশ। যেমন, সমুদ্রের জলের উপর সন্ধ্যাকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে একটা অপরূপ সৌন্দর্যের উদ্ভব হয়, আকাশের উজ্জ্বল ছায়া জলের স্বচ্ছ তরলতার যোগে একটা নূতন ধর্ম প্রাপ্ত হয়, তেমনি জগতের প্রতিবিম্ব মানবের জীবনের মধ্যে পতিত হয়ে সেখান থেকে প্রাণ ও হৃদয়বৃত্তি লাভ করে। আমরা প্রকৃতিকে আমাদের নিজের সুখদুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা দান করে একটা নূতন কাণ্ড করে তুলি; অভ্রভেদী জগৎসৌন্দর্যের মধ্যে

একটা অমর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি— এবং তখনই সে সাহিত্যের উপযোগিতা প্রাপ্ত হয়।

প্রাকৃতিক দৃশ্যে দেখা যায়, সূর্যোদয় সূর্যাস্ত সর্বত্র সমান বৈচিত্র্য ও বিকাশ লাভ করে না। বাঁশতলার পানাপুকুর সকলপ্রকার আলোকে কেবল নিজেকেই প্রকাশ করে, তাও পরিষ্কাররূপে নয়, নিতান্ত জটিল আবিল অপরিচ্ছন্নভাবে; তার এমন স্বচ্ছতা এমন উদারতা নেই যে, সমস্ত প্রভাতের আকাশকে সে আপনার মধ্যে নূতন ও নির্মল করে দেখাতে পারে। সুইজর্‌ল্যাণ্ডের শৈলসরোবর সম্বন্ধে আমার চেয়ে তোমার অভিজ্ঞতা বেশি আছে, অতএব তুমিই বলতে পার সেখানকার উদয়াস্ত কিরকম অনির্বচনীয়-শোভাময়। মানুষের মধ্যেও সেইরকম আছে। বড়ো বড়ো লেখকেরা নিজের উদারতা -অনুসারে সকল জিনিসকে এমন করে প্রতিবিম্বিত করতে পারে যে, তার কতখানি নিজের কতখানি বাহিরের, কতখানি বিম্বের কতখানি প্রতিবিম্বের, নির্দিষ্টরূপে প্রভেদ করে দেখানো কঠিন হয়। কিন্তু সংকীর্ণ কুনো কল্পনা যাকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করুক-না কেন নিজের বিশেষ আকৃতিটাকেই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

অতএব লেখকের জীবনের মূলতত্ত্বটি যতই ব্যাপক হবে, মানবসমাজ এবং প্রকৃতির প্রকাণ্ড রহস্যকে যতই সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ সিদ্ধান্তে টুকরো টুকরো করে না ভেঙে ফেলবে, আপনার জীবনের দশ দিক উন্মুক্ত করে নিখিলের সমগ্রতাকে আপনার অন্তরের মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে একটি বৃহৎ চেতনার সৃষ্টি করবে, ততই তার সাহিত্যের প্রকাণ্ড পরিধির মধ্যে তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দুটি অদৃশ্য হয়ে যাবে। সেইজন্যে মহৎ রচনার মধ্যে একটি বিশেষ মত একটি ক্ষুদ্র ঐক্য খুঁজে বার করা দায়; আমরা ক্ষুদ্র সমালোচকেরা নিজের ঘর-গড়া মত দিয়ে যদি তাকে ঘিরতে চেষ্টা করি তা হলে পদে পদে তার মধ্যে স্বতোবিরোধ বেধে যায়। কিন্তু একটা অত্যন্ত দুর্গম কেন্দ্রস্থানে তার একটা বৃহৎ মীমাংসা বিরাজ করছে, সেটি

হচ্ছে লেখকের মর্মস্থান— অধিকাংশ স্থলেই লেখকের নিজের পক্ষেও সেটি অনাবিষ্কৃত রাজ্য। শেক্‌স্‌পীয়রের লেখার ভিতর থেকে তাঁর একটা বিশেষত্ব খুঁজে বার করা কঠিন এইজন্যে যে, তাঁর সেটা অত্যন্ত বৃহৎ বিশেষত্ব। তিনি জীবনের যে মূলতত্ত্বটি আপনার অন্তরের মধ্যে সৃজন করে তুলেছেন তাকে দুটি-চারটি সুসংলগ্ন মতপাশ দিয়ে বদ্ধ করা যায় না। এইজন্যে ভ্রম হয় তাঁর রচনার মধ্যে যেন একটি রচয়িতৃ-ঐক্য নেই।

কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেইটে যে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা চাই আমি তা বলি নে ; কিন্তু সে যে অন্তঃপুরলক্ষ্মীর মতো অন্তরালে থেকে আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে সাহিত্যরস বিতরণ করবে তার আর সন্দেহ নেই।

যেমন করেই দেখি, আমরা মানুষকেই চাই, সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষ-ভাবে। মানুষের সম্বন্ধে কাটাছেঁড়া তত্ত্ব চাই নে, মূল মানুষটিকেই চাই। তার হাসি চাই, তার কান্না চাই ; তার অনুরাগ বিরাগ আমাদের হৃদয়ের পক্ষে রৌদ্রবৃষ্টির মতো।

কিন্তু এই হাসিকান্না অনুরাগবিরাগ কোথা থেকে উঠছে? ফল্‌স্টাফ ও ডগ্‌বেরি থেকে আরম্ভ করে লিয়র ও হ্যাম্‌লেট পর্যন্ত শেক্‌স্‌পীয়র যে মানবলোক সৃষ্টি করেছেন সেখানে মনুষ্যত্বের চিরস্থায়ী হাসি-অশ্রুর গভীর উৎসগুলি কারও অগোচর নেই। একটা সোসাইটি-নভেলের প্রাত্যহিক কথাবার্তা এবং খুচরো হাসিকান্নার চেয়ে আমরা শেক্‌স্‌পীয়রের মধ্যে বেশি সত্য অনুভব করি। যদিচ সোসাইটি-নভেলে যা বর্ণিত হয়েছে তা আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অবিকল অনুরূপ চিত্র। কিন্তু আমরা জানি আজকের সোসাইটি-নভেল কাল মিথ্যা হয়ে যাবে, শেক্‌স্‌পীয়র কখনো মিথ্যা হবে না। অতএব একটা সোসাইটি-নভেল যতই চিত্রবিচিত্র করে রচিত হোক, তার ভাষা এবং রচনাকৌশল যতই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হোক, শেক্‌স্‌পীয়রের একটা নিকৃষ্ট নাটকের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। সোসাইটি-নভেলে বর্ণিত প্রাত্যহিক সংসারের যথাযথ বর্ণনার অপেক্ষা শেক্‌স্‌পীয়রে বর্ণিত প্রতি-

দিন-দুর্লভ প্রবল হৃদয়াবেগের বর্ণনাকে আমরা কেন বেশি সত্য মনে করি সেইটে স্থির হলে সাহিত্যের সত্য কাকে বলা যায় পরিষ্কার বোঝা যাবে।

শেক্‌স্‌পীয়রে আমরা চিরকালের মানুষ এবং আসল মানুষটিকে পাই, কেবল মুখের মানুষটি নয়। মানুষকে একেবারে তার শেষ পর্যন্ত আলোড়িত করে শেক্‌স্‌পীয়র তার সমস্ত মনুষ্যত্বকে অবারিত করে দিয়েছেন। তার অশ্রুজল চোখের প্রান্তে ঈষৎ বিগলিত হয়ে রুমালের প্রান্তে শুষ্ক হচ্ছে না, তার হাসি ওষ্ঠাধরকে ঈষৎ উদ্ভিন্ন করে কেবল মুক্তাদন্তগুলিকে মাত্র বিকাশ করছে না— কিন্তু বিদীর্ণ প্রকৃতির নির্ঝরের মতো অবাধে ঝরে আসছে, উচ্ছ্বসিত প্রকৃতির ক্রীড়াশীল উৎসের মতো প্রমোদে ফেটে পড়ছে। তার মধ্যে একটা উচ্চ দর্শনশিখর আছে যেখান থেকে মানবপ্রকৃতির সর্বাপেক্ষা ব্যাপক দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

গোতিয়ের গ্রন্থ সম্বন্ধে আমি যা বলেছিলুম সে হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত। গোতিয়ে যেখানে তাঁর রচনার মূল পত্তন করেছেন সেখান থেকে আমরা জগতের চিরস্থায়ী সত্য দেখতে পাই নে। যে সৌন্দর্য মানুষের ভালোবাসার মধ্যে চিরকাল বদ্ধমূল, যার শ্রান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, যে সৌন্দর্য ভালোবাসার লোকের মুখ থেকে প্রতিফলিত হয়ে জগতের অনন্ত গোপন সৌন্দর্যকে অবারিত করে দেয়, মানুষ চিরকাল যে সৌন্দর্যের কোলে মানুষ হয়ে উঠছে, তার মধ্যে আমাদের স্থাপন না করে তিনি আমাদের একটা ক্ষণিক মায়ামরীচিকার মধ্যে নিয়ে গেছেন; সে মরীচিকা যতই সম্পূর্ণ ও সুনিপুণ হোক, ব্যাপক নয়, স্থায়ী নয়, এইজন্যই সত্য নয়। সত্য নয় ঠিক নয়, অল্প সত্য। অর্থাৎ সেটা একরকম বিশেষ প্রকৃতির বিশেষ লোকের বিশেষ অবস্থার পক্ষে সত্য, তার বাইরে তার আমল নেই। অতএব মনুষ্যত্বের যতটা বেশি অংশ অধিকার করতে পারবে সাহিত্যের সত্য ততটা বেশি বেড়ে যাবে।

কিন্তু অনেকে বলেন, সাহিত্যে কেবল একমাত্র সত্য আছে, সেটা

হচ্ছে প্রকাশের সত্য। অর্থাৎ, যেটি ব্যক্ত করতে চাই সেটি প্রকাশ করবার উপায়গুলি অযথা হলেই সেটা মিথ্যা হল এবং যথাযথ হলেই সত্য হল।

এক হিসাবে কথাটা ঠিক। প্রকাশটাই হচ্ছে সাহিত্যের প্রথম সত্য। কিন্তু ওইটেই কি শেষ সত্য ?

জীবরাজ্যের প্রথম সত্য হচ্ছে প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম্‌, কিন্তু শেষ সত্য মানুষ। প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম্‌ মানুষের মধ্যে আছে, কিন্তু মানুষ প্রটোপ্ল্যাজ্‌মের মধ্যে নেই। এখন এক হিসাবে প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম্‌কে জীবের আদর্শ বলা যেতে পারে, এক হিসাবে মানুষকে জীবের আদর্শ বলা যায়।

সাহিত্যের আদিম সত্য হচ্ছে প্রকাশমাত্র, কিন্তু তার পরিণাম-সত্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় মন এবং আত্মার সমষ্টিগত মানুষকে প্রকাশ। ছেলেভুলানো ছড়া থেকে শেক্‌স্‌পীয়রের কাব্যের উৎপত্তি। এখন আমরা আদিম আদর্শকে দিয়ে সাহিত্যের বিচার করি নে, পরিণাম-আদর্শ দিয়েই তার বিচার করি। এখন আমরা কেবল দেখি নে প্রকাশ পেলে কিনা, দেখি কতখানি প্রকাশ পেলে। দেখি, যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তাতে কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয় না ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির তৃপ্তি হয়, না ইন্দ্রিয় বুদ্ধি এবং হৃদয়ের তৃপ্তি হয়। সেই অনুসারে আমরা বলি, অমুক লেখায় বেশি অথবা অল্প সত্য আছে, কিন্তু এটা স্বীকার্য যে প্রকাশ পাওয়াটা সাহিত্যমাত্রেরই প্রথম এবং প্রধান আবশ্যক। বরঞ্চ ভাবের গৌরব না থাকলেও সাহিত্য হয়, কিন্তু প্রকাশ না পেলে সাহিত্য হয় না। বরঞ্চ মুড়োগাছও গাছ, কিন্তু বীজ গাছ নয়।

আমার পূর্বপত্রে এ কথাটাকে বোধ হয় তেমন আমল দিই নি। তোমার প্রতিবাদেই আমার সমস্ত কথা ক্রমে একটা আকার ধারণ করে দেখা দিচ্ছে।

কিন্তু যতই আলোচনা করছি ততই অধিক অনুভব করছি যে, সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ। তাই তুমি যদি একটা টুকরো

সাহিত্য তুলে নিয়ে বলো 'এর মধ্যে সমস্ত মানুষ কোথা' তবে আমি নিরুত্তর। কিন্তু সাহিত্যের অধিকার যতদূর আছে সবটা যদি আলোচনা করে দেখ তা হলে আমার সঙ্গে তোমার কোনো অনৈক্য হবে না। মানুষের প্রবাহ হু হু করে চলে যাচ্ছে; তার সমস্ত সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার সমস্ত জীবনের সমষ্টি আর-কোথাও থাকছে না— কেবল সাহিত্যে থাকছে। সংগীতে চিত্রে বিজ্ঞানে দর্শনে সমস্ত মানুষ নেই। এইজন্যই সাহিত্যের এত আদর। এইজন্যই সাহিত্য সর্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয় ভাণ্ডার। এইজন্যেই প্রত্যেক জাতি আপন আপন সাহিত্যকে এত বেশি অনুরাগ ও গর্বের সহিত রক্ষা করে।

আমার এক-একবার আশঙ্কা হচ্ছে তুমি আমার উপর চটে উঠবে— বলবে, লোকটাকে কিছুতেই তর্কের লক্ষ্যস্থলে আনা যায় না। আমি বাড়িয়ে-কমিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কেবল নিজের মতটাকে নানা রকম করে বলবার চেষ্টা করছি, প্রত্যেক পুনরুক্তিতে পূর্বের কথা কতকটা সম্মার্জন পরিবর্তন করে চলা যাচ্ছে— তাতে তর্কের লক্ষ্য স্থির রাখা তোমার পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু তুমি পূর্ব হতেই জান, খণ্ড খণ্ড ভাবে তর্ক করা আমার কাজ নয়। সমস্ত মোট কথাটা গুছিয়ে না উঠতে পারলে আমি জোর পাই নে। মাঝে মাঝে সুতীক্ষ্ণ সমালোচনায় তুমি যেখানটা ছিন্ন করছ সেখানকার জীর্ণতা সেরে নিয়ে দ্বিতীয়বার আগাগোড়া ফেঁদে দাঁড়াতে হচ্ছে।— তার উপরে আবার উপমার জ্বালায় তুমি বোধ হয় অস্থির হয়ে উঠেছ। কিন্তু আমার এ প্রাচীন রোগটিও তোমার জানা আছে। মনের কোনো একটা ভাব ব্যক্ত করবার ব্যাকুলতা জন্মালে আমার মন সেগুলোকে উপমার প্রতিমাকারে সাজিয়ে পাঠায়, অনেকটা বকাবকি বাঁচিয়ে দেয়। অক্ষরের পরিবর্তে হাইরোগ্লিফিক্‌স্‌ ব্যবহারের মতো। কিন্তু এরকম রচনাপ্রণালী অত্যন্ত বহুকেলে; মনের কথাকে সাক্ষাৎভাবে ব্যক্ত না করে প্রতিনিধিদ্বারা ব্যক্ত করা। এরকম করলে যুক্তিসংসারের আদান-

প্রদান পরিষ্কাররূপে চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। যা হোক, আগে থাকতে দোষ স্বীকার করছি, তাতে যদি তোমার মনস্তুষ্টি হয়।

তুমি লিখেছ, আমার সঙ্গে এ তর্ক তুমি মোকাবিলায় চোকাতে চাও। তা হলে আমার পক্ষে ভারী মুশকিল। তা হলে কেবল টুকরো নিয়েই তর্ক হয়, মোট কথাটা আজ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তোমাকে বোঝাতে পারি নে। নিজের অধিকাংশ মতের সঙ্গে নিজের প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকে না। তারা যদিচ আমার আচারে ব্যবহারে লেখায় নিজের কাজ নিজে করে যায়, কিন্তু আমি কি সকল সময়ে তাদের খোঁজ রাখি? এইজন্যে তর্ক উপস্থিত হলে বিনা নুটিসে অকস্মাৎ কাউকে ডাক দিয়ে সামনে তলব করতে পারি নে; নামও জানি নে, চেহারাও চিনি নে। লেখবার একটা সুবিধে এই যে, আপনার মতের সঙ্গে পরিচিত হবার একটা অবসর পাওয়া যায়; লেখার সঙ্গে সঙ্গে অমনি নিজের মতটাকে যেন স্পর্শদ্বারা অনুভব করে যাওয়া যায়— নিজের সঙ্গে নিজের নূতন পরিচয়ে প্রতি পদে একটা নূতন আনন্দ পাওয়া যায়, এবং সেই উৎসাহে লেখা এগোতে থাকে। সেই নূতন আনন্দের আবেগে লেখা অনেক সময় জীবন্ত ও সরস হয়। কিন্তু তার একটা অসুবিধাও আছে। কাঁচা পরিচয়ে পাকা কথা বলা যায় না। তেমন চেপে ধরলে ক্রমে কথার একটু-আধটু পরিবর্তন করতে হয়। চিঠিতে আস্তে আস্তে সেই পরিবর্তন করবার সুবিধা আছে। প্রতিবাদীর মুখের সামনে মতিস্থির থাকে না এবং অত্যন্ত জিদ বেড়ে যায়। অতএব মুখোমুখি না করে কলমে কলমেই ভালো।

আষাঢ় ১২৯৯

মানবপ্রকাশ

তুমি লিখছ যে, প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে তত্ত্বের প্রাদুর্ভাব ছিল না। তখন সাহিত্য অখণ্ডভাবে দেখা দিত, তাকে দ্বিধা বিভক্ত করে তার মধ্যে থেকে তত্ত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ত না। সেই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তুমি বলতে চাও যে, সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের মূলতত্ত্বের কোনো অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই, ওটা কেবল আকস্মিক সম্বন্ধ।

এর থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে, তোমাতে আমাতে কেবল ভাষা নিয়ে তর্ক চলছে। আমি যাকে মূলতত্ত্ব বলছি তুমি সেটা ঠিক গ্রহণ কর নি—এবং অবশেষে সেজন্য আমাকেই হয়তো ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। যদিও মূলতত্ত্ব শব্দটাকে বারম্বার ব্যাখ্যা করতে আমি ত্রুটি করি নি। এবারকার চিঠিতে ওই কথাটা পরিষ্কার করা যাক।

প্রাচীন কালের লোকেরা প্রকৃতিকে এবং সংসারকে যেরকম ভাবে দেখত আমরা ঠিক সে ভাবে দেখি নে। বিজ্ঞান এসে সমস্ত জগৎসংসারের মধ্যে এমন একটা দ্রাবক পদার্থ ঢেলে দিয়েছে যাতে করে সবটা ছিঁড়ে গিয়ে তার ক্ষীর এবং নীর, ছানা এবং মাখন স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। সুতরাং বিশ্ব সম্বন্ধে মানুষের মনের ভাব যে অনেকটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে তার আর সন্দেহ নেই; বৈদিক কালের ঋষি যে ভাবে উষাকে দেখতেন এবং স্তব করতেন আমাদের কালে উষা সম্বন্ধে সে ভাব সম্পূর্ণ সম্ভব নয়।

প্রাচীন কাল এবং বর্তমান কালে প্রধান প্রভেদ হচ্ছে এই যে, প্রাচীন কালে সর্বসাধারণের মধ্যে মতের এবং ভাবের একটা নিবিড় ঐক্য ছিল; গোলাপের কুঁড়ির মধ্যে তার সমস্ত পাপড়িগুলি যেমন আঁট বেঁধে একটিমাত্র সূচ্যগ্র বিন্দুতে আপনাকে উন্মুখ করে রেখে দেয় তেমনি। তখন জীবনের সমস্ত বিশ্বাস টুকরো টুকরো হয়ে যায় নি। তখনকার অখণ্ড-জীবনের মধ্যে দিয়ে সাহিত্য সূর্যকিরণের মতো শুভ্র নিরঞ্জনভাবে ব্যক্ত

হত। এখনকার বিদীর্ণ সমাজ এবং বিভক্ত মনুষ্যত্বের ভিতর দিয়ে সাহিত্যের শুভ্র সম্পূর্ণতা প্রকাশ পায় না। তার সাত রঙ ফেটে বার হয়েছে। ক্লাসিসিজ্‌ম্ এবং রোমান্টিসিজ্‌মের মধ্যে সেইজন্য প্রভেদ দাঁড়িয়ে গেছে। ক্লাসিক শুভ্র এবং রোমান্টিক পাঁচ-রঙা।

কিন্তু প্রাচীন পিতামহদের অবিশ্লিষ্ট মনে সংসারের সাত রঙ কেন্দ্রীভূত হয়ে যে এক-একটি সুসংহত শুভ্র মূর্তিরূপে প্রকাশ পেত তার একটা কারণ ছিল। তখন সন্দেহ প্রবল ছিল না।

সন্দেহের প্রথম কাজ হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করা। আদিম কালে বিশ্বাসের কনিষ্ঠ ভাই সন্দেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। সেইজন্যে তখন বিশ্বসংসার বিশ্বাস এবং সন্দেহের মধ্যে তুল্যাংশে ভাগ হয়ে যায় নি। কিম্বা সন্দেহ তখন এমনি নাবালক অবস্থায় ছিল যে, সংসারের প্রত্যেক জিনিসের উপর নিজের দাবি উত্থাপন করবার মতো তার বয়স ও বুদ্ধি হয় নি। বিশ্বাসের তখন একাধিপত্য ছিল। তার ফল ছিল এই যে, তখন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ভিন্নতা ছিল না। উষাকে আকাশকে চন্দ্রসূর্যকে আমরা আমাদের থেকে স্বতন্ত্র শ্রেণীর বলে মনে করতে পারতুম না। এমন-কি, যে-সকল প্রবৃত্তির দ্বারা আমরা চালিত হতুম, যারা মনুষ্যত্বের এক-একটি অংশমাত্র, তাদের প্রতিও আমরা স্বতন্ত্র পূর্ণ মনুষ্যত্ব আরোপ করতুম। এখন আমরা এই মনুষ্যত্ব আরোপ করাকে রূপক অলংকার বলে থাকি, কিন্তু তখন এটা অলংকারের স্বরূপ ছিল না। বিশ্বাসের সোনার কাঠিতে তখন সমস্তই জীবন্ত হয়ে জেগে উঠত। বিশ্বাস কোনোরকম খণ্ডতা সহ্য করতে পারে না। সে আপনার সৃজনশক্তির দ্বারা সমস্ত বিচ্ছেদ বিরোধ পূর্ণ ক'রে সমস্ত ছিদ্র আচ্ছাদন করে ঐক্য নির্মাণের জন্যে ব্যস্ত।

অনেকে বলেন পূর্বোক্ত কারণেই প্রাচীন সাহিত্যে বেশি মাত্রায় সাহিত্য-অংশ ছিল। অর্থাৎ, মানুষ তখন আপনাকেই সর্বত্র সৃজন করে

বসত। তখন মানুষ আপনারই সুখদুঃখ বিরাগ-অনুরাগ বিস্ময়-আনন্দে সমস্ত চরাচর অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল। আমি বরাবর বলে আসছি, মানুষের এই আত্মসৃজনপদ্ধতিই সাহিত্যের পদ্ধতি। অনেকের মতে পুরাকালে এইটে কিছু অধিক ছিল। তখন মানবকল্পনার স্পর্শমাত্রে সমস্ত জিনিস মানুষ হয়ে উঠত। এইজন্যই সাহিত্য অতি সহজেই সাহিত্য হয়ে উঠেছিল।

এখন বিজ্ঞান যতই প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাচ্ছে ততই প্রকৃতি প্রাকৃতভাবে আমাদের কাছে জাগ্রত হয়ে উঠছে। মানুষের সৃজনশক্তি সেখানে আপনার প্রাচীন অধিকার হারিয়ে চলে আসছে। নিজের যে-সকল হৃদয়বৃত্তি তার মধ্যে সঞ্চার করে দিয়েছিলুম সেগুলো ক্রমেই নিজের মধ্যে ফিরে আসছে। পূর্বে মানবত্বের যে অসীম বিস্তার ছিল, দ্যুলোকে ভূলোকে যে একই হৃৎস্পন্দন স্পন্দিত হত, এখন তা ক্রমশই সংকীর্ণ হয়ে ক্ষুদ্র মানবসমাজটুকুর মধ্যেই বদ্ধ হচ্ছে।

যাই হোক, মানবের আত্মপ্রকাশ তখনকার সাহিত্যেও ছিল, মানবের আত্মপ্রকাশ এখনকার সাহিত্যেও আছে। বরঞ্চ প্রাচীন সাহিত্যের দৃষ্টান্তেই আমার কথাটা অধিকতর পরিস্ফুট হয়।

কিন্তু 'তত্ত্ব' শব্দটা ব্যবহার করেই আমি বিষম মুশকিলে পড়েছি। যে মানসিক শক্তি আমাদের চেতনার অন্তরালে বসে কাজ করছে তাকে ঠিক তত্ত্ব নাম দেওয়া যায় না— যেটা আমাদের গোচর হয়েছে তাকেই তত্ত্ব বলা যেতে পারে—; সেই মানসিক পদার্থকে কেউ বা আংশিকভাবে জানে, কেউ বা জানে না অথচ তার নির্দেশানুসারে জীবনের সমস্ত কাজ করে যায়। সে জিনিসটা ভারী একটা মিশ্রিত জিনিস তত্ত্বের সিদ্ধান্তের মতো ছাঁটাছোঁটা চাঁচাছোলা আটঘাট-বাঁধা নয়। সেটা জ্ঞানের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, কল্পনার সঙ্গে একটা অবিচ্ছেদ্য মিশ্রণ। অন্তরের প্রকৃতি, বাহিরের জ্ঞান এবং আজন্মের সংস্কার আমাদের জীবনের মূলদেশে মিলিত

হয়ে একটি অপূর্ব ঐক্য লাভ করেছে ; সাহিত্য সেই অতিদুর্গম অন্তঃপুরের কাহিনী। সেই ঐক্যকে আমি মোটামুটি জীবনের মূলতত্ত্ব নাম দিয়েছি। কারণ, সেটা যদিও লেখক এবং সাহিত্যের দিক থেকে তত্ত্ব নয়, কিন্তু সমালোচকের দিক থেকে তত্ত্ব। যেমন জগতের কার্যপরম্পরা কতকগুলি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, কিন্তু বৈজ্ঞানিক যখনই তার নিত্যতা দেখতে পান তখনই তাকে 'নিয়ম' নাম দেন।

আমি যে মিলনের কথা বললুম সেটা যত মিলিত ভাবে থাকে মনুষ্যত্ব ততই অবিচ্ছিন্ন সুতরাং আত্মসম্বন্ধে অচেতন থাকে। সেগুলোর মধ্যে যখন বিরোধ উপস্থিত হয় তখনই তাদের পরস্পরের সংঘাতে পরস্পর সম্বন্ধে একটা স্বতন্ত্র চেতনা জন্মায়। তখনই বুঝতে পারি, আমার সংস্কার এক জিনিস, বাস্তবিক সত্য আর-এক জিনিস, আবার আমার কল্পনার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। তখন আমাদের একান্নবর্তী মানসপরিবারকে পৃথক করে দিই এবং প্রত্যেকের স্ব স্ব প্রাধান্য উপলব্ধি করি।

কিন্তু শিশুকালে যেখানে এরা একত্র জন্মগ্রহণ করে মানুষ হয়েছিল পৃথক হয়েও সেইখানে এদের একটা মিলনের ক্ষেত্র আছে। সাহিত্য সেই আনন্দসংগমের ভাষা। পূর্বের মতো সাহিত্যের সে আত্মবিস্মৃতি নেই ; কেননা এখনকার এ মিলন চিরমিলন নয়, এ বিচ্ছেদের মিলন। এখন আমরা স্বতন্ত্রভাবে বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস আলোচনা করি ; তার পরে এক সময়ে সাহিত্যের মধ্যে, মানসিক ঐক্যের মধ্যে, আনন্দ লাভ করি। পূর্বে সাহিত্য অবশ্যম্ভাবী ছিল, এখন সাহিত্য অত্যাবশ্যক হয়েছে। মনুষ্যত্ব বিভক্ত হয়ে গেছে, এইজন্যে সাহিত্যের মধ্যে সে আপনার পরিপূর্ণতার আস্বাদলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। এখনই সাহিত্যের বড়ো বেশি আবশ্যক এবং তার আদরও বেশি।

এখন এই পূর্ণমনুষ্যত্বের সংস্পর্শ সচরাচর কোথাও পাওয়া যায় না। সমাজে আমরা আপনাকে খণ্ডভাবে প্রকাশ করি। বাঁধাবাঁধি নিয়মের

মধ্যে যতটা দূর যাওয়া যায় তার বেশি অগ্রসর হতে পারি নে। চুটকি হাসি এবং খুচরো কথার মধ্যে আপনাকে আবৃত করে রাখি। মানুষ সামনে উপস্থিত হবামাত্রই আমরা এমনি সহজে স্বভাবতই আত্মসম্বৃত হয়ে বসি যে, একটা গুরুতর ঘটনার দ্বারা অকস্মাৎ অভিভূত না হলে কিম্বা একটা অতিপ্রবল আবেগের দ্বারা সর্ববিস্মৃত না হলে আমরা নিজের প্রকৃত আভাস নিজে পাই নে। শেক্‌স্‌পীয়রের সময়েও এরকম সব আকস্মিক ঘটনা এবং প্রবল আবেগ সচরাচর উদ্‌ভব হতে পারত এবং বিদ্যুৎ-আলোকে মানুষের সমগ্র আগাগোড়া এক পলকে দৃষ্টিগোচর হত; এখন সুসভ্য সুসংযত সমাজে আকস্মিক ঘটনা ক্রমশই কমে আসছে এবং প্রবল আবেগ সহস্র বাঁধে আটকা পড়ে পোষ-মানা ভাল্লুকের মতো নিজের নখদন্ত গোপন করে সমাজের মনোরঞ্জন করবার জন্যে কেবল নৃত্য করে— যেন সে সমাজের নট, যেন তার একটা প্রচণ্ড ক্ষুধা এবং রুদ্ধ আক্রোশ ওই বহুরোমশ আচ্ছাদনের নীচে নিশিদিন জ্বলছে না।

সাহিত্যের মধ্যে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে, জর্জ্‌ এলিয়টের নভেলে, সুকবিদের কাব্যে সেই প্রচ্ছন্ন মনুষ্যত্ব মুক্তিলাভ করে দেখা দেয়। তারই সংঘাতে আমাদের আগাগোড়া জেগে ওঠে; আমরা আমাদের প্রতিহত হাড়গোড়-ভাঙা ছাইচাপা অঙ্গহীন জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করি।

এইরূপ সুবৃহৎ অনাবরণের মধ্যে অশ্লীলতা নেই। এইজন্যে শেক্‌স্‌পীয়র অশ্লীল নয়, রামায়ণ মহাভারত অশ্লীল নয়। কিন্তু ভারতচন্দ্র অশ্লীল, জোলা অশ্লীল; কেননা তা কেবল আংশিক অনাবরণ।

আর-একটু খোলসা করে বলা আবশ্যক।

সাহিত্যে আমরা সমগ্র মানুষকে প্রত্যাশা করি। কিন্তু সব সময়ে সবটাকে পাওয়া যায় না, সমস্তটার একটা প্রতিনিধি পাওয়া যায়। কিন্তু প্রতিনিধি কাকে করা যাবে? যাকে সমস্ত মানুষ বলে মানতে আমাদের আপত্তি নেই। ভালোবাসা স্নেহ দয়া ঘৃণা ক্রোধ হিংসা এরা আমাদের

মানসিক বৃত্তি ; এরা যদি অবস্থানুসারে মানবপ্রকৃতির উপর একাধিপত্য লাভ করে তাতে আমাদের অবজ্ঞা অথবা ঘৃণার উদ্রেক করে না। কেননা এদের সকলেরই ললাটে রাজচিহ্ন আছে ; এদের মুখে একটা দীপ্তি প্রকাশ পায়। মানুষের ভালো এবং মন্দ সহস্র কাজে এরা আপনার চিহ্নাঙ্কিত রাজমোহর মেরে দিয়েছে। মানব-ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এদের সহস্রটা করে সই আছে। অথচ ঔদরিকতাকে যদি সাহিত্যের মধ্যে কোথাও রাজসিংহাসন দেওয়া যায় তবে তাকে কে মান্‌বে ? কিন্তু পেটুকতা কি পৃথিবীতে অসত্য ? সেটা কি আমাদের অনেকানেক মহৎবৃত্তির চেয়ে অধিকতর সাধারণব্যাপী নয় ? কিন্তু তাকে আমাদের সমগ্র মনুষ্যত্বের প্রতিনিধি করতে আমাদের একান্ত আপত্তি, এইজন্যে সাহিত্যে তার স্থান নেই। কিন্তু কোনো 'জ়োলা' যদি পেটুকতাকে তাঁর নভেলের বিষয় করেন এবং কৈফিয়ত দেবার বেলায় বলেন যে, পেটুকতা পৃথিবীতে একটা চিরসত্য, অতএব ওটা সাহিত্যের মধ্যে স্থান না পাবে কেন, তখন আমরা উত্তর দেব : সাহিত্যে আমরা সত্য চাই নে, মানুষ চাই।

যেমন পেটুকতা, অন্য অনেক শারীরিক বৃত্তিও তেমনি। তারা ঠিক রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় নয়, তারা শূদ্র দাস ; তারা দুর্বল দেশে মাঝে মাঝে রাজসিংহাসন হরণ করে নেয়, কিন্তু মানব-ইতিহাসে কখনো কোথাও কোনো স্থায়ী গৌরব লাভ করে নি— সমাজে তাদের চরম এভোল্যুশন হচ্ছে কেবল ফরাসি রান্না এবং ফরাসি নভেল।

সমগ্রতাই যদি সাহিত্যের প্রাণ না হত তা হলে জ়োলার নভেলে কোনো দোষ দেখতুম না। তার সাক্ষী, বিজ্ঞানে কোনো অশ্লীলতা নেই। সে খণ্ড জিনিসকে খণ্ড ভাবেই দেখায়। আর, সাহিত্য যখন মানবপ্রকৃতির কোনো-একটা অংশের অবতারণা করে তখন তাকে একটা বৃহতের, একটা সমগ্রের প্রতিনিধিস্বরূপে দাঁড় করায় ; এইজন্যে আমাদের মানস-

গ্রামের বড়ো বড়ো মোড়লগুলিকেই সে নির্বাচন করে নেয়।

কথাটা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের ঠিক সমরেখায় পড়ল কিনা জানি নে, কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা এর দ্বারা কতকটা পরিস্ফুট হবে বলেই এর অবতারণা করা গেছে।

অতএব আমার বক্তব্য এই যে, সাহিত্য মোট মানুষের কথা।

শেক্‌স্‌পীয়র এবং প্রাচীন কবিরা মানুষ দেখতে পেতেন এবং তাদের প্রতিকৃতি সহজে দিতে পারতেন। এখন আমরা এক-একটা অর্ধচেতন অবস্থায় নিজের অন্তস্তলে প্রবেশ করে গুপ্তমানুষকে দেখতে পাই। সচেতন হলেই চির-অভ্যাস-ক্রমে সে লুকিয়ে পড়ে। এইজন্যে আজকালকার লেখায় প্রায় লেখকের বিশেষত্বের মধ্যেই মনুষ্যত্ব দেখা দেয়। কিম্বা খণ্ড খণ্ড আভাসকে কল্পনাশক্তির দ্বারা জুড়ে এক করে গড়ে তুলতে হয়। অন্তররাজ্যও বড়ো জটিল হয়ে পড়েছে, পথও বড়ো গোপন। যাকে ইংরাজিতে ইন্‌স্‌পিরেশন বলে সে একটা মুগ্ধ অবস্থা; তখন লেখক একটা অর্ধচেতন শক্তির প্রভাবে কৃত্রিম জগতের শাসন অনেকটা অতিক্রম করে এবং মনুষ্যরাজার যেখানে খাস দরবার সেই মর্মসিংহাসনের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়।

কিন্তু নিজের সুখদুঃখের দ্বারাই হোক আর অন্যের সুখদুঃখের দ্বারাই হোক, প্রকৃতির বর্ণনা করেই হোক আর মনুষ্যচরিত্র গঠিত করেই হোক, মানুষকে প্রকাশ করতে হবে। আর-সমস্ত উপলক্ষ।

প্রকৃতিবর্ণনাও উপলক্ষ; কারণ, প্রকৃতি ঠিকটি কিরূপ তা নিয়ে সাহিত্যের কোনো মাথাব্যথাই নেই, কিন্তু প্রকৃতি মানুষের হৃদয়ে, মানুষের সুখদুঃখের চারি দিকে, কিরকম ভাবে প্রকাশিত হয় সাহিত্য তাই দেখায়। এমন-কি, ভাষা তা ছাড়া আর-কিছু পারে না। চিত্রকর যে রঙ দিয়ে ছবি আঁকে সে রঙের মধ্যে মানুষের জীবন মিশ্রিত হয় নি; কিন্তু কবি যে ভাষা দিয়ে বর্ণনা করে তার প্রত্যেক শব্দ আমাদের

হৃদয়ের দোলায় লালিত পালিত হয়েছে। তার মধ্যে থেকে সেই জীবনের মিশ্রণটুকু বাদ দিয়ে ভাষাকে জড় উপাদানে পরিণত করে নিছক বর্ণনাটুকু করে গেলে যে কাব্য হয় এ কথা কিছুতে স্বীকার করা যায় না।

সৌন্দর্যপ্রকাশও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, উপলক্ষ মাত্র। হ্যাম্‌লেটের ছবি সৌন্দর্যের ছবি নয়, মানবের ছবি; ওথেলোর অশান্তি সুন্দর নয়, মানবস্বভাবগত।

কিন্তু সৌন্দর্য কী গুণে সাহিত্যে স্থান পায় বলা আবশ্যক। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মানবহৃদয়ের একটা নিত্য মিশ্রণ আছে। তার মধ্যে প্রকৃতির জিনিস যতটা আছে তার চেয়ে মানবের চিত্ত বেশি। এইজন্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে মানব আপনাকেই অনুভব করে। প্রকৃতির সৌন্দর্য সম্বন্ধে যতই সচেতন হব প্রকৃতির মধ্যে আমারই হৃদয়ের ব্যাপ্তি তত বাড়বে।

কিন্তু কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্যই তো কবির বর্ণনার বিষয় নয়। প্রকৃতির ভীষণত্ব, প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা, সে তো বর্ণনীয়। কিন্তু সেও আমাদের হৃদয়ের জিনিস, প্রকৃতির জিনিস নয়। অতএব, এমন কোনো বর্ণনা সাহিত্যে স্থান পেতে পারে না যা সুন্দর নয়, শান্তিময় নয়, ভীষণ নয়, মহৎ নয়, যার মধ্যে মানবধর্ম নেই কিম্বা যা অভ্যাস বা অন্য কারণে মানবের সঙ্গে নিকটসম্পর্কে বদ্ধ নয়।

আমার বোধ হচ্ছে, আমার প্রথম চিঠিতে লেখকেরই নিজত্ব-প্রকাশের উপর এতটা ঝোঁক দিয়েছিলুম যে সেইটেই সাহিত্যের মূল লক্ষ্য এইরকম বুঝিয়ে গেছে। আমার সেই সামান্য আদিম অপরাধ তুমি কিছুতেই মার্জনা করতে পারছ না; তার পরে আমি যে কথাই বলি-না কেন তোমার মন থেকে সেটা আর যাচ্ছে না। আদম যেমন প্রথম পাপে তাঁর সমস্ত মানববংশ-সমেত স্বর্গচ্যুত হয়েছিলেন তেমনি আমার সেই প্রথম ত্রুটি ধরে আমার সমস্ত সংস্কার ও যুক্তি -পরম্পরাসুদ্ধ আমাকে

স্বতচ্যুত করবার চেষ্টায় আছ।

আমার বলা উচিত ছিল, লেখকের নিজত্ব নয়, মনুষ্যত্ব-প্রকাশই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। (আমার মনের মধ্যে নিদেন সেই কথাটাই ছিল।) কখনো নিজত্বদ্বারা কখনো পরত্বদ্বারা। কখনো স্বনামে কখনো বেনামে। কিন্তু একটা মনুষ্য-আকারে। লেখক উপলক্ষ মাত্র, মানুষই উদ্দেশ্য। আমার গোড়াকার চিঠিতে যদি এ কথা প্রকাশ হয়ে না থাকে তা হলে জেনো সেটা আমার অনিপুণতাবশত। একে তত্ত্ব, সাহিত্যের তত্ত্ব, তাতে আবার আমার মতো লোক তার ব্যাখ্যাকারক! কথা আছে একে বোবা, তাতে আবার বোলতায় কামড়েছে— একে গোঁ গোঁ করা বৈ আর-কিছু জানে না, তার উপরে কামড়ের জ্বালায় গোঁগাঁনি কেবল বাড়িয়ে তোলে।

আমি যে এই আলোচনা করছি, এ যেন মানসিক মৃগয়া করছি। একটা জীবন্ত জিনিসের পশ্চাতে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি; পদে পদে স্থান-পরিবর্তন করছি কখনো পর্বতের শিখরে, কখনো পর্বতের গুহায়। এইজন্য আমার সমস্ত আলোচনায় যদিও লক্ষ্যের ঐক্য আছে, কিন্তু হয়তো পথের অনৈক্য পাবে। কিন্তু সে-সমস্ত মার্জনা করে তুমিও যদি আমার সঙ্গে যোগ দাও, যদি আমার পাশাপাশি ছোট, তা হলে আমার মৃগটি যদি বা সম্পূর্ণ ধরা না পড়ে নিদেন তোমার দৃষ্টিগোচর হয়। অর্থাৎ আমার প্রার্থনা এই যে, আমি যদি তোমাকে বোঝাতে ভুল করে থাকি তুমি নিজে ঠিকটা বোঝো। অর্থাৎ আমি যদি তোমাকে মাছটা ধরে দিতে না পারি, আমার পুকুরটা ছেড়ে দিচ্ছি, তুমিও জাল ফেলো। কিন্তু কিছু উঠবে কি? সে কথা বলতে পারি নে— সে তোমার অদৃষ্ট কিম্বা আমার অদৃষ্ট যা'ই বল।

কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে আমার একটা নালিশ আছে। তুমি আমারই কথাটাকে কেবল খুঁটি ধরে টেনে টেনে বের করছ; নিজের কথাটিকে

বরাবর বেশ ঢেকেঢুকে সামলে রেখেছ। আমি যেন কেবল একটি জীবন্ত তলোয়ারের সঙ্গে লড়াই করছি— কেবল খোঁচা খাচ্ছি, কাউকে খোঁচা ফিরিয়ে দিতে পারছি নে। আমি বার বার যতই বুক ফুলিয়ে ফুলিয়ে দাঁড়াচ্ছি তোমার ততই আঘাত করবার সুবিধে হচ্ছে। কিন্তু এটাকে কি ন্যায়যুদ্ধ বলে ?

আমি ব্রাহ্মণ, কেবলমাত্র যুদ্ধের উৎসাহে আনন্দ পাই নে। আসল কথাটা কী তাই জানতে পারলেই চুপ করে যাই। আমি তো বলি সাহিত্যের উদ্দেশ্য সমগ্র মানুষকে গঠিত করে তোলা। তুমি কী বল ?

কিন্তু তুমি শুনছি কলকাতায় আসছ ; আমিও সেখানে যাচ্ছি। তা হলে তর্কটা মোকাবিলায় নিষ্পত্তি হবার সম্ভাবনা দেখছি। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে মোকাবিলায় নিষ্পত্তি কুইনাইন দিয়ে জ্বর ঠেকানোর মতো। হয়তো চট করে ছেড়ে যেতে পারে, নয় তো গুমরে গুমরে থেকে যায়— আবার কিছুদিন বাদে কেঁপে কেঁপে দেখা দেয়। ইতি

ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯

কাব্য

আজকাল যাঁহারা সমালোচনা করিতে বসেন তাঁহারা কাব্য হইতে একটা কিছু নূতন কথা বাহির করিতে চেষ্টা করেন। কবির ভাবের সহিত আপনার মনকে মিশাইবার চেষ্টা না করিয়া কোমর বাঁধিয়া খানাতল্লাশি করিতে উদ্যত হন। অনেক বাজে জিনিস হাতে ঠেকে, কিন্তু অনেক সময়েই আসল জিনিসটা পাওয়া যায় না।

কিন্তু তর্কই তাই, কে কোন্‌টাকে আসল জিনিস মনে করে। একটা প্রস্তরমূর্তির মধ্যে কেহ বা প্রস্তরটাকে আসল জিনিস মনে করিতে পারে, কেহ বা মূর্তিটাকে। সে স্থলে মীমাংসা করিতে হইলে বলিতে হয়, প্রস্তর তুমি নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে পারো, তাহার জন্য মূর্তি ভাঙিবার আবশ্যক নাই; কিন্তু এ মূর্তি আর কোথাও মিলিবে না। তেমনি কবিতা হইতে তত্ত্ব বাহির না করিয়া যাহারা সন্তুষ্ট না হয় তাহাদিগকে বলা যাইতে পারে, তত্ত্ব তুমি দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিতে পারো, কিন্তু কাব্যরসই কবিতার বিশেষত্ব।

এই কাব্যরস কী তাহা বলা শক্ত। কারণ, তাহা তত্ত্বের ন্যায় প্রমাণ-যোগ্য নহে, অনুভবযোগ্য। যাহা প্রমাণ করা যায় তাহা প্রতিপন্ন করা সহজ; কিন্তু যাহা অনুভব করা যায় তাহা অনুভূত করাইবার সহজ পথ নাই, কেবলমাত্র ভাষার সাহায্যে একটা সংবাদ জ্ঞাপন করা যায় মাত্র। কেবল যদি বলা যায় 'সুখ হইল' তবে একটা খবর দেওয়া হয়, সুখ দেওয়া হয় না।

যে-সকল কথা সর্বাপেক্ষা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে অথচ যাহা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা সর্বাপেক্ষা শক্ত তাহা লইয়াই মানবের প্রধান ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা পিঞ্জররুদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় যেন সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে চঞ্চলভাবে পক্ষ আন্দোলন করিতেছে। তত্ত্বপ্রচার করিয়া মানবের সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি নাই,

আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য তাহার হৃদয় সর্বদা ব্যগ্র হইয়া আছে। কাব্যের মধ্যে মানবের সেই আত্মপ্রকাশের চেষ্টা কথঞ্চিৎ সফলতা লাভ করে; কাব্যের মর্যাদাই তাই। একটি ক্ষুদ্র প্রেমের কবিতার মধ্যে কোনো তত্ত্বই নাই, কিন্তু চিরকালীন মানবপ্রকৃতির আত্মপ্রকাশ রহিয়া গেছে। এইজন্য মানব চিরকালই তাহার সমাদর করিবে। ছবি-গান-কাব্যে মানব ক্রমাগতই আপনার সেই চিরান্ধকারশায়ী আপনাকে গোপনতা হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছে। এইজন্যই একটা ভালো ছবি, ভালো গান, ভালো কাব্য পাইলে আমরা বাঁচিয়া যাই।

আত্মপ্রকাশের অর্থই এই, আমার কোন্‌টা কেমন লাগে তাহা প্রকাশ করা। কোন্‌টা কী তাহার দ্বারা বাহিরের বস্তু নিরূপিত হয়, আমার কোন্‌টা কেমন লাগে তাহার দ্বারা আমি নির্দিষ্ট হই। নক্ষত্র যে অগ্নিময় জ্যোতিষ্ক তাহা নক্ষত্রের বিশেষত্ব, কিন্তু নক্ষত্র যে রহস্যময় সুন্দর তাহা আমার আত্মার বিশেষত্ব-বশত। যখন আমি নক্ষত্রকে জ্যোতিষ্ক বলিয়া জানি তখন নক্ষত্রকেই জানি, কিন্তু যখন আমি নক্ষত্রকে সুন্দর বলিয়া জানি তখন নক্ষত্রলোকের মধ্যে আমার আপনার হৃদয়কেই অনুভব করি।

এইরূপে কাব্যে আমরা আমাদের বিকাশ উপলব্ধি করি। তাহার সহিত নূতন তত্ত্বের কোনো যোগ নাই। বাল্মীকি যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বাল্মীকির সময়েও একান্ত পুরাতন ছিল। রামের গুণ বর্ণনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন ভালো লোককে আমরা ভালোবাসি। কেবলমাত্র এই মান্ধাতার আমলের তত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য সাত-কাণ্ড রামায়ণ লিখিবার কোনো আবশ্যক ছিল না। কিন্তু ভালো যে কত ভালো, অর্থাৎ ভালোকে যে কত ভালো লাগে তাহা সাত-কাণ্ড রামায়ণেই প্রকাশ করা যায়; দর্শনে বিজ্ঞানে কিম্বা সুচতুর সমালোচনায় প্রকাশ করা যায় না।

হে বিষয়ী, হে সুবুদ্ধি, ক্ষুদ্র প্রেমের কবিতা দেখিয়া তুমি যে বিজ্ঞভাবে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছ, বলিতেছ 'উহার মধ্যে নূতন জ্ঞান কী আছে',

তোমাকে অনুরোধ করি, তুমি তোমার সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান লইয়া মানবের এই পুরাতন প্রেমকে এমনি উজ্জ্বল মধুর ভাবে ব্যক্ত করো দেখি। যাহা কিছুতে ধরা দিতে চায় না সে মন্ত্রবলে ইহার মধ্যে ধরা দিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি বিজ্ঞানে দর্শনে আমরা জগৎকে জানি, কাব্যে আমরা আপনাকে জানি। অতএব যদি কোনো কবিতায় আমরা কেবলমাত্র এইটুকু জানি যে, ফুল আমরা ভালোবাসি, আকাশের তারা আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করে, যে আমার প্রিয়জন সে আমার না-জানি কী— যদি তাহাতে জগতের ক্রমবিকাশ বা কোনো ধর্মমতের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোনো কথা না'ও থাকে— তথাপি তাহাকে অসম্মান করা যায় না।

যদি বল 'ইহার উপকার কী', ইহার উপকারও আছে। আমরা যতক্ষণ আপনাকে আপনার মধ্যে বদ্ধ করিয়া দেখি ততক্ষণ আপনাকে পূরা জানি না। যখন সেই অঙ্গনের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় তখনই আপন অধিকারের বিস্তার জানিতে পারি। যখনই একটি ক্ষুদ্র ফুল বাহিরে আমাকে টানিয়া লইয়া যায় তখনই আমি অসীমের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হই। আমার প্রিয় মুখ যখন আমাকে আহ্বান করে তখন সে আমাকে আমার ক্ষুদ্রতা হইতে আহ্বান করে; যতই অধিক ভালোবাসি ততই আমার ভালোবাসার প্রাবল্যের মধ্যে আপনার বিপুলতা বুঝিতে পারি। প্রেমের মধ্যে, সৌন্দর্যের মধ্যে হৃদয়ের বন্ধনমুক্তি হয়।

কিন্তু কাব্যপ্রসঙ্গে উপকারিতার কথা এইজন্য উত্থাপন করা যায় না যে, কাব্যের আনুষঙ্গিক ফল যাহাই হউক কাব্যের উদ্দেশ্য উপকার করিতে বসা নহে। যাহা সত্য যাহা সুন্দর তাহাতে উপকার হইবারই কথা, কিন্তু সেই উপকারিতার পরিমাণের উপর তাহার সত্যতা ও সৌন্দর্যের পরিমাণ নির্ভর করে না। সৌন্দর্য আমাদের উপকার করে বলিয়া সুন্দর নহে, সুন্দর বলিয়াই উপকার করে। উপকারিতাপ্রসঙ্গে

কবিতাকে বিচার করিতে বসিলে সর্বদাই ভ্রমের সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। কারণ, উপকার নানা উপায়ে হয়; কবিতার মধ্যে উপকার-অন্বেষণ যাহাদের স্বভাব তাহারা কাব্যের মধ্যে যে-কোনো উপকার পাইলেই চরিতার্থ হয়, বিচার করে না তাহা যথার্থ কাব্যের প্রকৃতিগত কিনা। এমন অনেক পাঠক দেখা গিয়াছে যাহারা ছন্দোবন্ধে অদৃষ্টবাদ অথবা অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে কোনো কথা পাইলেই আনন্দে ব্যাকুল হইয়া উঠে, মনে করে ইহাতে মানবের পরম উপকার হইতেছে। এবং তাহারা কোনো বিশেষ কবিতার সৌন্দর্য স্বীকার করিয়াও তাহার উপকারিতার অভাব লইয়া অপ্রসন্নতা প্রকাশ করিয়া থাকে। যেমন, ব্যবসায়ী লোক আক্ষেপ করে পৃথিবীর সমস্ত ফুলবাগান তাহার মূলার খেত হইল না কেন। সে স্বীকার করিবে ফুল সুন্দর বটে, কিন্তু কিছুতে বুঝিতে পারিবে না তাহাতে ফল কী আছে।

চৈত্র ১২৯৮

বাংলাসাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা

যাঁহারা অনেক ইংরাজি কেতাব পড়িয়াছেন তাঁহারা অনেকেই আধুনিক বাংলা লেখা ও লেখকদের প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। এইরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া তাঁহারা অনেকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। বোধ করি ইতর সাধারণ হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া অভিমানে তাঁহারা আপাদমস্তক কণ্টকিত হইয়া উঠেন। একটা কথা ভুলিয়া যান যে, পৃথিবীতে বড়ো হওয়া শক্ত, কিন্তু আপনাকে বড়ো মনে করা সকলের চেয়ে সহজ। সমযোগ্য লোককে দূরে পরিহার করিয়া অনেকে স্বকপোল-কল্পিত মহত্ত্বলাভ করে, কিন্তু প্রার্থনা করি এরূপ অজ্ঞানকৃত প্রহসন-অভিনয় হইতে আমাদের অন্তর্যামী আমাদিগকে সতত বিরত করুন।

বহুকাল হইতে বহুতর সামাজিক প্লাবনের সাহায্যে স্তর পড়িয়া ইংরাজি সাহিত্য উচ্চতা কঠিনতা এবং একটা নির্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের বাংলা সাহিত্যে সম্প্রতি পলি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার কোথাও জলা, কোথাও বালি, কোথাও মাটি। সুতরাং ইহার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যে যাহা ইচ্ছা বলিতে পারে, কাহারও প্রতিবাদ করিবার সাধ্য নাই। ইহার ইতিহাস নাই, আবহমান-কাল-প্রচলিত প্রবাহ নাই, বহুকালসঞ্চিত রত্নভাণ্ডার নাই, ইহার বিক্ষিপ্ত অংশগুলিকে এখনো এক সমালোচনার নিয়মে বাঁধিবার সময় হয় নাই। সুতরাং ইংরাজি সমালোচনা-গ্রন্থ হইতে মুখগহ্বর পূর্ণ করিয়া লইয়া যখন কোনো প্রবল প্রতিপক্ষ ইহার প্রতি মুহুর্মুহু ফুৎকার প্রয়োগ করিতে থাকেন তখন বঙ্গসাহিত্যের ক্ষীণ আশার আলোকটুকু একান্ত কম্পিত ও নির্বাপিতপ্রায় হইয়া আসে। কিন্তু তথাপি বলা যাইতে পারে, ফুৎকার যতই প্রবল হউক শীর্ণ দীপশিখা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বর্তমান বাংলালেখকেরা বঙ্গসাহিত্যের প্রথম ভিত্তি -নির্মাণে প্রবৃত্ত

আছেন। সুতরাং যাঁহারা ইংরাজি গ্রন্থস্তূপশিখরের উপর চড়িয়া নিম্নে দৃষ্টিপাত করেন তাঁহারা ইহাদিগকে ছোটো বলিয়া মনে করিতে পারেন। ইহারা মাটির উপরে দাঁড়াইয়া খাটিয়া মরিতেছেন, তাঁহারা উচ্চচূড়ায় বসিয়া কেবল হাওয়া খাইতেছেন; এরূপ স্থলে উভয়ের মধ্যে সমকক্ষতার ভাব রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়ে।

এই দুই দলের মধ্যে যদি প্রকৃত উচ্চনীচতা থাকে তবে আর কোনো কথাই নাই। কিন্তু তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাঁহারা শুদ্ধমাত্র পরের চিন্তালব্ধ ধন সঞ্চয় করিয়া জীবনযাপন করেন তাঁহারা জানেন না নিজে কোনো বিষয় আনুপূর্বিক চিন্তা করা এবং সেই চিন্তা ভাষায় ব্যক্ত করা কী কঠিন। অনেক বড়ো বড়ো কথা পরের মুখ হইতে পরিপক্ক ফলের মতো অতি সহজে পাড়িয়া লওয়া যায়, কিন্তু অতি ছোটো কথাটিও নিজে ভাবিয়া গড়িয়া তোলা বিষম ব্যাপার। যে ব্যক্তি কেবলমাত্র পাঠ করিয়া শিখিয়াছে, সঞ্চয় করা ছাড়া বিদ্যাকে আর কোনোপ্রকার ব্যবহারে লাগায় নাই, সে নিজে ঠিক জানে না সে কতটা জানে এবং কতটা জানে না।

যে শ্রেণীর সমালোচকের কথা বলিতেছি তাঁহারা যখন বাংলা পড়েন তখন মনে মনে বাংলাকে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া লন, সুতরাং সমালোচ্য গ্রন্থের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। বাংলাভাষার প্রাণের মধ্যে তাঁহারা প্রবেশ করেন নাই, প্রবেশ করিবার অবসর পান নাই। মাতৃভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে সকল সাহিত্যই ম্লান নির্জীব ভাব ধারণ করে, তখন তাহার প্রতি সমালোচনশর প্রয়োগ করা কেবল 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' দেওয়া মাত্র।

যাঁহারা বাংলা লেখেন তাঁহারাই বাংলা ভাষার বাস্তবিক চর্চা করেন; অগত্যাই তাঁহাদিগকে বাংলাচর্চা করিতে হয়। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ শ্রদ্ধা অবশ্যই আছে। বঙ্গভাষা রাজভাষা নহে, বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের ভাষা নহে, সম্মানলাভের ভাষা নহে, অর্থোপার্জনের ভাষা নহে, কেবলমাত্র মাতৃভাষা। যাঁহাদের হৃদয়ে ইহার প্রতি একান্ত অনুরাগ ও অটল ভরসা আছে তাঁহাদেরই ভাষা। যাঁহারা উপেক্ষাভরে দূরে থাকেন তাঁহারা বাংলা ভাষার প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে কোনো সুযোগই পান নাই। তাঁহারা তর্জমা করিয়া বাংলার বিচার করেন। অতএব সভয়ে নিবেদন করিতেছি এরূপ স্থলে তাঁহাদের মতের অধিক মূল্য নাই।

বৈশাখ ১২৯৯

বাংলা-লেখক

লেখকদিগের মনে যতই অভিমান থাক্ এ কথা অস্বীকার করিবার জো নাই যে, আমাদের দেশে পাঠকসংখ্যা অতি যৎসামান্য এবং তাহার মধ্যে এমন পাঠক 'কোটিকে গুটিক' মেলে কিনা সন্দেহ যাঁহারা কোনো প্রবন্ধ পড়িয়া, কোনো সুযুক্তি শুনিয়া, আপন জীবনযাত্রার লেশমাত্র পরিবর্তন-সাধন করেন। নির্জীব নিঃস্বত্ব লোকের পক্ষে সুবিধাই একমাত্র কর্ণধার, সে কর্ণের প্রতি আর-কাহারও কোনো অধিকার নাই।

পাঠকের এই অচল অসাড়তা লেখকের লেখার উপরও আপন প্রভাব বিস্তার করে। লেখকেরা কিছুমাত্র দায়িত্ব অনুভব করেন না। সত্য কথা বলা অপেক্ষা চতুর কথা বলিতে ভালোবাসেন। সুবিজ্ঞগুরু হিতৈষীবন্ধু অথবা জিজ্ঞাসুশিষ্যের ন্যায় প্রসঙ্গের আলোচনা করেন না, কূটবুদ্ধি উকিলের ন্যায় কেবল কথার কৌশল এবং ভাবের ভেল্কি খেলাইতে থাকেন।

এখন দাঁড়াইয়াছে এই, যে যার আপন-আপন সুবিধার সুখশয্যায় শয়ান ; লেখকদিগের কার্য স্ব স্ব দলের বৈতালিকবৃত্তি করিয়া সুমিষ্ট স্তব-গানে তাঁহাদের নিদ্রাকর্ষণ করিয়া দেওয়া।

মাঝে মাঝে দুই দলের লেখক রঙ্গভূমিতে নামিয়া লড়াই করিয়া থাকেন এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধের যত কৌশল দেখাইতে পারেন ততই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট বাহবা লাভ করিয়া হাস্যমুখে গৃহে ফিরিয়া যান।

লেখকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা হীনবৃত্তি আর-কিছু হইতে পারে না। এই বিনা বেতনে চাটুকার এবং জাদুকরের কাজ করিয়া আমরা সমস্ত সাহিত্যের চরিত্র নষ্ট করিয়া দিই।

মানুষ যেমন চরিত্রবলে অনেক দুরূহ কাজ করে, অনেক অসাধ্যসাধন করে, যাহাকে কোনো যুক্তি কোনো শক্তির দ্বারা বশ করা যায় না

তাহাকেও চরিত্রের দ্বারা চালিত করে এবং দীপস্তম্ভের নির্নিমেষ শিখার ন্যায় সংসারের অনির্দিষ্ট পথের মধ্যে জ্যোতির্ময় ধ্রুবনির্দেশ প্রদর্শন করে, সাহিত্যেরও সেইরূপ একটা চরিত্র আছে। সে চরিত্র কৌশল নহে, তার্কিকতা নহে, আস্ফালন নহে, দলাদলির জয়গান নহে— তাহা অন্তর্নিহিত নির্ভীক নিশ্চল জ্যোতির্ময় সত্যের দীপ্তি।

আমাদের দেশে পাঠক নাই, ভাবের প্রতি আন্তরিক আস্থা নাই, যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহাই চলিয়া যাইতেছে— কোনো-কিছুতে কাহারও বাস্তবিক বেদনাবোধ নাই। এরূপ স্থলে লেখকদের অনেক কথাই অরণ্যে ক্রন্দন হইবে এবং অনেক সময়েই আদরের অপেক্ষা অপমান বেশি মিলিবে।

এক হিসাবে অন্য দেশ অপেক্ষা আমাদের এ দেশে লেখকের কাজ চালানো অনেক সহজ, লেখার সহিত কোনো যথার্থ দায়িত্ব না থাকাতে কেহ কিছুতেই তেমন আপত্তি করে না। ভুল লিখিলে কেহ সংশোধন করে না, মিথ্যা লিখিলে কেহ প্রতিবাদ করে না, নিতান্ত 'ছেলেখেলা' করিয়া গেলেও তাহা 'প্রথম শ্রেণী'র ছাপার কাগজে প্রকাশিত হয়। বন্ধুরা বন্ধুকে অম্লানমুখে উৎসাহিত করিয়া যায়, শত্রুরা রীতিমত নিন্দা করিতে বসা অনর্থক পণ্ডশ্রম মনে করে।

সকলেই জানেন বাঙালির নিকট বাংলা লেখার, এমন-কি লেখা-মাত্রেরই এমন কোনো কার্যকারিতা নাই যেজন্য কোনোরূপ কষ্ট স্বীকার করা যায়। পাঠকেরা কেবল যতটুকু আমোদ বোধ করে ততটুকু চোখ বুলাইয়া যায়, যতটু নিজের সংস্কারের সহিত মেলে ততটুকু গ্রহণ করে — বাকিটুকু চোখ চাহিয়া দেখেও না। সেইজন্য যে সে লোক যেমন-তেমন লেখা লিখিলেও চলিয়া যায়।

অন্যত্র, যে দেশের লোকে ভাবের কার্যকারী অস্তিত্ব স্বীকার করে, যাহারা কেবলমাত্র সংস্কার সুবিধা ও অভ্যাসের দ্বারাই বদ্ধ নহে, যাহারা

স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারাও কিয়ৎপরিমাণে স্বহস্তে জীবন গঠিত করে, সুন্দর কাব্যে— প্রবল বাগ্মিতায়— সুসংলগ্ন যুক্তিতে যাহাদিগকে বাস্তবিকই বিচলিত করে, তাহাদের দেশে লেখক হওয়া সহজ নহে। কারণ, লেখা সেখানে খেলা নহে, সেখানে সত্য। এইজন্য লেখার চরিত্রের প্রতি সেখানকার পাঠকদের সর্বদা সতর্ক তীব্র দৃষ্টি। লেখা সম্বন্ধে সেখানে কোনো আলস্য নাই। লেখকেরা সযত্নে লেখে, পাঠকেরা সযত্নে পাঠ করে। মিথ্যা দেখিলে কেহ মার্জনা করে না, শৈথিল্য দেখিলে কেহ সহ্য করে না। প্রতিবাদযোগ্য কথামাত্রের প্রতিবাদ হয় এবং আলোচনাযোগ্য কথামাত্রেরই আলোচনা হইয়া থাকে।

কিন্তু এ দেশে লেখার প্রতি সাধারণের এমনি সুগভীর অশ্রদ্ধা যে, কেহ যদি আন্তরিক আবেগের সহিত কাহারও প্রতিবাদ করে তবে লোকে আশ্চর্য হইয়া যায়। ভাবে, সময় নষ্ট করিয়া এত বড়ো একটা অনাবশ্যক কাজ করিবার কী এমন প্রয়োজন ঘটিয়াছিল! অনর্থক কেবল লোকটার মনে আঘাত দেওয়া! তবে নিশ্চয়ই বাদীর সহিত প্রতিবাদীর একটা গোপন বিবাদ ছিল, এই অবসরে তাহার প্রতিশোধ লইল।

কিন্তু যে কারণে, এক হিসাবে, এখানে লেখক হওয়া সহজ সেই কারণেই, অন্য হিসাবে, এখানে লেখকের কর্তব্য পালন করা অত্যন্ত কঠিন। এখানে লেখকে পাঠকে পরস্পরের সহায়তা করে না। লেখককে একমাত্র নিজের বলে দাঁড়াইতে হয়। যেখানে কোনো লোক সত্য শুনিবার জন্য তিলমাত্র ব্যগ্র নহে সেখানে আপন উৎসাহে সত্য বলিতে হয়। যেখানে লোকে কেবলমাত্র প্রিয়বাক্য শুনিতে চাহে সেখানে নিতান্ত নিজের অনুরাগে তাহাদিগকে হিতবাক্য শুনাইতে হয়। যেখানে বহু-দর্শন থাকিলেও যা না-থাকিলেও তা, সযত্নে চিন্তা করিয়া কথা বলিলেও যা অযত্নে ঝোঁকের মাথায় কথা বলিলেও তা— এবং অধিকাংশের নিকট শেষোক্ত কথারই অধিক আদর হয়— সেখানে কেবল নিজের শুভ ইচ্ছার

দ্বারা চালিত হইয়া, চিন্তা করিয়া, সন্ধান করিয়া, বিবেচনা করিয়া, কথা বলিতে হয়। চক্ষের সমক্ষে প্রতিদিন দেখিতে হইবে বহু যত্ন বহু আশার ধন সম্পূর্ণ অনাদরে নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে, গুণ এবং দোষ— নৈপুণ্য এবং ত্রুটি সকলই সমান মূল্যে— অর্থাৎ বিনা মূল্যে পথপ্রান্তে পড়িয়া আছে, যে আশ্বাসে নির্ভর করিয়া পথে বাহির হওয়া গিয়াছিল সে আশ্বাস প্রতি পদে ক্ষীণ হইতেছে, অথচ পথ ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে— যথার্থ শ্রেষ্ঠতার আদর্শ একমাত্র নিজের অশ্রান্ত যত্নে সম্মুখে দৃঢ় এবং উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে।

আমি বঙ্গদেশের হতভাগ্য লেখকসম্প্রদায়ের হইয়া ক্রন্দনগীত গাহিতে বসি নাই। বিলাতের লেখকদের মতো আমাদের বহি বিক্রয় হয় না, আমাদের লেখা লোকে আদর করিয়া পড়ে না বলিয়া অভিমান করিয়া সময় নষ্ট করা নিতান্ত নিষ্ফল। কারণ, অভিমানের অশ্রুধারায় কঠিন পাঠকজাতির হৃদয় বিগলিত হয় না। আমি বলিতেছি, আমাদের লেখক-দিগকে অতিরিক্তমাত্রায় চেষ্টান্বিত ও সতর্ক হইতে হইবে।

আমরা অনেক সময় অনিচ্ছাক্রমে অজ্ঞানতঃ কর্তব্যভ্রষ্ট হই। যখন দেখি সত্য বলিয়া আশু কোনো ফল পাই না এবং প্রায়ই অনেকের অপ্রিয় হইতে হয় তখন অলক্ষিতে আমাদের অন্তঃকরণ সেই দুরূহ কর্তব্যভার স্কন্ধ হইতে ফেলিয়া দিয়া নটের বেশ ধারণ করে। পাঠকদিগকে সত্যে বিশ্বাস করাইবার বিফল চেষ্টা ত্যাগ করিয়া চাতুরীতে চমৎকৃত করিয়া দিবার অভিলাষ জন্মে। ইহাতে কেবল অন্যকে চমৎকৃত করা হয় না, নিজেকেও চমৎকৃত করা হয়; নিজেও চাতুরীকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।

একটা কথাকে যতক্ষণ না কাজে খাটানো হয় ততক্ষণ তাহার নির্দিষ্ট সীমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; ততক্ষণ তাহাকে ঘরে বসিয়া সূক্ষ্মবুদ্ধিদ্বারা মার্জনা করিতে করিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করিয়া তোলা যায়; ততক্ষণ এ

পক্ষেও বিস্তর কথা বলা যায়, ও পক্ষেও কথার অভাব হয় না। আমাদের দেশে সেই কারণে অতি সূক্ষ্ম কথার এত প্রাদুর্ভাব। কারণ, কথা কথাতেই থাকিয়া যায়, তর্ক ক্রমে তর্কের সংঘর্ষণে উত্তরোত্তর শানিতই হইতে থাকে এবং সমস্ত কথাই বাষ্পাকারে এমন একটা লোকাতীত আধ্যাত্মিক রাজ্যে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হয় যেখানকার কোনো মীমাংসাই ইহলোক হইতে হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমাদের দেশের অনেক খ্যাতনামা লেখকও পৃথিবীর ধারণাযোগ্য পদার্থ-সকলকে গুরুমন্ত্র পড়িয়া ধারণাতীত করিয়া অপূর্ব আধ্যাত্মিক কুহেলিকা নির্মাণ করিতেছেন। পাঠকেরা কেবল নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে আসিয়াছেন, তাহা লইয়া তাঁহারা গৃহকার্য করিবেন না, তাহাকে রীতিমত আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া তাহার সীমানির্ধারণ করাও দুঃসাধ্য— সুতরাং সে যে প্রতিদিন মেঘের মতো নব নব বিচিত্র আকার ধারণ করিয়া অলস লোকের অবসরযাপনের সহায়তা করিতেছে তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু এই বাষ্পগঠিত মেঘে কি মাঝে মাঝে সত্যকে ম্লান করিতেছে না? উদাহরণস্বরূপ কেবল উল্লেখ করি, চন্দ্রনাথ-বাবু তাঁহার 'কড়াক্রান্তি' প্রসঙ্গে যেখানে মনুসংহিতা হইতে মাতৃসম্বন্ধে একটা নিরতিশয় কুৎসিত শ্লোক উদ্‌ধৃত করিয়া তাহা হইতে একটা বৃহৎ আধ্যাত্মিক বাষ্প সৃজন করিয়াছেন সে কি কেবলমাত্র কথার কথা, রচনার কৌশল, সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয়, আধ্যাত্মিক ওকালতি? সে কি মনুষ্যত্বের পবিত্রতম শুভ্রতম জ্যোতির উপরে নিঃসংকোচ স্পর্ধার সহিত কলঙ্ককালিমা লেপন করে নাই? অন্য কোনো দেশের পাঠক কি এরূপ নির্লজ্জ কদর্য তর্কচাতুরী সহ্য করিত?

আমরা সহ্য করি কেন? কারণ, আমাদের দেশে যে যেমন-ইচ্ছা চিন্তা করুক, যে যেমন-ইচ্ছা বিশ্বাস করুক, যে যেমন-ইচ্ছা রচনা করুক, আমাদের কাজের সহিত তাহার যোগ নাই। অতএব আমরা অবিচলিত-

ভাবে সকল কথাই শুনিয়া যাইতে পারি— তুমিও যেমন। উহাতে কাহার কী যায় আসে!

কিন্তু কেন কাহারও কিছু যায় আসে না? আমাদের সাহিত্যের মধ্যে চরিত্রবল নাই বলিয়া। যাহা অবহেলায় রচিত তাহা অবহেলার সামগ্রী। যাহাতে কেহ যথার্থ জীবনের সমস্ত অনুরাগ অর্পণ করে নাই তাহা কখনও অমোঘ বলে কাহারও অন্তর আকর্ষণ করিতে পারিবে না।

এখন আমাদের লেখকদিগকে অন্তরের যথার্থ বিশ্বাসগুলিকে পরীক্ষা করিয়া চালাইতে হইবে, নিরলস এবং নির্ভীক ভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, আঘাত করিতে এবং আঘাত সহিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না।

এক দিকে যেমন আমাদের কিছুতেই কিছু আসে যায় না অন্য দিকে তেমনি আমাদের নিজের প্রতি তিলমাত্র কটাক্ষপাত হইলে গায়ে অত্যন্ত বাজে। ঘরের আদর অত্যন্ত অধিক পাইলে এই দশা হয়। নিজের অপেক্ষা আর-কিছুকেই আদরণীয় মনে হয় না।

সেটা নিজের সম্বন্ধে যেমন স্বদেশের সম্বন্ধেও তেমনিই। আদুরে ছেলের আত্মানুরাগ যেরূপ আমাদের স্বদেশানুরাগ সেইরূপ। একটা যে হিতচেষ্টা কিম্বা কঠিন কর্তব্য -পালন তাহার নাম নাই— কেবল 'আহা উহু', কেবল কোলে কোলে নাচানো। কেবল কিছু গায়ে সয় না, কেবল চতুর্দিক ঘিরিয়া স্তবগান। কেহ যদি তাহার সম্বন্ধে একটা সামান্য অপ্রিয় কথা বলে অমনি আদুরে স্বদেশানুরাগ ফুলিয়া, ফাঁপিয়া, কাঁদিয়া, মুষ্টি উত্তোলন করিয়া অনর্থপাত করিয়া দেয়; অমনি তাহার মাতৃস্বসা এবং পিতৃস্বসা, তাহার মাতুলানী এবং পিতৃব্যাণী মহা হাঁক-ডাক করিতে করিতে ছুটিয়া আসে; এবং ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া, তাহার নাসাচক্ষু মুঞ্চন করিয়া, তাহার চিরন্তন আদুরে নামগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যথিত হৃদয়ের সান্ত্বনা সাধন করে।

আমরা স্থির করিয়াছি, বাঙালির আত্মাভিমানকে নিশিদিন কোলে তুলিয়া নাচানো লেখকের প্রধান কর্তব্য নহে। কিন্তু, কর্মক্ষেত্রে বয়স্ক সহযোগী ও প্রতিযোগীর সহিত আমরা যেরূপ ব্যবহার করি, তাহাদিগকে উচিতভাবে প্রিয়বাক্যও বলি অপ্রিয়বাক্যও বলি, কিন্তু নিয়ত বাৎসল্য-গদ্‌গদ অত্যুক্তি প্রয়োগ করি না, স্বজাতি সম্বন্ধে সেইরূপ ব্যবহার করাই সুসংগত। আমরা আমাদের দেশের যথার্থ ভালো জিনিসগুলি লইয়া এত বাড়াবাড়ি করি যে, তাহাতে ভালো জিনিসের অমর্যাদা করা হয়। কালিদাস পৃথিবীর সকল কবির সেরা, মনুসংহিতা পৃথিবীর সকল সংহিতার শ্রেষ্ঠ, হিন্দুসমাজ পৃথিবীর সকল সমাজের উচ্চে— এরূপ করিয়া বলিয়া আমরা কালিদাস মনুসংহিতা এবং হিন্দুসমাজের প্রতি মুরুব্বিয়ানা করি মাত্র। তাঁহারা যদি জীবিত ও উপস্থিত থাকিতেন তাহা হইলে জোড়-করে বলিতেন, 'তোমরা আমাদিগকে এত কৌশল এবং এত চীৎকার করিয়া বড়ো করিয়া না তুলিলেও আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইত না। বাপু রে, একটু ধীরে, একটু বিবেচনাপূর্বক, একটু সংযতভাবে কথা বলো। পৃথিবীতে সকল জিনিসেরই ভালোও থাকে, মন্দও থাকে; তোমরা যতই কূটতর্ক করো-না, অসম্পূর্ণতা হোহা-দ্বারা ঢাকা পড়ে না। যাহার যথেষ্ট ভালো আছে তাহার অল্পসল্প মন্দ'র জন্য ছলনা করিবার আবশ্যক হয় না; সে ভালো মন্দ দুই অবাধে প্রকাশ করিয়া সাধারণের ন্যায়বিচার অসংকোচে গ্রহণ করে। যাহারা ক্ষুদ্র, যাহাদের অল্পসল্প ভালো, তাহাদেরই জন্য সূক্ষ্ম পয়েন্‌ট্‌ ধরিয়া ওকালতি করো। চন্দ্র কখনো চন্দন দিয়া কলঙ্ক ঢাকে না অথবা তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও করে না। তথাপি নিষ্কলঙ্ক কেরোসিন-শিখার অপেক্ষা তাহার গৌরব বেশি। কিন্তু ওই কলঙ্কের জন্য বাজে কৈফিয়ত দিতে গেলেই, কিম্বা চন্দ্রকে নিষ্কলঙ্ক বলিয়া তাহার মিথ্যা আদর বৃদ্ধি করিতে গেলেই, তাহার প্রতি অসম্ভ্রম করা হয়।'

মাঘ ১২৯৯

সাহিত্যের গৌরব

মৌরস য়োকাই হঙ্গেরি দেশের একজন প্রধান লেখক। তাঁহার সাহিত্য-চর্চায় প্রবৃত্ত হইবার পর পঞ্চাশৎবার্ষিক উৎসব সম্প্রতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। দেশের আপামর সাধারণ কিরূপ মহোৎসাহের সহিত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিল তাহা সংবাদপত্রপাঠকগণ অবগত আছেন।

সেই উৎসববিবরণ পাঠ করিলে তাহার সহিত আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের বিয়োগজনিত শোকপ্রকাশের তুলনা স্বতই মনে উদয় হয়।

ভিক্টর হ্যুগোর মৃত্যুর পর সমস্ত ফ্রান্স্ কিরূপ শোকাকুল হইয়া উঠিয়াছিল বর্তমান প্রসঙ্গে সে কথা উত্থাপন করিতে লজ্জা বোধ হয়; কারণ, ফ্রান্স্ য়ুরোপের শীর্ষস্থানীয়। বীরপ্রসবিনী হঙ্গেরির সহিতও নির্জীব বঙ্গদেশের তুলনা হইতে পারে না; তথাপি অপেক্ষাকৃত অসংকোচে তাহার নামোল্লেখ করিতে পারি।

আমরা যে বহু চেষ্টাতেও আমাদের দেশের মহাত্মাগণকে সম্মান এবং প্রীতি উপহার দিতে পারি না, আর য়ুরোপের একটি ক্ষুদ্র দুর্বল রাজ্যে রাজায় প্রজায় মিলিয়া সামান্যবংশজাত একজন সাহিত্যব্যবসায়ীকে এমন অপর্যাপ্ত হৃদয়োচ্ছ্বাসে অভিষিক্ত করিয়া তুলিল, ইহার কারণ কী?

ইহার প্রধান কারণ এই যে, সেখানে লেখক এবং পাঠক এক প্রাণের দ্বারা সঞ্জীবিত, পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ নাই। সেখানে সমস্ত দেশের লোক মিলিয়া এক জাতি। তাহারা এক উদ্দেশ্যে এক জাতীয় উন্নতির অভিমুখে ধাবিত হইতেছে; তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সরল পথ নির্দেশ করিতেছে সে সর্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছে।

আমাদের দেশে পথিক নাই, সুতরাং পথ খনন করিয়া কেহ যশস্বী হইতে পারে না। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের রাজপথ খনন করিয়া দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু হায়, বঙ্গসাহিত্য কোথায়, বাঙালি জাতি কোথায়! যাহারা বাংলা

লেখে তাহারাই বা কয়জন, যাহারা বাংলা পড়ে তাহাদেরই বা সংখ্যা কত!

বঙ্গসাহিত্য যে জাতীয় হৃদয় অধিকার করিবার আশা করিতে পারে সে হৃদয় কোন্‌খানে! পূর্বকালে যখন আমাদের দেশে সাধারণজাতি-নামক কোনো পদার্থ ছিল না তখন অন্তত রাজসভা ছিল। সেই সভা তখন সর্ব-সাধারণের প্রতিনিধি ছিল। সেই সভার মন হরণ করিতে পারিলে, সেই সভার মধ্যে গৌরবের স্থান পাইলে, সাহিত্য আপনাকে সার্থক জ্ঞান করিত। এখন সে সভাও নাই।

বঙ্গসাহিত্যের কোনো গৌরব নাই। কিন্তু, সে যে কেবল বঙ্গসাহিত্যের দৈন্যবশত তাহা নহে। গৌরব করিবার লোক নাই। ইতস্ততবিক্ষিপ্ত কয়েক জনের নিকট তাহার সমাদর থাকিতে পারে, কিন্তু একত্রসংহত সর্বসাধারণের নিকট তাহার কোনো প্রতিপত্তি নাই। কারণ, একত্রসংহত সর্বসাধারণ এ দেশে নাই।

যে দেশে আছে সেখানে সকলে সাধারণ মঙ্গল অমঙ্গল একত্রে অনুভব করে। সেখানে দেশীয় ভাষা এবং সাহিত্যের অনাদর হইতে পারে না; কারণ, যেখানে অনুভবশক্তি আছে সেইখানেই প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতা আছে। যেখানে সর্বসাধারণে ভাবের ঐক্যে অনুপ্রাণিত হয় সেখানে সর্ব-সাধারণের মধ্যে ভাষার ঐক্য আবশ্যক হইয়া উঠে এবং এই সাধারণের ভাষা কখনোই বিদেশীয় ভাষা হইতে পারে না।

য়ুরোপে জাতি বলিতে যাহা বুঝায় আমরা বাঙালিরা তাহা নহি। অর্থাৎ, আমাদের এক অঙ্গে আঘাত লাগিলে সর্ব অঙ্গে বেদনা বোধ হয় না। আমাদের সকলের মধ্যে বেদনাবহ বার্তাবহ আদেশবহ কোনো সাধারণ স্নায়ুতন্ত্র নাই। সুতরাং, আমাদের মধ্যে সাধারণ সুখদুঃখ বলিয়া কোনো পদার্থ নাই, এবং সাধারণ সুখদুঃখ প্রকাশ করিবার কোনো আবশ্যক নাই।

এইজন্য দেশীয় ভাষার প্রতি সাধারণের আদর নাই এবং দেশীয়

সাহিত্যের প্রতি সাধারণের অনুরাগের স্বল্পতা দেখা যায়। লোকে যে অভাব অন্তরের সহিত অনুভব করে না সে অভাব পূরণ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করা যায় না। অনেকে কর্তব্য-বোধে কৃতজ্ঞ হইবার প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়া থাকেন, কিন্তু সে চেষ্টা কোনো বিশেষ কাজে আসে না।

আমাদের দেশে সাধারণের কোনো আবশ্যকবোধ না থাকাতে এবং সাধারণের আবশ্যক-পূরণ-জনিত গৌরববোধ লেখকের না থাকাতে, আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্র স্বভাবতই সংকীর্ণ হইয়া আসে এবং লেখকে পাঠকে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে না। সাহিত্য কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক শৌখিন লোকের নিকট আদরণীয় হইয়া থাকে। অথচ, সেই সাহিত্যশৌখিন লোক-গুলি প্রাচীনকালের রাজাদিগের ন্যায় সর্বত্রপরিচিত প্রভাবশালী মহিমান্বিত নহেন, সুতরাং তাঁহাদের আদরে সাহিত্য সাধারণের আদর লাভ করে না। কথাটা বিপরীত শুনাইতে পারে কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, কিয়ৎপরিমাণে আদর না পাইলে আদর পাওয়ার যোগ্য হওয়া যায় না।

হঙ্গেরিতে যে উৎসবের উল্লেখ করা যাইতেছে সে উৎসবের ক্ষেত্র সমস্ত জাতির হৃদয়রাজ্যে। হঙ্গেরীয় জাতি একহৃদয় হইয়া অনেক সুখদুঃখ অনুভব করিয়াছে, সকলে মিলিয়া রক্তপাত করিয়া জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত করিয়াছে, স্বদেশের কল্যাণতরণী যখন বিপ্লবের ক্ষুব্ধ সমুদ্র-মধ্যে নিমগ্নপ্রায় তখন সমস্ত দেশের লোক এক ধ্রুবতারার দিকে অনিমেষ দৃষ্টি স্থির রাখিয়া সেই দোদুল্যমান তরীকে উপকূলে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে; সেখানকার দেশীয় লেখক দেশীয় ভাষা অবলম্বন করিয়া শোকের সময় সান্ত্বনা করিয়াছে, বিপদের সময় আশা দিয়াছে, লজ্জার দিনে ধিক্‌কার এবং গৌরবের দিনে জয়ধ্বনি করিয়াছে, সমস্ত জাতির হৃদয়ে তাঁহার কণ্ঠস্বর প্রতিনিয়ত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত

হইয়াছে। সুতরাং, সে দেশে রাজরানী হইতে কৃষক পর্যন্ত সকলেই লেখকের নিকট পরমোৎসাহে কৃতজ্ঞতা-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছে, ইহাতে আশ্চর্যের কারণ কিছুই নাই।

এক কালে হঙ্গেরীয় ভাষা ও সাহিত্য নানা রাষ্ট্রবিপ্লবে বিপর্যস্ত হইয়া লাটিন ও জর্মানের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছিল। এমন-কি ১৮৪৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত হঙ্গেরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে লাটিন এবং জর্মান ভাষা অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। সেই সময় গুটিকতক দেশানুরাগী পুরুষ দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অবমানে ব্যথিত হইয়া ইহার প্রতিকার-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। আজ তাঁহাদের কল্যাণে হঙ্গেরিদেশে এমন ভূরি-পরিমাণে শিক্ষাবিস্তার হইয়াছে যে, প্রজাসংখ্যা তুলনা করিলে য়ুরোপে জর্মানি ব্যতীত আর কোথাও এত অধিকসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞানশিক্ষাশালা নাই এবং সেই-সকল পাঠাগারে কেবলমাত্র হঙ্গেরি-ভাষায় সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই পরিবর্তন-সাধনের জন্য হঙ্গেরি মৌরস য়োকাইয়ের নিকট ঋণে বদ্ধ।

১৮৪৮ খৃস্টাব্দে হঙ্গেরি যখন বিদ্রোহী হয় তখন য়োকাই কেবল যে লেখনীর দ্বারা তাহাকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন তাহা নহে, স্বয়ং তরবারি হস্তে তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। অবশেষে শান্তিস্থাপনের সময় তিনিই বিপ্লবের বহ্নিদাহ-নির্বাপণে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, হঙ্গেরিদেশের মধ্যে সর্বত্র একটা জীবনস্রোত, একটা কর্মপ্রবাহ চলিতেছে। সমস্ত জাতির আত্মা সচেতনভাবে কাজ করিতেছে। সেখানে সৃজন করিবার শক্তিও সবল, গ্রহণ করিবার শক্তিও সজাগ। আমাদের দেশে কোনো উদ্দেশ্য নাই, কোনো কার্য নাই, কোনো জীবনের গতি নাই, তবে সাহিত্য কোথা হইতে জীবন প্রাপ্ত হইবে? কেবল গুটিকতক লোকের ক্ষীণমাত্রায় একটুখানি শখ আছে মাত্র, আপাতত সেইটুকুর উপরেই সাহিত্যের ভিত্তি

স্থাপন করিতে হয়।

'সমুদ্রের ন্যায় চক্ষু' -নামক য়োকাইয়ের একটি উপন্যাস ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। ইহাতে উপন্যাসের সহিত লেখকের জীবনবৃত্তান্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্রিত দেখা যায়। এই আশ্চর্য গ্রন্থখানি পাঠ করিলে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, লেখকের সহিত তাঁহার স্বদেশের কী যোগ। ইহাও বুঝিতে পারিবেন, যেখানে জীবনের বিচিত্র প্রবাহ একত্র মিশিয়া ঘাত-প্রতিঘাতে স্ফীত ও ফেনিল হইয়া উঠিতেছে লেখক সেইখানে কল্পনার জাল-বিস্তার-পূর্বক সজীব চরিত্রসকল আহরণ করিয়া আনিতেছেন। আমাদের সাহিত্যে কোথায় সেই ভালোমন্দের সংঘাত, কোথায় সে হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রবলতা, কোথায় সে ঘটনাস্রোতের দ্রুতবেগ, কোথায় সে মনুষ্যত্বের প্রত্যক্ষ জীবন্ত স্বরূপ!

আমরা নিক্তি হস্তে লইয়া বসিয়া বসিয়া তৌল করিতেছি, সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনীর অপেক্ষা এক-মাষা এক-রতি পরিমাণ অধিক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে কিনা, আয়েষার ভালোবাসা ভ্রমরের ভালোবাসার অপেক্ষা এক-চুল পরিমাণ উদারতর কিনা, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ উভয়ের মধ্যে কাহার চরিত্রে ভরি-পরিমাণে মহত্ত্ব বেশি প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি না, কোন্‌টা যথার্থ, কে মানুষের মতো, কে সজীব, কোন্ চরিত্রের মধ্যে হৃদয়স্পন্দন আমরা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতেছি।

তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশে সুদূরব্যাপী কর্মস্রোত না থাকাতে, সজীব মানবচরিত্রের প্রবল সংস্পর্শ কাহাকে বলে তাহা আমরা ভালো করিয়া জানি না। মানুষ যে কেবল মানুষরূপেই কত বিচিত্র, কত বলিষ্ঠ, কত কৌতুকাবহ, কত হৃদয়াকর্ষক, যেখানে কোনো-একটা কাজ চলিতেছে সেখানে সে যে কত কাণ্ড বাধাইয়া বসিতেছে, তাহা আমরা সম্যক্‌ প্রত্যক্ষ ও অনুভব করি না— সেইজন্য মনুষ্য কেবলমাত্র মনুষ্য বলিয়াই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে না। আমাদের এই মন্দগতি

ক্ষীণপ্রাণ কৃশহৃদয় দেশে মানুষ জিনিসটা এতই অকিঞ্চিৎকর যে তাহাকে অনায়াসে বাদ দিতে পারি এবং তাহার স্থলে কতকগুলি নীতিশাস্ত্রোদ্ধৃত গুণকে বসাইয়া নির্জীব তুলাদণ্ডে প্রাণহীন বাটখারা-দ্বারা তাহাদের গুরুলঘুত্ব পরিমাপ করাকে সাহিত্যসমালোচনা বলিয়া থাকি। কিন্তু, এই হঙ্গেরীয় উপন্যাসখানি খুলিয়া দেখো মানুষ কত রকমের, কত ভালো, কত মন্দ, কত মিশ্রিত এবং সবসুদ্ধ কেমন সম্ভব, কেমন সত্য! উহাদের মধ্যে কোনোটিই নৈতিক গুণ নহে, সবগুলিই রক্তমাংসের প্রাণী। 'বেসি'-নামক এই গ্রন্থের নায়িকার চরিত্র পর্যালোচনা করিয়া দেখো, শাস্ত্রমতে সে যে বড়ো পবিত্র উন্নত স্বভাবের তাহা নহে, সে পরে পরে পাঁচ স্বামীকে বিবাহ করিয়াছে এবং শেষ স্বামীকে হত্যা করিয়া কারাগারে জীবনত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি সে রমণী, সে বীরাঙ্গনা, অনেক সতীসাধ্বীর ন্যায় সে প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্রী, কিছু না হউক তাহার নারীপ্রকৃতি পরিপূর্ণ প্রাণশক্তিতে নিয়ত স্পন্দমান; সে সমাজের কলে পিষ্ট এবং লেখকের গৃহনির্মিত নৈতিক চালুনিতে ছাঁকা গৃহস্থের ঘরে ব্যবহার্য পয়লা নম্বরের পণ্যদ্রব্য নহে, সুবোধ গোপাল এবং সুমতি সুশীলার ন্যায় সে বাংলাদেশের শিশুশিক্ষার দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। প্রাণের পরিবর্তে তৃণে পরিপূর্ণ মিউজিয়ামের সিংহী যদি সহসা জীবনপ্রাপ্ত হয় তবে রক্ষক-মহলে যেরূপ একটা হুলস্থূল পড়িয়া যায় 'বেসি'র ন্যায় নায়িকা সহসা বঙ্গসাহিত্যে দেখা দিলে সমালোচক-মহলে সেইরূপ একটা বিভ্রাট বাধিয়া যায়, তাঁহাদের সূক্ষ্মবিচার এবং নীতিতত্ত্ব বিপর্যস্ত হইয়া একটা দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা হয়।

য়ুরোপে হঙ্গেরির সহিত পোলাণ্ডের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। সেখানে আধুনিক পোল্‌সাহিত্যের নেতা ছিলেন ক্রাস্‌জিউস্কি। ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে তাঁহার রচনারম্ভের পঞ্চাশৎবার্ষিক উৎসব পরম সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

তদুপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে উপাধি দান করে, কার্পাথীয় গিরিমালার একটি শিখরকে তাঁহার নামে অভিহিত করা হয়, অষ্ট্রিয়ার সম্রাট তাঁহাকে রাজসম্মানে ভূষিত করেন এবং দেশের লোকে মিলিয়া তাঁহাকে ছয় হাজার পাউণ্ড মুদ্রা উপহার প্রদান করে।

এ সম্মান শূন্য সম্মান নহে। সমস্ত জীবন দিয়া ইহা তাঁহাকে লাভ করিতে হইয়াছে। তিনিই প্রথম পোলীয় উপন্যাসরচয়িতা। যখন তাঁহার বয়স আঠারো তখন পঠদ্দশাতেই তিনি পোলাণ্ডের স্বাধীনতা-উদ্ধারের জন্য সহপাঠীদিগকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই অপরাধে দুই বৎসর কারাবাস যাপন করিয়া পুনর্বার তিনি বিদ্যালয়ে প্রবেশ-পূর্বক শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। কারাগারে অবস্থান-কালে তিনি পোলীয় ভাষার প্রথম উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন।

পুনর্বার বিদ্রোহ অপরাধে জড়িত হইয়া তাঁহাকে পল্লীগ্রামে পলায়ন-পূর্বক বহুকাল সমাজ হইতে দূরে বাস করিতে হইয়াছিল। এবং অবশেষে পোলাণ্ড ত্যাগ করিয়া ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে তিনি জর্মনিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যুকালে আর স্বদেশে ফিরিতে পারেন নাই। সেখানেও বিস্‌মার্কের রাজনীতির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করাতে মৃত্যুর অনতিপূর্বে বৃদ্ধবয়সে তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়।

ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, পর্বততুল্য কঠিন প্রতিভার দ্বারা আলোড়নপূর্বক কিরূপ সংক্ষুব্ধ সমুদ্র মন্থন করিয়া এই পোলীয় মনস্বী অমরতাসুধা লাভ করিয়াছিলেন। পোলাণ্ডে একটি বৃহৎ জাতীয় হৃদয় ছিল বলিয়া সেখানে জাতীয় সাহিত্য এবং জাতীয় সাহিত্যবীর এত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সে সাহিত্য এমন প্রভূত বলে আপন প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এই লেখক-রচিত 'ইহুদি' -নামক একটি উপন্যাসগ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে পাঠকগণ জানিতে পারিবেন,

লেখকের প্রতিভা জাতীয় হৃদয়ের আন্দোলন-দোলায় কেমন করিয়া লালিত হইয়াছে।

বাংলাসাহিত্যের প্রসঙ্গে আমরা যে এই দুই হঙ্গেরীয় ও পোলীয় লেখকের উল্লেখ করিলাম তাহার কারণ, ইঁহারা উভয়েই স্ব স্ব দেশে এক নব সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। ইঁহারা যেমন স্বদেশের সাহিত্যকে গতিশক্তি দিয়াছেন তেমনি তাহার চলিবার পথও স্বহস্তে খনন করিয়াছেন। প্রায় এমন কোনো বিষয় নাই যাহা তাঁহারা নিজে স্বভাষায় প্রচলিত করেন নাই। শিশুদের সুখপাঠ্য মনোরম রূপকথার গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস পর্যন্ত সমস্তই তাঁহারা নিজে রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা স্বদেশীয় ভাষাকে বিদ্যালয়ে বদ্ধমূল এবং স্বদেশীয় সাহিত্যকে সমস্ত জাতির হৃদয়ে স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের নিজের ক্ষমতা প্রকাশ পায় বটে কিন্তু জাতির সজীবতাও সূচনা করে।

আমাদের দেশে লেখকগণ বিচ্ছিন্ন, বিষণ্ন, সঙ্গবিহীন। তাঁহারা বৃহৎ মানবহৃদয়ের মাতৃসংস্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইয়া দূরে বসিয়া আপন উপবাসী শীর্ণ প্রতিভাকে নীরস কর্তব্যের কঠিন খাদ্যখণ্ডে কোনোমতে পালন করিয়া তুলিতে থাকেন। সামান্য বাধা সে লঙ্ঘন করিতে পারে না, সামান্য আঘাতে সে মুমূর্ষু হইয়া পড়ে, দেশব্যাপী নিত্যপ্রবাহিত গতি প্রীতি আনন্দ হইতে রসাকর্ষণ করিয়া সে আপনাকে সতত সতেজ রাখিতে পারে না। অল্পকালের মধ্যেই আপনার ভিতরকার সমস্ত খাদ্য নিঃশেষ করিয়া রিক্তবল রিক্তপ্রাণ হইয়া পড়ে। বাহিরের প্রাণ তাহাকে যথেষ্ট প্রাণ দেয় না।

কিন্তু, যথার্থ সাহিত্য যেমন যথার্থ জাতীয় ঐক্যের ফল তেমনি জাতীয় ঐক্যসাধনের প্রধানতম উপায় সাহিত্য। পরস্পর পরস্পরকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলে। যাহা অনুভব করিতেছি তাহা প্রকাশ করিতে

পারিব, যাহা শিক্ষা করিতেছি তাহা রক্ষা করিতে পারিব, যাহা লাভ করিতেছি তাহা বিতরণ করিতে পারিব, এমন একটা ক্ষমতার অভ্যুদয় হইলে তাহা সমস্ত জাতির উল্লাসের কারণ হয়। আমাদের বঙ্গদেশে সেই বিরাট ক্ষমতা শিশু-আকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু এখনও সেই জাতি নাই যে উল্লাস প্রকাশ করিবে। তাহারই অপেক্ষা করিয়া আমরা পথ চাহিয়া আছি। যাঁহারা বাংলার সদ্যোজাত সাহিত্যের শিয়রে জাগরণপূর্বক নিস্তব্ধ রজনীর প্রহর গণিতেছেন তাঁহারা কোনো উৎসাহ কোনো পুরস্কার না পাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের অন্তরে এক সুমহৎ আশা জাগ্রত দেবতার ন্যায় সর্বদা বরাভয় দান করিতেছে; তাঁহারা একান্ত বিশ্বাস করিতেছেন যে এই শিশু অমর হইবে এবং জন্মভূমিকে যদি কেহ অমরতা দান করিতে পারে তো সে এই সাহিত্য পারিবে।

শ্রাবণ ১৩০১

সাহিত্যসম্মিলন

সকলেই জানেন, গত বৎসর চৈত্রমাসে বরিশাল সাহিত্যসম্মিলনসভা আহ্বান করিয়াছিল। সেই আহ্বানের মধ্যে বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশের হৃদয়-বেদনা ছিল। সে আহ্বানকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি নাই।

তার পর হঠাৎ অকালে ঝড় উঠিয়া সেই সভাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল তাহাও সকলে জানেন। সংসারে শুভকর্ম সকল সময়ে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় না। বিঘ্নই অনেক সময়ে শুভকর্মের কর্মকে রোধ করিয়া শুভকে উজ্জ্বলতর করিয়া তোলে। ফলের বীজ যেখানে পড়ে সেইখানেই অঙ্কুরিত হইতে যদি না পায়, ঝড়ে যদি তাহাকে অন্যত্র উড়াইয়া লইয়া যায়, তবু সে ব্যর্থ হয় না, উপযুক্ত সুযোগে ভালোই হইয়া থাকে।

কিন্তু কলিকাতা বড়োই কঠিন স্থান। এ তো বরিশাল নয়। এ যে রাজবাড়ির শান-বাঁধানো আঙিনা। এখানে কেবল কাজ, কৌতুক ও কৌতূহল, আনাগোনা এবং উত্তেজনা। এখানে হৃদয়ের বীজ অঙ্কুরিত হইবে কোথায়? জিজ্ঞাসা করি, এখানে হৃদয় দিয়া মিলনসভাকে আহ্বান করিতেছে কে? এ সভার কোনো প্রয়োজন কি কেহ বেদনার সহিত নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিয়াছে? এখানে ইহা নানা আয়োজনের মধ্যে একটিমাত্র, সর্বদাই নানাপ্রকারে জনতা-মহারাজের মন ভুলাইয়া রাখিবার এক শত অনাবশ্যক ব্যাপারের মধ্যে এটি এক-শত-এক।

জনতা-মহারাজকে আমিও যথেষ্ট সম্মান করি, কিন্তু কিঞ্চিৎ দূর হইতে করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার সেবক-পরিচারকের অভাব নাই। আমিও মাঝে মাঝে তাঁহার দ্বারে হাজিরা দিয়াছি, হাততালির বেতনও আদায় করিয়া লইয়াছি, কিন্তু সত্য কথাই বলিতেছি, সে বেতনে চিরদিন পেট ভরে না; এখন ছুটি লইবার সময় হইয়াছে।

বর্তমান সভার কর্তৃপক্ষদের কাছে কাতরকণ্ঠে ছুটির দরখাস্ত করিয়া-

ছিলাম। তাঁহারা আমার পূর্বেকার নোক্‌রি স্মরণ করিয়া দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়াছেন। তাঁহারা কেহ বা আমার প্রিয় আত্মীয়, কেহ বা আমার মান্য ব্যক্তি ; তাঁহাদের অনুরোধের উত্তরে 'না' বলিবার অভ্যাস এখনো পাকে নাই বলিয়া যেখানেই তাঁহারা আমাকে দাঁড় করাইয়া দিলেন সেইখানেই আসিয়া দাঁড়াইলাম।

কিন্তু সকলেরই তো আমি প্রিয় ব্যক্তি এবং আত্মীয় ব্যক্তি নহি ; অতএব এখানে দাঁড়াইবার আমার অধিকার কী আছে, পক্ষপাতহীন বিচারকদের কাছে তাহারও জবাবদিহি আমাকে করিতে হইবে। জনতা-মহারাজের চাপরাস বহন করিবার এও একটা বিভ্রাট।

বরিশালের যজ্ঞকর্তারা আমাকে সম্মানের পদে আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই আহ্বান অস্বীকার করাটাকেই আমি বিনয় বলিয়া মনে করি নাই। অতএব আমি যে প্রথম সাহিত্যসম্মিলন-সভার সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলাম, সে সম্মান আমার পক্ষে আনন্দের সহিত শিরোধার্য। জীবনে যাচিত এবং অযাচিত সৌভাগ্য তো মাঝে মাঝে ঘটে, নিজের যোগ্যতা বিচার করিয়া সেই সৌভাগ্য গ্রহণ করিবার ভার যদি নিজেরই উপরে থাকে, তবে পৃথিবীতে কয়জন ধনী অসংকোচে ধন ভোগ করিতে এবং কয়জন মানী নির্বিচারে মানের দাবি করিতে পারেন ? তবে তো পৃথিবীর বিস্তর বড়ো বড়ো পদ ও পদবী কুলীনকন্যার মতো উপযুক্ত পাত্রের অপেক্ষায় অনাথ অবস্থাতেই দিনযাপন করিতে বাধ্য হয়। এমন-সকল দৃষ্টান্তসত্ত্বেও আমিই যে কেবল সম্মান ছাড়িয়া দিয়া বিনয় প্রদর্শন করিব এত বড়ো অলোকসামান্য ন্যায়ভীরুতা আমার নাই।

যেমন করিয়াই হউক, বরিশালের সভায় যে অধিকার পাইয়াছি সেই অধিকারের জোরেই আজ কলিকাতার মতো স্থানেও এখানে দাঁড়াইতে সংকোচ দূর করিলাম। আজিকার এই সভাকে আমি বরিশালের সেই সম্মিলনসভারই অনুবৃত্তি বলিয়া গণ্য করিতেছি। বরিশালের সেই আহ্বান

ও আতিথ্যকেই সর্বাগ্রে স্বীকার করিয়া লইয়া আজিকার কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

তার পরে কথা এই, কাজটা কী? বরিশালের নিমন্ত্রণপত্রে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, সভার উদ্দেশ্য সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রীতিস্থাপন ও মাতৃভাষার উন্নতিসাধন। এই দুটি উদ্দেশ্যের দিকে হাল বাগাইয়া চলিতে হইবে। কিন্তু পথটি তো সোজা নয়। সভাস্থাপন করিয়া প্রীতিস্থাপন হয়, বাংলাদেশে তাহার প্রমাণ তো সর্বদা পাওয়া যায় না; বরঞ্চ উল্টা হয় এমন দৃষ্টান্ত অনেক দেখানো যাইতে পারে। প্রীতিবিধান ও উন্নতি-সাধন, জগতে এ দুটি বৈ আর তো সাধু উদ্দেশ্য নাই। এই দুটির সহজপথ-আবিষ্কার-চেষ্টায় ধরাতল বারংবার অশ্রু এবং রক্তে অভিষিক্ত হইয়াছে, তবু আজও এক ব্রতের ব্রতী, এক ব্যবসায়ের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঈর্ষা-কলহের অন্ত নাই— আজও উন্নতি-অবনতি চাকার মতো আবর্তিত হইতেছে এবং সংসারে উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে অগণ্য লোক এবং তাহার ফল ভোগ করিতেছে কয়েকজন ভাগ্যবান্ মাত্র।

কিন্তু আসল কথা, অনেক বিদ্যালয় চিকিৎসালয় প্রভৃতি ব্যাপারের যেমন বড়ো বড়ো নামধারী মুরুব্বি থাকেন, অনুষ্ঠানপত্রের সর্বোচ্চে তাঁহাদের নামটা ছাপা থাকে, কিন্তু কোনো কাজেই তাঁহারা লাগিবেন বলিয়া কেহ আশাও করে না, তেমনি কোনো অনুষ্ঠানের গোড়ায় উদ্দেশ্য বলিয়া মস্ত বড়ো কোনো-একটা কথা সকলের উপরে আমরা লিখিয়া রাখি, মনে মনে জানা থাকে ওটা ওইখানে অমনি লেখাই রহিল। প্রীতিস্থাপনের উদ্দেশ্যটাকেও তেমনি সর্বোচ্চে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার পরে তাহার প্রতি মনোযোগ না করিলেও বোধ করি কেহই লক্ষ্য করিবে না।

অতএব এই সম্মিলনসভার উদ্দেশ্য কী তাহা লইয়া বৃথা আলোচনা না করিয়া, ইহার কারণটা কী, সেটা দেখা যাইতে পারে।

সাহিত্যসম্মিলনের নামে বাংলার নানা প্রদেশের লোক বরিশালে

আহূত হইয়াছিল। এত কাল পরে আজই এমনতরো একটা ব্যাপার যে ঘটিল, তাহার তাৎপর্য কী? বাংলাসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ যে হঠাৎ বন্যার মতো এক রাত্রে বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহা নহে। আসল কথাটা এই যে, সমস্ত বাংলাদেশে একটা মিলনের দক্ষিণ-হাওয়া দিয়াছে। দেখিতে দেখিতে বাংলাদেশে চারি দিকে কত সমিতি কত সম্প্রদায় যে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। আজ আমরা যত রকম করিয়া পারি মিলিতে চাই। আমরা যে-কোনো একটা উদ্দেশ্য খাড়া করিয়া দিয়া যে-কোনো একটা সূত্র লইয়া পরস্পরকে বাঁধিতে চাই। কত কাল ধরিয়া আমাদের দেশের প্রধান পক্ষেরা বলিয়া আসিয়াছেন এক না হইতে পারিলে আমাদের রক্ষা নাই, কবিরা ছন্দোবন্ধে ঐক্যের মহিমা ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন, নীতিজ্ঞেরা বলিয়াছেন তৃণ একত্র করিয়া পাকাইলে হাতিকে বাঁধা যায়— তবু দীর্ঘকাল হাতি বাঁধিবার জন্য কাহারও কোনো উদ্‌যোগ দেখা যায় নাই। কিন্তু শুভলগ্নে ঐক্যের দানা বাঁধিবার যখন সময় আসিল তখন হঠাৎ একটা আঘাতেই সমস্ত দেশে একটা কী টান পড়িয়া গেল— যে যেখানে পারে সেইখানেই একটা-কোনো নাম লইয়া একটা-কিছু সংহতির মধ্যে ধরা দিবার জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করিতে লাগিল। এখন এই আবেগ থামাইয়া রাখা দায়। স্বদেশের মাঝখান হইতে মিলনের টান পড়িতেই মাতৃকক্ষের ছোটোবড়ো সমস্ত দরজা-জানলা খুলিয়া গেছে। কে আমাদিগকে চলিতে বলিতেছে? উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য তো পরিষ্কার করিয়া কিছুই বলিতে পারি না। যদি বানাইয়া বলিতে বল তবে বড়ো-বড়ো-নাম-ওয়ালা উদ্দেশ্য বানাইয়া দেওয়া কিছুই শক্ত নয়। কুঁড়ি যে কেন বাধা ছিঁড়িয়া ফুল হইয়া ফুটিতে চায় তাহা ফুলের বিধাতাই নিশ্চয় জানেন, কিন্তু দক্ষিণে হাওয়া দিলে সাধ্য কী সে চুপ করিয়া থাকে। তাহার কোনো কৈফিয়ত নাই, তাহার একমাত্র বলিবার কথা: আমি থাকিতে পারিলাম না। বাংলাদেশের

এমনি একটা খ্যাপা অবস্থায় আজ রাজনীতিকের দল তাঁহাদের গড়ের বাদ্য বাজাইয়া চলিয়াছেন, বিদ্যার্থীর দলও কলরবে যাত্রাপথ মুখরিত করিয়াছেন, ছাত্রগণও স্বদেশী ব্যবসায়ের রথের রশি ধরিয়া উঁচুনিচু পথের কাঁকরগুলা দলিয়া পা কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছেন— আর, আমরা সাহিত্যিকের দলই কি চুপ করিয়া থাকিতে পারি? যজ্ঞে কি আমাদেরই নিমন্ত্রণ নাই?

সেকি কথা! নাই তো কী! এ যজ্ঞে আমরাই সকলের বেশি মর্যাদা দাবি করিব। দেশলক্ষ্মীর দক্ষিণ হস্ত হইতে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা আমরাই সকলের আগে আদায় করিয়া ছাড়িব। ইহাতে কেহ ঝগড়া করিতে আসিলে চলিবে না। আমাদের অন্য ভাইরা, যাঁহারা সুদীর্ঘকাল পশ্চিমমুখে আসন করিয়া পাষাণদেবতার বধির কানটার কাছে কাঁসর ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে ডান হাতটাকে একেবারে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন তাঁহারাই যে আমাদিগকে পিছনে ঠেলিয়া আজ প্রধান হইয়া দাঁড়াইবেন, এ আমরা সহ্য করিব কেন? স্বদেশের মিলনক্ষেত্রে একদিন যখন কাহারও কোনো সাড়াশব্দ ছিল না, যখন ইহাকে শ্মশান বলিয়া ভ্রম হইত, তখন সাহিত্যই কোদাল কাঁধে করিয়া ইহার পথ পরিষ্কার করিতে বাহির হইয়াছিল। সেই পথ বাংলার উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়াছে। সেই পথকে ক্রমশই চওড়া করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য বড়ো বড়ো পণ্যপ্রবাহী রাজপথগুলির সঙ্গে মিলাইয়া দিবার আয়োজন কে করিয়াছিল?

একবার ভাবিয়া দেখুন, বাঙালিকে আমরা যে বাঙালি বলিয়া অনুভব করিতেছি তাহা মানচিত্রে কোনো কৃত্রিম রেখার জন্য নহে। বাঙালির ঐক্যের মূলসূত্রটি কী? আমরা এক ভাষায় কথা কই। আমরা দেশের এক প্রান্তে যে বেদনা অনুভব করি ভাষার দ্বারা দেশের অপর সীমান্তে তাহা সঞ্চার করিয়া দিতে পারি; রাজা তাঁহার সমস্ত সৈন্যদল খাড়া

করিয়া তাঁহার রাজদণ্ডের সমস্ত বিভীষিকা উদ্যত করিয়াও ইহা পারেন না। শতবৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষ যে গান গাহিয়া গিয়াছেন শতবৎসর পরেও সেই গান বাঙালির কণ্ঠ হইতে উৎপাটিত করিতে পারে এত বড়ো তরবারি কোনো রাজাস্ত্রশালায় আজও শানিত হয় নাই। একি সামান্য শক্তি আমাদের প্রত্যেক বাঙালির হাতে আছে! এ শক্তি ভিক্ষালব্ধ নহে। ভূমিষ্ঠ হইবার পরক্ষণ হইতেই জননীর সুধাকণ্ঠ হইতে স্নেহবিগলিত এই শক্তি আমরা আনন্দের সহিত সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়াছি এবং এই চিরন্তন শক্তিযোগে সমস্ত দূরত্ব লঙ্ঘন করিয়া, অপরিচয়ের সমস্ত বাধা ভেদ করিয়া, আজ এই সভাতলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের, উপস্থিত ও অনাগতের, সমস্ত বাঙালিকে আপন উদ্‌বেল হৃদয়ের সম্ভাষণ জানাইবার অধিকারী হইয়াছি।

বাঙালির সঙ্গে বাঙালিকে গাঁথিবার জন্য কত কাল ধরিয়া বঙ্গসাহিত্য হৃদয়তন্তুনির্মিত নানা রঙের একটা বিপুল মিলনজাল রচনা করিয়া আসিয়াছে! আজ তাহা আমাদের এত বেশি অঙ্গীভূত হইয়া গেছে যে, তাহা আমাদের শিরা পেশী প্রভৃতির মতো আমাদের চোখেই পড়িতে চায় না। এ দিকে রাজকীয় মন্ত্রণাসভায় দুই-এক জন দেশীয় মন্ত্রী-নিয়োগ বা পৌরসভায় দুই চারি জন দেশীয় প্রতিনিধি -নির্বাচনের শূন্যগর্ভ বিড়ম্বনাকেই আমরা পরম সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করি। ঔষধ যতই কটু হয় তাহাকে ততই হিতকর বলিয়া ভ্রম হয়; যে চেষ্টায় যত বেশি ব্যর্থ কষ্ট তাহার ফলটুকুকে ততই অধিক বলিয়া আমরা মনে করি। কারণ, ভাঙা পথে তৈলহীন গোরুর গাড়ির চাকার মতো পণ্ডশ্রমই সব চেয়ে বেশি শব্দ করিতে থাকে— তাহার অস্তিত্ব এক মুহূর্ত ভুলিয়া থাকা কঠিন।

কিন্তু কাজের সময় হঠাৎ দেখিতে পাই যাহা সত্য, যাহা কষ্টকল্পনা নহে, তাহার শক্তি অধিক, অথচ তাহা নিতান্ত সহজ। আমরা বিদেশী ভাষায় পরের দরবারে এত কাল যে ভিক্ষা কুড়াইলাম তাহাতে লাভের

অপেক্ষা লাঞ্ছনার বোঝাই বেশি জমিল, আর দেশী ভাষায় স্বদেশীর হৃদয়-দরবারে যেমনি হাত পাতিলাম অমনি মুহূর্তের মধ্যেই মাতা যে আমাদের মুঠা ভরিয়া দিলেন। সেইজন্য আমি বিবেচনা করি, অদ্যকার বাংলাভাষার দল যদি গদিটা দখল করিয়া বসে তবে আর-সকলকে সেটুকু স্বীকার করিয়া যাইতে হইবে; মনে রাখিতে হইবে এই মিলনোৎসবের 'বন্দে মাতরম্' মহামন্ত্রটি বঙ্গসাহিত্যেরই দান।

এ কথা বিশেষরূপে মনে রাখিবেন যে, সাহিত্যই মানুষের যথার্থ মিলনের সেতু। কেন যে, তাহার কারণ এখানে বিবৃত করিয়া বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমাদের দেশে বলিয়াছেন: বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। রসাত্মক বাক্যই কাব্য। বস্তুত কাব্যের সংজ্ঞা আর-কিছুই হইতে পারে না। রস জিনিসটা কী? না, যাহা হৃদয়ের কাছে কোনো-না-কোনো ভাবে প্রকাশ পায় তাহাই রস, শুদ্ধ জ্ঞানের কাছে যাহা প্রকাশ পায় তাহা রস নহে। কিন্তু সকল রসই কি সাহিত্যের বিষয়? তাহা তো দেখিতে পাই না। ভোজনব্যাপারে যে সুখসঞ্চার হয় তাহার মতো ব্যাপক রস মানবসমাজে আর নাই, শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সর্বত্রই ইহার অধিকার। তবু তো রসনা-তৃপ্তির আনন্দ সাহিত্যে কেবলমাত্র বিদূষককে আশ্রয় করিয়া নিজেকে হাস্যকর করিয়াছে। গীতিকাব্যের ছন্দে তাহার রসলীলা প্রকাশ পায় নাই, মহাকাব্যের মহাসভা হইতে সে তিরস্কৃত। অথচ গোপনে অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, কবিজাতি স্বভাবতই ভোজনে অপটু বা মিষ্টান্নে অরসিক— শত্রুপক্ষেও এমন অপবাদ দেয় না।

ইহার একটা কারণ কাছে। ভোজনের তৃপ্তিটুকু উদরপূরণের প্রয়োজনে প্রায়ই নিঃশেষ হইয়া যায়। তাহা আর উদ্‌বৃত্ত থাকে না। যে রস উদ্‌বৃত্ত থাকে না সে আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল হয় না। যেটুকু বৃষ্টি মাটির মধ্যেই শুষিয়া যায় তাহা তো আর স্রোতের আকারে বহিয়া

যাইতে পারে না। এই কারণেই রসের সচ্ছলতায় সাহিত্য হয় না, রসের উচ্ছলতায় সাহিত্যের সৃষ্টি।

কতকগুলি রস আছে যাহা মানুষের প্রয়োজনকে অনেক দূর পর্যন্ত ছাপাইয়া উৎসারিত হইয়া উঠে। তাহার মুখ্যধারা আমাদের আবশ্যকে নিঃশেষ হয় এবং গৌণধারা নানাপ্রকার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিতে চায়। বীরপুরুষ মুখ্যভাবে তরবারিকে আপনার অস্ত্র বলিয়া জানে; কিন্তু বীরত্বগৌরব সেইটুকুতেই তৃপ্ত থাকিতে পারে নাই, সে তরবারিতে কারুকার্য ফলাইয়াছে। কলু নিজের ঘানিকে কেবলমাত্র কাজের ঘানি করিয়াই সন্তুষ্ট; তাহার মধ্যে গৌণপ্রকাশ কিছুই নাই। ইহাতে প্রমাণ হয়, ঘানি কলুর মনে সেই ভাবের উদ্রেক করিতে পারে নাই যাহা আবশ্যক শেষ করিয়াও অনাবশ্যকে আপনার আনন্দ ব্যক্ত করে। এই রসের অতিরিক্ততাই সংগীতকে ছন্দকে নানাপ্রকার ললিতকলাকে আশ্রয় করিতে চায়। তাহাই ব্যবহারের-অতীত অহেতুক হইয়া অনির্বচনীয় রূপে আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়। নায়ক-নায়িকার যে প্রেম কেবলমাত্র দর্শনস্পর্শনের মধ্যেই গাহিয়া উঠে—

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয় জুড়ন না গেল

তার সে মুহূর্তকালের দেখাশুনা কেবল সেই মুহূর্তটুকুর মধ্যে নিজেকে ধারণ করিতে পারে না বলিয়াই লক্ষ লক্ষ যুগের আকাঙ্ক্ষা সংগীতের মধ্যে সৃষ্টি না করিয়া বাঁচে না।

অতএব যে রস মানবের সর্বপ্রকার প্রয়োজনমাত্রকে অতিক্রম করিয়া বাহিরের দিকে ধাবিত হয় তাহাই সাহিত্যরস। এইরূপ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদকেই আমরা ঐশ্বর্য বলিয়া থাকি। সাহিত্য মানবহৃদয়ের

ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্যেই সকল মানুষ সম্মিলিত হয় ; যাহা অতিরিক্ত তাহাই সর্বসাধারণের।

ময়ূরশরীরের যে উদ্যমটা অতিরিক্ত তাহাই তাহার বিপুল পুচ্ছে অনাবশ্যক বর্ণচ্ছটায় বিচিত্র হইয়া উঠে ; এই কলাপশোভা ময়ূরের একলার নহে, তাহা বিশ্বের। প্রভাতের আলোকে পাখির আনন্দ যখন তাহার আহারবিহারের প্রয়োজনকে ছাপাইয়া উঠিতে থাকে তখনই সেই গানের অপরিমিত ঐশ্বর্যে পাখি বিশ্বসাধারণের সহিত নিজের যোগস্থাপন করে। সাহিত্যেও তেমনি মানুষ আষাঢ়ের মেঘের মতো যে রসের ধারা এবং যে জ্ঞানের ভার নিজের প্রয়োজনের মধ্যে আর ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না তাহাকেই বিশ্বমানবের মধ্যে বর্ষণ করিতে থাকে। এই উপায়েই সাহিত্যের দ্বারাই হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়, মনের সঙ্গে মন, মিলিত হইয়া মানুষ ক্রমাগত স্বকীয়, এমন-কি স্বজাতীয়, স্বাতন্ত্র্যের ঊর্ধ্বে বিপুল বিশ্বমানবে পরিণত হইবার অভিমুখে চলিয়াছে। এই কারণেই আমি মনে করি আমাদের ভাষায় 'সাহিত্য' শব্দটি সার্থক। ইহাতে আমরা নিজের অত্যাবশ্যককে অতিক্রম করিয়া উদারভাবে মানুষের ও বিশ্বপ্রকৃতির সাহিত্য লাভ করি।

কোনো দেশে যখন অতিমাত্রায় প্রয়োজনের কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায় তখন সেখানে সাহিত্য নির্জীব হইয়া পড়ে। কারণ, প্রয়োজন পরকে আঘাত করে, পরকে আকর্ষণ করে না। জর্মনিতে যখন লেসিং, গ্যেটে, শিলর, হাইনে, হেগেল, কাণ্ট্, হুম্‌বোল্‌ড্ সাহিত্যের অমরাবতী সৃজন করিয়াছিল তখন জর্মনির বাণিজ্যতরী-রণতরী ঝড়ের মেঘের মতো পাল ফুলাইয়া পৃথিবী আচ্ছন্ন করিতে ছুটে নাই। আজ বৈশ্যযুগে জর্মনির যতই মেদবৃদ্ধি হইতেছে ততই তাহার সাহিত্যের হৃৎপিণ্ড বলহীন হইয়া পড়িতেছে। ইংরেজও আজ নিজের ভাণ্ডার পূরণ করা, দুর্বলকে দুর্বলতর করা এবং সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র অ্যাংলোস্যাক্‌শন মহিমাকেই গণ্ডারের

নাসাগ্রস্থিত একশৃঙ্গের মতো ভীষণভাবে উদ্যত রাখাকেই ধর্ম বলিয়া গণ্য করিয়াছে ; তাই সেখানে সাহিত্যরঙ্গভূমিতে 'একে একে নিবিছে দেউটি' এবং আজ প্রায় 'নীরব রবাব বীণা মুরজ মুরলী'।

ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, যে-সকল ভাব বিশ্বমানবের অভিমুখীন তাহাই সাহিত্যকে জীবনদান করে। বৈষ্ণবধর্মপ্লাবনের সময় বিশ্বপ্রেম যেদিন বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে সমস্ত কৃত্রিম সংকীর্ণতার বেড়া ভাঙিয়া দিয়া উচ্চনীচ শুচি-অশুচি সকলকেই এক ভগবানের আনন্দলোকে আহ্বান করিল সেইদিনকার বাংলাদেশের গান বিশ্বের গান হইয়া জগতের নিত্য-সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু শুষ্কধর্ম যখন সর্বমানবের মহেশ্বরকে দূরে রাখিয়া মানুষের মধ্যে কেবল বাছ-বিচার এবং ভেদ-বিভেদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সীমাবিভাগ করিতে ব্যগ্র হয় তখন সাহিত্যের রসপ্লাবন শুষ্ক হইয়া যায়, কেবল তর্কবিতর্ক-বাদবিবাদের ধুলা উড়িয়া আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

বৈষ্ণবকাব্যই আমাদের দেশের সাহিত্যকে প্রথম রাজসভার সংকীর্ণ আশ্রয় হইতে বৃহৎভাবে জনসমাজের মধ্যে বাহির করিয়া আনিল। পর্বতের গুহা ভেদ করিয়া ঝর্না বাহির হইল। কিন্তু নানা দিক হইতে নানা ধারা আসিয়া না জুটিলে নদী হয় না। আজ বাংলায় গদ্যে-পদ্যে-সম্মিলিত সাহিত্য বাঙালি-জনসাধারণের হৃদয় হইতে বিচিত্র ভাবস্রোত বিবিধ জ্ঞানপ্রবাহ অহরহ আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই সাহিত্যেই বাংলার উত্তরদক্ষিণ পূর্বপশ্চিম সমস্ত প্রদেশ নিরন্তর আপনাকে মিলিত করিতেছে। নিখিল বাঙালির এই হৃদয়সংগমস্থলই বাঙালির সর্ব-প্রধান মিলনতীর্থ। এই তীর্থেই আমাদের জাগ্রত দেবতার নিত্য অধিষ্ঠান হইবে এবং এইখানেই আমরা আমাদের সমস্ত যত্ন প্রীতি ও নৈপুণ্যের দ্বারা এমন ধর্মশালা নির্মাণ করিব যেখানে চিরদিন আমাদের উত্তরকালীন যাত্রিগণ আশ্রয় লাভ করিতে পারিবে।

সাহিত্যের নামে আমরা আজ এই-যে মিলনের সভা আহ্বান করিয়াছি

এই মিলনের বিশেষ সার্থকতা প্রমাণ করিবার জন্য সাহিত্যের মূলতত্ত্বের প্রতি আপনাদের মনোযোগ প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলাম। রাজনৈতিক মিলনের মধ্যে বিরোধের বীজ আছে, তাহাতে পরজাতির সহিত সংঘাত আছে; কিন্তু আমাদের সাহিত্যের মিলন বিশুদ্ধ মিলন, তাহাতে পরের প্রতি বিরোধদৃষ্টি দিবার কোনো প্রয়োজন নাই— তাহা একান্তভাবে স্বজাতির কল্যাণকর। বঙ্গসাহিত্যে বাঙালি নিজের যে পরিচয় পাইয়াছে তাহা তাহার আত্মশক্তি হইতেই উদ্‌ভূত, এই কারণে সাহিত্যসম্মিলনে আমরা ক্ষুণ্ণ অভিমানের দর্পে অন্যের প্রতি তর্জন গর্জন করিয়া তৃপ্তিলাভের চেষ্টা করিব না। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানে আমাদের এমন সময় আসিয়াছে যখন নানা পীড়নে নানা তাড়নায় আমরা পরসংঘাতের বেদনা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিতে পারিতেছি না— এরূপ অবস্থা ব্যাধির অবস্থা। এমন অবস্থায় আমাদের প্রকৃতি তাহার স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে না। কিন্তু পরজাত বেদনা ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া নিজের মধ্যে আমরা যদি শান্তি ও প্রতিষ্ঠা অনুভব করিতে চাই, যদি নানা দুর্যোগের মধ্যেও আশার ধ্রুবতারাকে উজ্জ্বলরূপে দেখিয়া আমরা বরলাভ করিতে ইচ্ছা করি, তবে এই সাহিত্যের সম্মিলনই তাহার উপায়। যেখানে বেদনা সেইখানেই স্বভাবত বারংবার হাত পড়ে বটে, কিন্তু ব্যথাকে বারংবার স্পর্শদ্বারা ব্যথিততর করিয়া তোলাই আরোগ্যের উপায় নহে। সেই বিশেষ বেদনাকে ভুলিয়া সমস্ত দেহের আভ্যন্তরিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন প্রয়োগ করিলে যথাসময়ে এই বেদনা ক্ষীণ হইয়া আসে। আমাদিগকেও এইরূপ চিকিৎসা অবলম্বন করিতে হইবে; দিনরাত্রি কেবল অসুখের প্রতিই সমস্ত লক্ষ নিবদ্ধ রাখিলে আমাদের কল্যাণ হইবে না। যেখানে আমাদের বল, যেখানে আমাদের গৌরব, সেখানেই সর্বপ্রযত্নে আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করিয়া তুলিলে তবেই আমাদের মধ্যে প্রকৃত স্বাস্থ্য-সঞ্চার হইতে থাকিবে।

কিন্তু এ-সব তো গেল ভাবের কথা। কাজের কথা কি আমাদের সভার মধ্যে পাড়িবার কোনো স্থান নাই ?

সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে পরস্পর প্রীতিস্থাপন কল্যাণকর সন্দেহ নাই, সাহিত্যিকদের মধ্যেও প্রীতিবন্ধন যদি ঘনিষ্ঠ হয় সে তো ভালো কথা, কিন্তু বিশেষভাবে সাহিত্যিকদের মধ্যেই প্রীতিবিস্তারের যে বিশেষ ফল আছে তাহা মনে করি না। অর্থাৎ লেখকগণ পরস্পরকে ভালোবাসিলেই যে তাঁহাদের রচনাকার্যের বিশেষ উপকার ঘটে এমন কথা বলা যায় না। ব্যবসায় হিসাবে সাহিত্যিকগণ বিচ্ছিন্ন, স্ব-স্ব-প্রধান; তাঁহারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া জোট করিয়া সাহিত্যের যৌথ কারবার করেন না। তাঁহারা প্রত্যেকে নিজের প্রণালীতে নিজের মন্ত্রে নিজের সরস্বতীর সেবা করিয়া থাকেন। যাঁহারা দশের পন্থা অনুসরণ করিয়া পুঁথিগত বাঁধা মন্ত্রে কাজ সারিতে চান দেবী কখনোই তাঁহাদিগকে অমৃতফল দান করেন না। সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা অনিষ্টকর।

কার্যগতিকে যাঁহারা এইরূপ একাধিপত্যদ্বারা পরিবেষ্টিত কোনো কোনো স্থলে তাঁহাদের মধ্যে পরিচয় ও প্রীতির অভাব, এমন-কি, ঈর্ষা-কলহের সম্ভাবনা ঘটে। এক ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতার ভাব দূর করা দুঃসাধ্য। মনুষ্যস্বভাবে অনেক সংকীর্ণতা ও বিরূপতা আছে, তাহার সংশোধন প্রত্যেকের আন্তরিক ব্যক্তিগত চেষ্টার বিষয়— কোনো কৃত্রিম প্রণালী-দ্বারা তাহার প্রতিকার সম্ভবপর হইলে আমাদের অদ্যকার উদ্‌-যোগের অনেক পূর্বে সত্যযুগ ফিরিয়া আসিত।

দ্বিতীয় কথা, মাতৃভাষার উন্নতি। গৃহের উন্নতি বলিলেই গৃহস্থের উন্নতি বুঝায়, তেমনি ভাষার উন্নতির অর্থই সাহিত্যের উন্নতি, সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোনো উপায়েই ভাষা সমৃদ্ধিলাভ করিতে পারে না। কিন্তু কী করিলে সাহিত্যের উন্নতিবিধান হইতে পারে সে ভাবনা মনে উদয় হইলেও ভাবিয়া তাহার কিনারা পাওয়া কঠিন। অনাবৃষ্টির দিনে কী

করিলে মেঘের আবির্ভাব হইবে সে চিন্তা মনে আসে ; কিন্তু কী করিলে মেঘের সৃষ্টি হইতে পারে তাহার সিদ্ধান্ত করা যায় না। কয়েক জনে দল বাঁধিয়া কেবল কয়েকটা রশারশিতে টান মারিলেই যে প্রতিভার রঙ্গক্ষেত্রে ঠিক আমাদের ইচ্ছামত সময়েই যবনিকা উঠিয়া যাইবে, এমনতরো আশা করা যায় না।

তবে একটা কথা আছে। যেমন আমরা মানুষ গড়িতে পারি না বটে কিন্তু তাহার বসনভূষণ গড়িতে পারি, তেমনি সাহিত্যের গঠনকার্যে পরামর্শপূর্বক হস্তক্ষেপ করা যায় না বটে কিন্তু তাহার আয়োজনকার্য একেবারে আমাদের আয়ত্তাতীত নহে। ব্যাকরণ অভিধান ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি সংগ্রহ করা দলবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা সাধ্য।

চেষ্টার সূত্রপাত পূর্ব হইতেই হইয়াছে ; অনুকূল সময় উপস্থিত হইলেই এই উদ্‌যোগের গৌরব একদিন সকলের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ যে স্বদেশের কত অন্তরঙ্গ ও অন্যান্য বহুতর লোকখ্যাত মুখর অনুষ্ঠানের অপেক্ষা যে কত মহৎ এবং সত্য, একদিন তাহা নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ হইবে।

আমাদের দেশের পুরাবৃত্ত ভাষাতত্ত্ব লোকবিবরণ প্রভৃতি সমস্তই এপর্যন্ত বিদেশী পণ্ডিতেরা সংগ্রহ এবং আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন।

বিদেশী বলিয়া তাঁহাদের চেষ্টা অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমসংকুল হইতে পারে, এই কারণেই যে আমি আক্ষেপ করিতেছি তাহা নহে। দেশে থাকিয়া দেশের বিবরণ সংগ্রহ করিতে আমরা একেবারে উদাসীন, এমন লজ্জা আর নাই। ইহা আমাদের পক্ষে কত বড়ো একটা গালি তাহা আমরা অনুভব করি না। বেদনা সম্বন্ধে সংজ্ঞা না থাকা যেমন রোগের চরম অবস্থা তেমনি যখন হীনতার লক্ষণগুলি সম্বন্ধে আমাদের চেতনাই থাকে না তখনই বুঝিতে হইবে, দুর্গতিপ্রাপ্ত জাতির এই লজ্জাহীনতাই চরম লজ্জার বিষয়। আমাদের দেশে এই একান্ত অসাড়তার ছোটোবড়ো প্রমাণ সর্বদাই দেখিতে

পাই। বাঙালি হইয়া বাঙালিকে, পিতাভ্রাতা-আত্মীয়স্বজনকে, ইংরেজিতে পত্র লেখা যে কতবড়ো লাঞ্ছনা তাহা আমরা অনুভবমাত্র করি না; আমরা যখন অসংযত করতালি-দ্বারা স্বদেশী বক্তাকে এবং হিপ্‌হিপ্‌হুর্‌রে ধ্বনিতে স্বদেশী মান্যব্যক্তিকে উৎসাহ জানাইয়া থাকি তখন সেই কর্ণকটু বিজাতীয় বর্বরতায় আমরা কেহ সংকোচমাত্র বোধ করি না; যে-সকল অশ্রদ্ধাপরায়ণ পরদেশীর কোনোপ্রকার আমোদ-আহ্লাদে সমাজকৃত্যে আমাদের কোনোদিন কোনো আদর কোনো আহ্বান নাই তাহাদিগকে আমাদের দেবপূজায় ও বিবাহাদি শুভকর্মে গড়ের বাদ্য-সহকারে প্রচুর মদ্যমাংস সেবন করানোকে উৎসবের অঙ্গ বলিয়া আমরা গণ্য করি— ইহার বীভৎসতা আমাদের হৃদয়ের কোথাও বাজে না। তেমনি আমরা আজ অন্তত বিশ-পঁচিশ বৎসর পরের সিংহদ্বারে মুষ্টিভিক্ষার জন্য প্রতিদিন নিষ্ফল যাত্রা করিয়া নিজেকে দেশহিতৈষী বলিয়া নিঃসংশয়ে স্থির করিয়াছি, অথচ দেশের দিকে একবার ফিরিয়াও তাকাই না, ইহাও একটা অজ্ঞানকৃত প্রহসন। দেশের বিবরণ জানিতে— তাহার ভাষা ভূগোল ইতিবৃত্ত জীবজন্তু উদ্ভিদ মনুষ্য, তাহার কথাকাহিনী ধর্মসাহিত্য সম্বন্ধে সমস্ত রহস্য স্বচেষ্টায় উদ্‌ঘাটন করিতে লেশমাত্র উৎসাহ বা কৌতূহল অনুভব করি না। যে দেশকে আক্রমণ করিতে হইবে সে দেশের সমস্ত তথ্যানুসন্ধান করা শত্রুপক্ষের কত আবশ্যক তাহা আমরা জানি; আর, যে দেশের হিতসাধন করিতে হইবে সেই দেশকেই কি জানার কোনো প্রয়োজন নাই?

কিন্তু প্রয়োজনের কথা কেন তুলিব? যাঁহারা দেশ শাসন করেন তাঁহারা প্রয়োজনের গরজে দেশের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন, আর যাঁহারা দেশকে ভালোবাসেন বলিয়া থাকেন তাঁহাদের কি ভালোবাসার গরজ নাই? তাঁহারা কি দেশের অন্তঃপুরে নিজে প্রবেশ করিবেন না? সেখানকার সমস্ত সংবাদের জন্য থর্‌ন্‌টন-হাণ্টারের মুখের দিকে নিতান্ত নির্লজ্জভাবে নিরুপায় নির্বোধের মতো তাকাইয়া থাকিবেন?

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ স্বদেশের ভাষাতত্ত্ব প্রাচীনসাহিত্য কথা এবং সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। দেশের হিতসাধনের ইহাই স্থায়ীভিত্তি-স্থাপন। এই কারণেই, সাহিত্যপরিষদের অস্তিত্ব সর্বসাধারণের নিকট উৎকটরূপে প্রকাশমান না হইলেও এই সভাকে আমি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি। এক-এক বৎসরে পর্যায়ক্রমে বাংলার এক-এক প্রদেশে এই সভার সাংবৎসরিক অধিবেশনের অনুষ্ঠান করিবার জন্য আমি কিছুকাল হইল প্রস্তাব করিয়াছিলাম; সে প্রস্তাব পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্য বরিশাল সাহিত্যসম্মিলনের আহ্বানে সাহিত্যপরিষদের সেই প্রাদেশিক অধিবেশনের প্রথম আরম্ভ হওয়াতে আমি আশান্বিত হইয়াছি।

যে প্রদেশে সাহিত্যপরিষদের সাংবৎসরিক অধিবেশন হইবে প্রধানত সেই প্রদেশের উপভাষা ইতিহাস প্রাকৃতসাহিত্য লোকবিবরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ ও আলোচনা হইতে থাকিলে অধিবেশনের উদ্দেশ্য প্রচুররূপে সফল হইবে। সেখানকার প্রাচীন দেবালয় দিঘি ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানের ফোটোগ্রাফ এবং প্রাচীন-পুঁথি পুরালিপি প্রাচীন-মুদ্রা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনী হইলে কত উপকার হইবে তাহা বলা বাহুল্য। এই উপলক্ষে স্থানীয় লোকপ্রচলিত যাত্রাগান প্রভৃতির আয়োজন করা কর্তব্য হইবে।

কিন্তু সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এক দিনেই কাজ শেষ করিলে চলিবে না। বাংলাদেশের প্রত্যেক প্রদেশেই সাহিত্যপরিষদের একটি করিয়াশাখা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। এই-সকল শাখাসভা অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের আলোচনা ছাড়া প্রধানত তন্নতন্নরূপে স্থানীয় সমস্ত বিবরণ এবং রক্ষণযোগ্য প্রাচীন পুঁথি ও ঐতিহাসিক সামগ্রী সংগ্রহ করিবেন।

স্বদেশী বিবরণ-সংগ্রহে আমি একদিন সাহিত্যপরিষদে ছাত্রগণকে আহ্বান করিয়াছিলাম। এইরূপে স্বচেষ্টায় দেশের হিতসাধনের উদ্দেশে

স্বদেশের আবেদন ছাত্রশালার দ্বারে উপস্থিত করিবার জন্য সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় প্রবীণ মণ্ডলীকে অনুরোধ করিতে আমি সাহস করিয়াছিলাম। তখনো স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় নাই।

সেদিনকার অভিভাষণের[১] উপসংহারে বলিয়াছিলাম, 'জননী, সময় নিকটবর্তী হইয়াছে, স্কুলের ছুটি হইয়াছে, সভা ভাঙিয়াছে, এইবার তোমার কুটিরপ্রাঙ্গণের অভিমুখে তোমার ক্ষুধিত সন্তানের পদধ্বনি শোনা যাইতেছে, এখন বাজাও তোমার শঙ্খ, জ্বালো তোমার প্রদীপ—তোমার প্রসারিত শীতলপাটির উপরে আমাদের ছোটো-বড়ো সকল ভাইয়ের মিলনকে তোমার অশ্রুগদ্‌গদ আশীর্বচনের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকো।'

তখন আমাদের সময় যে কত নিকটবর্তী হইয়াছিল তাহা আমাদের ভাগ্যবিধাতাই নিশ্চিতরূপে জানিতেছিলেন। কিন্তু এখনো আমাদের গর্ব করিবার দিন আসে নাই, চেষ্টা করিবার দিন দেখা দিয়াছে মাত্র। যে-সকল কাজ প্রতিদিন করিবার এবং প্রতি মুহূর্তে বাহির হইতে যাহার পুরস্কার পাইবার নহে— যাহার প্রধান বাধা বাহিরের প্রতিকূলতা নহে, আমাদেরই জড়ত্ব, দেশের প্রতি আমাদেরই আন্তরিক ঔদাসীন্য—সেই-সকল কাজেই আশাপথে নূতনপ্রবৃত্ত তরুণ জীবনগুলিকে উৎসর্গ করিতে হইবে। সেইজন্য বিশেষ করিয়া আজ ছাত্রদের দিকে চাহিতেছি। এ সভায় ছাত্রসম্প্রদায়ের যাঁহারা উপস্থিত আছেন আমি তাঁহাদিগকে বলিতে পারি, প্রৌঢ়বয়সের শিখরদেশে আরোহণ করিয়াও আমি ছাত্রগণকে সুদূর প্রবীণত্বের চক্ষে একদিনও ছোটো করিয়া দেখি নাই।

বয়স্কমণ্ডলীর মধ্যে যখন দেখিতে পাই তাঁহারা পুঁথিগত বিদ্যা লইয়াই আছেন, প্রত্যক্ষ ব্যাপারের সজীব শিক্ষাকে তাঁহারা আমল দেন না—

১ দ্রষ্টব্য 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' : শিক্ষা

যখন দেখি চিরাভ্যস্ত একই চক্রপথে শতসহস্রবার পরিভ্রান্ত হইবার এবং চিরোচ্চারিত বাক্যগুলিকেই উচ্চকণ্ঠে পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিবার প্রতি তাঁহাদের অবিচলিত নিষ্ঠা— তখন ছাত্রদিগের জ্যোতিঃপিপাসু বিকাশোন্মুখ তারুণ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই আমি চিত্তের অবসাদ দূর করিয়াছি। দেশের ভবিষ্যৎকে যাঁহারা জীবনের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বহন করিয়া অম্লানতেজে শনৈঃ শনৈঃ উদয়পথে অধিরোহণ করিতেছেন তাঁহাদিগকে অনুনয়-সহকারে বলিতেছি, অন্যান্য শিক্ষার সহিত স্বদেশের সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষপরিচয়ের শিক্ষা যদি তাঁহাদের না জন্মে তবে তাঁহারা কেবল পণ্ডপাণ্ডিত্য লাভ করিবেন, জ্ঞানলাভ করিবেন না। এ দেশ হইতে কৃষিজাত ও খনিজ দ্রব্য দূরদেশে গিয়া ব্যবহার্য পণ্য-আকারে রূপান্তরিত হইয়া এ দেশে ফিরিয়া আসে; পণ্যসম্বন্ধে এইরূপ দুর্বল পরনির্ভরতা পরিত্যাগ করিবার জন্য সমাজ দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন। বস্তুত ঔদাসীন্য ও অজ্ঞতা -বশত দেশের বিধাতৃদত্ত সামগ্রীকে যদি আমরা ব্যবহারে না লাগাইতে পারি তবে দেশের দ্রব্যে আমাদের কোনো অধিকারই থাকে না, আমরা কেবল মজুরি মাত্র করি। আমাদের এই লজ্জাজনক দৈন্য দূর করার সম্বন্ধে ছাত্রদের মনে কোনো দ্বিধা নাই। কিন্তু জ্ঞানের সম্বন্ধেও ছাত্রদিগকে এই একই ভাবে সচেতন হইতে হইবে। দেশের বিষয়ে আমাদের যাহা-কিছু শিক্ষণীয় বিদেশীর হাত দিয়া প্রস্তুত হইয়া বিদেশীর মুখ দিয়া উচ্চারিত হইলে তবেই তাহা আমরা কণ্ঠস্থ করিব, দেশের জ্ঞানপদার্থে আমাদের স্বায়ত্ত অধিকার থাকিবে না, দেবী ভারতীকে আমরা বিলাতি স্বর্ণকারের গহনা পরাইতে থাকিব, এ দৈন্য আমরা আর কত দিন স্বীকার করিব! আজ আমাদের যে ছাত্রগণ দেশী মোটা কাপড় পরিতেছেন ও স্বহস্তে তাঁত বোনা শিখিতেছেন, তাঁহাদিগকে দেশের সমস্ত বৃত্তান্তসংগ্রহেও স্বদেশী হইতে হইবে। প্রত্যেক ছাত্র অবকাশকালে নিজের নিবাসপ্রদেশের ধর্মকর্ম ভাষাসাহিত্য বাণিজ্য

লোকব্যবহার ইতিহাস জনশ্রুতির বিবরণ সাধ্যমত আহরণ করিতে চেষ্টা করিবেন। এ কথা মনে রাখিতে হইবে, ইঁহাদের সকলেরই সংগ্রহ যে আমাদের সাহিত্যে ব্যবহারযোগ্য হইবে তাহা নহে, কিন্তু এই উপায়ে স্বাধীন জ্ঞানার্জনের উদ্যম তাঁহাদের গ্রন্থভারক্লিষ্ট মনের জড়তা দূর করিয়া দিবে এবং দেশের কোনো পদার্থকেই তুচ্ছজ্ঞান না করিবার এবং দেশী সমস্ত জিনিসই নিজে দেখিবার শুনিবার ও বুঝিবার চেষ্টা তাঁহাদিগকে যথার্থ স্বদেশপ্রীতির দিকে অগ্রসর এবং স্বদেশসেবার জন্য প্রস্তুত করিবে। কোনো প্রীতিই সম্পূর্ণ অকৃত্রিম ও পরিপক্ক হইতেই পারে না, যদি তাহা প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হয়। ভালোবাসা অক্লান্ত যত্নে জানিতে ইচ্ছা করে এবং জানা হইলে ভালোবাসা আরো সত্য ও সুগভীর হয়। আমাদের স্বদেশপ্রেমের সেই ভিত্তির অভাব আছে এবং আমাদের মনে সেই ভিত্তিরচনার জন্য যদি দুর্নিবার আগ্রহ উপস্থিত না হয় তবে যেন আমরা স্বদেশপ্রেমের অভিমান না করি। যদি এই প্রেমের অভিমানী হইবার প্রকৃত অধিকার আমরা না লাভ করিতে পারি তবে স্বদেশ আমাদের স্বদেশ নহে। জ্ঞানের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, সেবার দ্বারা, পরিপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারাই অধিকার লাভ করা যায়। জগতে যে জাতি দেশকে ভালোবাসে সে অনুরাগের সহিত স্বদেশের সমস্ত সন্ধান নিজে রাখে, পরের পুঁথির প্রত্যাশায় তাকাইয়া থাকে না ; স্বদেশের সেবা যথাসাধ্য নিজে করে, কেবল পরের কর্তব্যবোধকে জাগ্রত করিবার উপায় সন্ধান করে না ; এবং দেশের সমস্ত সম্পৎকে নিজের সম্পূর্ণ ব্যবহারে আনিতে চেষ্টা করে, বিদেশী ব্যবসায়ীর অশুভাগমনের প্রতীক্ষায় নিজেকে পথের কাঙাল করিয়া রাখে না। তাই আজ আমি আমাদের ছাত্রগণকে বলিতেছি, দেশের উপরে সর্বাগ্রে সর্বপ্রযত্নে জ্ঞানের অধিকার বিস্তার করো, তাহার পরে প্রেমের এবং কর্মের অধিকার সহজে প্রশস্ত হইতে থাকিবে।

আজ আমি বাংলাদেশের দুই বিভিন্ন কালের উদয়াস্তসন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, হে ছাত্রগণ, কবির বাণী স্মরণ করিতেছি—

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্।
আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ॥

এখন আমাদের কালের সিতরশ্মি চন্দ্রমা অস্তমিত হইতেছে, তোমাদের কালের তেজ-উদ্‌ভাসিত সূর্যোদয় আসন্ন— তোমরা তাহারই অরুণ-সারথি। আমরা ছিলাম দেশের সুপ্তিজালজড়িত নিশীথে; অন্যত্র হইতে প্রতিফলিত ক্ষীণজ্যোতিতে আমরা দীর্ঘরাত্রি অপরিস্ফুট ছায়ালোকের মায়া বিস্তার করিতেছিলাম। আমাদের সেই কর্মহীন কালে কত অলীক বিভ্রম এবং অকারণ আতঙ্ক দিগন্তব্যাপী অস্পষ্টতার মধ্যে প্রেতের মতো সঞ্চরণ করিতেছিল। আজ তোমরা পূর্বগগনে নিজের আলোকে দীপ্তিমান হইয়া উঠিতেছ। এখনো জল স্থল আকাশ নিস্তব্ধ হইয়া নবজীবনের পূর্ণবিকাশের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে; অনতিকাল পরেই গৃহে গৃহে, পথে পথে কর্মকোলাহল জাগ্রত হইয়া উঠিবে। এই কর্মদিনের প্রখরদীপ্তি দেশের সমস্ত রহস্য ভেদ করিবে; ছোটোবড়ো সমস্তই তোমাদের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিবে। তখন তোমাদের কবিবিহঙ্গগণ আকাশে যে গান গাহিবে তাহাতে অবসাদের আবেশ ও সুপ্তির জড়িমা থাকিবে না; তাহা প্রত্যক্ষ আলোকের আনন্দে, তাহা করতললব্ধ সত্যের উৎসাহে, সহস্র জীবন হইতে সহস্র ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। এই জ্যোতির্ময় আশাদীপ্ত প্রভাতকে সুমহান্ সুন্দর পরিণামে বহন করিয়া লইবার ভার তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমরা বিদায়ের নেপথ্যপথে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলাম। তোমাদের উদয়পথ মেঘনির্মুক্ত হউক, এই আমাদের আশীর্বাদ।

ফাল্গুন ১৩১৩

বাংলাদেশের স্থানে স্থানে সাহিত্যপরিষদের শাখাস্থাপন ও বৎসরে বৎসরে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় পরিষদের বাৎসরিক মিলনোৎসব-সাধনের প্রস্তাব অন্তত দুইবার আমার মুখ দিয়া প্রচার হইয়াছে। তাহাতে কী উপকারের আশা করা যায় এবং তাহার কার্যপ্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত তাহাও সাধ্যমত আলোচনা করিয়াছি। অতএব তৃতীয়বারে আমাকে বিশ্রাম করিতে দেওয়া উচিত ছিল। একই জমিতে একই ফসল বারবার চাষ করিতে গেলে ফলন ভালো হয় না, নিঃসন্দেহই আমার সুহৃদ্‌গণ সে কথা জানেন ; কিন্তু তাঁহারা যে ফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়াও আমাকে সভাস্থলে পুনশ্চ আকর্ষণ করিলেন এর কারণ তো আর কিছু বুঝি না, এ কেবল আমার প্রতি পক্ষপাত। এই অকারণ পক্ষপাত ব্যাপারটার অপব্যয় অন্যের সম্বন্ধে সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে সেটা তেমন অত্যুগ্র অন্যায় বলিয়া ঠেকে না— মনুষ্যস্বভাবের এই আশ্চর্যধর্মবশত আমি বন্ধুদের আহ্বান অমান্য করিতে পারিলাম না। ইহাতে যদি আমার অপরাধ হয় ও আমাকে অপবাদ সহ্য করিতে হয় তাহাও স্বীকার করিতে হইবে।

পূর্বে আমাদের দেশে পাল-পার্বণ অনেক রকমের ছিল ; তাহাতে আমাদের একঘেয়ে একটানা জীবনের মাঝে মাঝে নাড়া দিয়া ঢেউ তুলিয়া দিত। আজকাল সময়াভাবে অন্নাভাবে ও শ্রদ্ধার অভাবে সে-সকল পার্বণ কমিয়া আসিয়াছে। এখন সভা-সমিতি-সম্মিলন সেই-সকল পার্বণের জায়গা দখল করিতেছে। এইজন্য শহরে-মফস্বলে কত রকম উপলক্ষে কত প্রকার নাম ধরিয়া কত সভাস্থাপন হইতেছে, সেই-সকল সভায় দেশের বক্তাদের বক্তৃতার পালা জমাইবার জন্য কত চেষ্টা ও কত আয়োজন হইয়া থাকে তাহা সকলেই জানেন।

অনেকে এই-সকল চেষ্টাকে নিন্দা করেন ও এই-সকল আয়োজনকে হুজুগ বলিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকেন। বাংলা ভাষায় এই হুজুগ শব্দটা

কোথা হইতে আসিল তাহা আমাদের পরিষদের শব্দতাত্ত্বিক মহাশয়গণ স্থির করিবেন ; কিন্তু এটা যে আমাদের সমাজের শনিগ্রহের রচনা, আমার তাহাতে সন্দেহ নাই। নিজের জড়ত্বকে অন্য লোকের উৎসাহের চেয়ে বড়ো পদবী দিবার জন্যই প্রায় অচল লোকেরা এই শব্দটা ব্যবহার করিয়া দেশের সমস্ত উদ্যমের মূলে হুল ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

দেশের মধ্যে কিছুকাল হইতেই এই-যে চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে এটা যদি হুজুগ হয় তো হোক। আমাদিগকে ভুল করিতে দাও, গোল করিতে দাও, বাজে কাজ করিতে দাও, পাঁচ জন লোককে ডাকিতে ও পাঁচ জায়গায় ঘুরিতে দাও। এই নড়াচড়া চলুক। এই নড়াচড়ার দ্বারাই যেটা যে ভাবে গড়িবার সেটা ক্রমে গড়িয়া উঠে, যেটা বাহুল্য সেটা আপনি বাদ পড়ে, যেটা বিকৃতি সেটার সংশোধন হইতে থাকে। বিবেচকভাবে চুপচাপ করিয়া থাকিলে তাহার কিছুই হয় না। আমাদের মনটা যে স্থির হইয়া নাই, দেশের নানা স্থানেই যে ছোটোবড়ো ঘূর্ণাবেগ আজকাল কেবলই প্রকাশ পাইতেছে, ইহাতে বুঝা যাইতেছে একটা সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলিতেছে। ঘুরিতে ঘুরিতে জ্যোতির্বাষ্পই যে কেবল আকার ধারণ করে তাহা নহে, মানুষের মনগুলি যখন গতির বেগ পায় তখন তাহারা জমাট বাঁধিয়া একটা-কিছু গঠন না করিয়া থাকিতে পারে না। অন্তত, আমরা যদি কিছু গড়িয়া তুলিতে চাই তবে এইপ্রকার বেগবান অবস্থাই তাহার পক্ষে অনুকূল। কুমোরের চাকা যখন ঘুরিতে থাকে তখনই কুমোর যাহা পারে গড়িয়া লয় ; যখন তাহা স্থির থাকে তখন তাহার কাছে প্রত্যাশা করিবার কিছুই থাকে না।

আজ দেশের মধ্যে চারি দিকে যে একটা বেগের সঞ্চার দেখা যাইতেছে তাহাতেই হঠাৎ দেশের কাছে আমাদের সমস্ত প্রত্যাশাই বাড়িয়া গেছে। আমাদের যাহার মনে যে উদ্দেশ্য আছে এই বেগের সুযোগে তাহা সিদ্ধ করিয়া লইবার জন্য আমরা সকলেই চকিত হইয়া উঠিয়াছি।

আজ আমরা দশ জনে যে-কোনো উপলক্ষে একত্র হইলেই তাহার মধ্য হইতে কিছু একটা মথিয়া উঠিবে, এমন ভরসা হয়। এইরকম সময়ে যাহা অনপেক্ষিত তাহাও দেখা দেয়, যাহাকে আশা করিবার কোনো কারণ ছিল না তাহাও হঠাৎ সম্ভব হইয়া উঠে, আমাদের প্রত্যেকের শক্তি সামান্য হইলেও সমস্ত সমাজের বেগে ক্ষণে ক্ষণে অসাধ্যসাধন হইতে থাকে।

আজ আমাদের সাহিত্যপরিষদেরও আশা বাড়িয়া গেছে। এই-যে এখানে নানা জেলা হইতে আমরা বাঙালি একত্র হইয়াছি, এখানে শুধু একটা মিলনের আনন্দেই এই সম্মিলনকে শেষ করিয়া দিয়া যাইব এমন আমরা মনে করি না; হয়তো এইবারেই, ফল যেমন যথাসময়ে ডাল ছাড়িয়া ঠিকমত জমিতে পড়ে ও গাছ হইবার পথে যায়, সাহিত্যপরিষদ্‌ও সেইরূপ নিজেকে বৃহৎ বাংলাদেশের মধ্যে রোপিত করিবার অবসর পাইবে। এবার হয়তো সে বৃহত্তর জন্ম লাভ করিবার জন্য বাহির হইয়াছে। আপনাদের আহ্বান শুধু সমাদরের আহ্বান নহে, তাহা সফলতার আহ্বান। আমরা তো এইমতই আশা করিয়াছি।

যদি আশা বৃথাই হয়, তবু মিলনটা তো কেহ কাড়িয়া লইবে না; বুদ্ধিমান কবি তো বলিয়াছেন যে, মহাবৃক্ষের সেবা করিলে ফল যদি বা না পাওয়া যায়, ছায়াটা পাওয়া যাইবেই। কিন্তু ওইটুকু নেহাৎপক্ষের আশা লইয়াই আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিব না। আমরা এই কথাই বলিব, আচ্ছা, আজ যদি বা শুধু ছায়াই জুটিল, নিশ্চয়ই কাল ছায়াও পাইব ফলও ধরিবে; কোনোটা বাদ দিব না। সফলতা সম্বন্ধে আধা-আধি রফানিষ্পত্তি করা কোনোমতেই চলিবে না। বহরমপুরের ডাকে আজ আমরা সাহিত্যপরিষদ্ অত্যন্ত লোভ করিয়াই এখানে আসিয়া জুটিয়াছি; শুধু আহার দিয়া বিদায় করিলে নিন্দার বিষয় হইবে, দক্ষিণা চাই। সেই দক্ষিণার প্রস্তাবটাই আজ আপনাদের কাছে পাড়িব।

আমার দেশকে আমি যত ভালোবাসি তার দশগুণ বেশি ভালোবাসা

ইংরেজের কর্তব্য এ কথা আমরা মুখে বলি না, আমাদের ব্যবহারে তাহাই প্রকাশ পায়। এইজন্য ভারতবর্ষের হিতসাধনে বিদেশীর যত-কিছু ত্রুটি তাহা ঘোষণা করিয়া আমাদের শ্রান্তি হয় না, আর দেশীলোকের যে ঔদাসীন্য সে সম্বন্ধে আমরা একেবারেই চুপ। কিন্তু এ কথাটার আলোচনা বিস্তর হইয়া গেছে, এমন-কি আমার আশঙ্কা হয়, কথাটা আপনার অধিকারের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া ছুটিয়াছে বা। কথা-জিনিসটার দোষই ওই— সেটা হাওয়ার জিনিস কিনা, তাই উক্তি দেখিতে দেখিতে অত্যুক্তি হইয়া উঠে। এখন যেন আমরা একটু বেশি তারস্বরে বলিতেছি, ইংরেজের কাছ হইতে আমরা কিছুই লইব না। কেন লইব না? দেশের হিতের জন্য যেখানে যাহা পারি সমস্ত আদায় করিব। কেবল এইটুকু পণ করিব, সেই লওয়ার পরিবর্তে নিজেকে বিকাইয়া দিব না। যাহা বিশেষভাবে ইংরেজ গবর্মেণ্টের কাছ হইতেই পাইবার তাহা ষোলো-আনাই সেইখান হইতেই আদায় করিবার পূরা চেষ্টাই করিতে হইবে; না করিলে সে তো নিতান্তই ঠকা। নির্বুদ্ধিতাই বীরত্ব নহে।

কিন্তু এই আদায় করিবার কোনো জোর থাকে না, আমরা যদি নিজের দায় নিজে স্বীকার না করি। দেশের যে-সকল কাজ আমরা নিজে করিতে পারি তাহা নিজেরা সাধ্যমত করিলে তবেই আদায় করাটা যথার্থ আদায় করা হয়, ভিক্ষা করা হয় না। এ নহিলে অন্যের কাছে দাবি করার আব্রুই থাকে না। কিছুকাল হইতে আমাদের সেই আব্রু একেবারে ঘুচিয়া গিয়াছিল; সেইজন্যই লজ্জাবোধটাকে এত জোর করিয়া জাগাইবার একটা একান্ত চেষ্টা চলিতেছে। সকলেই জানেন, জামেকায় ভূমিকম্পের উৎপাতের পর সেখানকার কিংস্টন শহরে ভারী একটা সংকট উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সংকটের সময় আমেরিকার রণতরীর কাপ্তেন ডেভিস তাঁহার মানোয়ারি গোরার দল লইয়া উপকার করিবার উৎসাহ-বশত কিছু অতিশয় পরিমাণে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা

সেখানকার ঘোরতর দুর্যোগেও জামেকাদ্বীপের ইংরেজ অধ্যক্ষ সহ্য করিতে পারেন নাই। ইহার ভাবখানা এই যে, অত্যন্ত দুঃসময়েও পরের কাছে সাহায্য লইবার কালে নিজের ক্ষমতার অপমান করা চলে না; তা যদি করি তবে যাহা পাই তাহার চেয়ে দিই অনেক বেশি। পরের কাছে আনুকূল্য লওয়া নিতান্ত নিশ্চিন্তমনে করিবার নহে।

এইরূপ দান পাইয়া যদি ক্ষমতা বিক্রয় করি, আমার দেশের কাজ আমি করিবই এবং আমিই করিতে পারি এই পুরুষোচিত অভিমান যদি অনর্গল আবেদনের অজস্র অশ্রুজলধারায় বিসর্জন দিই, তবে তেমন করিয়া পাওয়ার ধিক্কার হইতে ঈশ্বর যেন আমাদিগকে নৈরাশ্যদ্বারাই রক্ষা করেন।

বস্তুত এমন করিয়া কখনোই আমরা কোনো আসল জিনিস পাইতেই পারি না। গ্রামে কোনো উৎপাত ঘটিলে আমরা রাজ-সরকারে প্রার্থনা করিয়া দুজন পুলিসের লোক বেশি পাইতে পারি, কিন্তু নিজেরাই যদি সমবেত হইয়া আত্মরক্ষার সুব্যবস্থা করিতে পারি তবে রক্ষাও পাই রক্ষার শক্তিও হারাইতে হয় না। বিচারের সুযোগের জন্য দরখাস্ত করিয়া আদালত বাড়াইয়া লইতে পারি, কিন্তু নিজেরা যদি নিজের সালিসি-সভায় মকদ্দমা মিটাইবার বন্দোবস্ত করি তবে অসুবিধার জড় মরিয়া যায়। মন্ত্রণাসভায় দুজন দেশী লোক বেশি করিয়া লইলেই কি আমরা রেপ্রেজেণ্টেটিভ গবর্মেণ্ট্ পাইলাম বলিয়া হরির লুট দিব? বস্তুত আমাদের নিজের পাড়ার, নিজের গ্রামের, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অশন-বসন-সম্বন্ধীয় সমস্ত শাসনব্যবস্থা আমরা যদি নিজেরা গড়িয়া তুলিতে পারি তবেই যথার্থ খাঁটি জিনিসটি আমরা পাই। অথচ এই-সমস্ত অধিকার গ্রহণ করা পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে না। এ আমাদের নিজের ইচ্ছা চেষ্টা ও ত্যাগস্বীকারের অপেক্ষা করে। আমাদের দেশ-জোড়া এই-সমস্ত কাজই আমাদের পথ চাহিয়া বসিয়া আছে; কিন্তু সে পথও আমরা মাড়াই না, পাছে সেই কর্তব্যের সঙ্গে চোখে চোখেও দেখা হয়। যাহাদের এমনি

দুরবস্থা তাহারা পরের কাছ হইতে কোনো দুর্লভ জিনিস চাহিয়া লইয়া সেটাকে যথার্থভাবে রক্ষা করিতে পারিবে, এমন দুরাশা কেন তাহাদের মনে স্থান পায়? যে কাজ আমাদের হাতের কাছেই আছে এবং যাহা আমরা ছাড়া আর-কেহই ঠিকমত সাধন করিতে পারে না তাহাকেই সত্যরূপে সম্পন্ন করিতে থাকিলে তবেই আমরা সেই শক্তি পাইব— যে শক্তির দ্বারা পরের কাছ হইতে নিঃসংকোচে আমাদের প্রাপ্য আদায় করিয়া তাহাকে কাজে খাটাইতে পারি। এইজন্যই বলিতেছি, যাহা নিতান্তই আমাদের নিজের কাজ তাহার যেটাতেই হাত দিব সেটার দ্বারাই আমাদের মানুষ হইয়া উঠিবার সহায়তা হইবে এবং মানুষ হইয়া উঠিলে তবেই আমাদের দ্বারা সমস্তই সম্ভব হইতে পারিবে।

আমরা যখন প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব লইয়া স্বদেশাভিমান অনুভব করিতে শুরু করিয়াছিলাম তখন সেই প্রাচীন বিবরণের জোগান পাইবার জন্য আমরা বিদেশের দিকেই অঞ্জলি পাতিয়াছিলাম; এমন কোনো পণ্ডিত পাইলাম না যিনি স্বদেশের ইতিহাস উদ্ধার করিবার জন্য জর্মান পণ্ডিতের মতো নিজের সমস্ত চেষ্টা ও সময় এই কাজে উৎসর্গ করিতে পারিলেন। আজ আমরা স্বদেশপ্রেম লইয়া কম কথা বলিতেছি না; কিন্তু আজও এই স্বদেশের সামান্য একটি বৃত্তান্তও যদি জানিতে ইচ্ছা করি তবে ইংরেজের রচিত পুঁথি ছাড়া আমাদের গতি নাই। এমন অবস্থায় পরের দরবারে দাবি লইয়া দাঁড়াই কোন্ মুখে, সম্মানই বা চাই কোন্ লজ্জায়, আর সফলতাই বা প্রত্যাশা করি কিরূপে? যাহার ব্যাবসা চলিতেছে বাজারে তাহারই ক্রেডিট থাকে, সুতরাং অন্য ধনীর কাছ হইতে সে যে সাহায্য পায় তাহাতে তাহার লজ্জার কারণ ঘটে না। কিন্তু যাহার সিকি পয়সার কারবার নাই সে যখন ধনীর দ্বারে দাঁড়ায় তখন কি সে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়ায় না? এবং তখন যদি সে আঁজলা ভরিয়া কড়ি না পায় তবে তাহা লইয়া বকাবকি করা কি তাহার পক্ষে

আরো অবমানকর নহে ?

সেইজন্য আমি এই কথা বার বার বলিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, নিজের দেশের কাজ যখন আমরা নিজেরা করিতে থাকিব তখনই অন্যের কাছ হইতেও যথোচিত কাজ আদায় করিবার বল পাইব। নিজেরা নিশ্চেষ্ট থাকিয়া কেবলমাত্র গলার জোরে যাহা পাই সেই পাওয়াতে আমাদের গলার জোর ছাড়া আর-সকল জোরই কমিয়া যায়।

আমার অদৃষ্টক্রমে এই কথাটা আমাকে অনেক দিন হইতে অনেক বার বলিতে হইয়াছে এবং বলিতে গিয়া সকল সময় সমাদরও লাভ করি নাই; এখন না বলিলেও চলে, কারণ এখন অনেকেই এই কথাই আমার চেয়ে অনেক জোরেই বলিতেছেন। কিন্তু কথা-জিনিসটার এই একটা মস্ত দোষ যে তাহা সত্য হইলেও অতি শীঘ্রই পুরাতন হইয়া যায় এবং বরঞ্চ সত্যের হানি লোকে সহ্য করে, তবু পুরাতনত্বের অপরাধ কেহ ক্ষমা করিতে পারে না। কাজ-জিনিসটার মস্ত সুবিধা এই যে, যতদিনই তাহা চলিতে থাকে ততদিনই তাহার ধার বাড়িয়া ওঠে।

এইজন্যই বাংলাদেশের ভাষাতত্ত্ব পুরাবৃত্ত গ্রাম্যকথা প্রভৃতি দেশের সমস্ত ছোটো-বড়ো বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিবার জন্য সাহিত্যপরিষদ্ যখন দেশের সভার একটি ধারে আসিয়া আসন লইল আমরা আনন্দে ও গৌরবে তাহার অভিষেককার্য করিয়াছিলাম।

যদি বলেন 'সাহিত্যপরিষদ্ এত দিনে কী এমন কাজ করিয়াছে' তবে সে কথাটা ধীরে বলিবেন এবং সংকোচের সহিত বলিবেন। আমাদের দেশের কাজের বাধা যে কোথায় তাহা আমরা তখনই বুঝিতে পারি যখনই আমরা নিজেরা কাজ হাতে লই— সে বাধা আমরা নিজেরা, আমরা প্রত্যেকে। যে কাজকে আমরা আমাদের কাজ বলিয়া বরণ করি তাহাকে আমরা কেহই আমার কাজ বলিয়া গ্রহণ করিতে এখনো শিখি নাই। সেইজন্য আমরা সকলেই পরামর্শ দিতে অগ্রসর হই, কেহই সাহায্য করিতে

প্রস্তুত হই না; ত্রুটি দেখিলে কর্মকর্তার নিন্দা করি, অকর্মকর্তার অপবাদ নিজের উপর আরোপ করি না; ব্যর্থতা ঘটিলে এমনভাবে আস্ফালন করি যেন কাজ নিষ্ফল হইবে পূর্বেই জানিতাম এবং সেইজন্যই অত্যন্ত বুদ্ধিপূর্বক নির্বোধের উদ্‌যোগে যোগ দিই নাই। আমাদের দেশে জড়তা লজ্জিত নহে, অহংকৃত; আমাদের দেশে নিশ্চেষ্টতা নিজেকে গোপন করে না, উদ্‌যোগকে ধিক্‌কার দিয়া এবং প্রত্যেক কাজের খুঁত ধরিয়া সে নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে চায়। এইজন্য আমাদের দেশে এ দৃশ্য সর্বদাই দেখিতে পাই যে, দেশের কাজ একটিমাত্র হতভাগ্য টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, হাওয়া এবং স্রোত দুই উল্টা, এবং দেশের লোক তীরে বসিয়া দিব্য হাওয়া খাইতে খাইতে কেহ বা প্রশংসা করিতেছে, কেহ বা লোকটার অক্ষমতা ও বিপত্তি দেখিয়া নিজেকে ধন্যজ্ঞান করিতেছে।

এমন অবস্থায় দেশের অতি ক্ষুদ্র কাজটিকেও গড়িয়া তোলা কত কঠিন সে কথা আমরা যেন প্রত্যেকে বিবেচনা করিয়া দেখি। একটা ছোটো ইস্কুল, একটা সামান্য লাইব্রেরি, একটা আমোদ করিবার দল বা একটা অতি ছোটো রকমেরও কাজ করিবার ব্যবস্থা আমরা জাগাইয়া রাখিতে পারি না। সমুদ্রে জল থই-থই করিতেছে, তাহার এক ফোঁটা মুখে দিবার জো নাই; আমাদের দেশেও ষষ্ঠীর প্রসাদে মানুষের অভাব নাই, কিন্তু কর্তব্য যখন তাহার পতাকা লইয়া আসিয়া শঙ্খধ্বনি করে তখন চারি দিকে চাহিয়া একটি মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই-যে আমাদের দেশে কোনোমতেই কিছুই আঁট বাঁধে না, সংকল্পের চারি দিকে দল জমিয়া উঠে না, কোনো আকস্মিক কারণে দল বাঁধিলেও সকালের দল বিকাল বেলায় আলগা হইয়া আসে, এইটি ছাড়া আমাদের দেশে আর দ্বিতীয় কোনো বিপদ নাই। আমাদের এই একটিমাত্র শত্রু। নিজের মধ্যে এই প্রকাণ্ড শূন্যতা আছে বলিয়াই আমরা অন্যকে গালি দিই। আমরা কেবলই কাঁদিয়া বলিতেছি: আমাদিগকে দিতেছে না।

বিধাতা আমাদের কানে ধরিয়া বলিতেছেন : তোমরা লইতেছ না। আমরা একত্র হইব না, চেষ্টা করিব না, ত্যাগ করিব না, কষ্ট সহিব না, কেবলই চাহিব এবং পাইব— কোনো জাতির এতবড়ো সর্বনেশে প্রশ্রয়ের দৃষ্টান্ত জগৎসংসারের ইতিহাসে তো আজ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। তবু কেবল আমাদেরই জন্য বিশ্ববিধাতার একটি বিশেষ বিধির অপেক্ষায় আকাশে চাহিয়া বসিয়া আছি ; সে বিধি আমাদের দেশে কবে চলিবে জানি না, কিন্তু বিনাশ তো সবুর করিবে না। সবুর করেও নাই ; অনশন মহামারী অপমান গৃহবিচ্ছেদ চারি দিকে জাগিয়া উঠিয়াছে। রুদ্রদেব বজ্র-হাতে আমাদের অনেক কালের পাপের হিসাব লইতে আসিয়াছেন ; খবরের কাগজে মিথ্যা লিখিতে পারি, সভাস্থলে মিথ্যা বলিতে পারি, রাজার চোখে ধুলা দিতে পারি, এমন-কি, নিজেকে ফাঁকি দেওয়াও সহজ, কিন্তু তাঁহাকে তো ভুল বুঝাইতে পারিলাম না। যাহার উপরেই দোষারোপ করি-না কেন, রাজাই হোক বা আর যেই হোক, মরিতেছি তো আমরাই ; মাথা তো আমাদেরই হেঁট হইতেছে এবং পেটের ভাত তো আমাদেরই গেল। পরের কর্তব্যের ত্রুটি অন্বেষণ করিয়া আমাদের শ্মশানের চিতা তো নিবিল না।

আরামের দিনে নানাপ্রকার ফাঁকি চলে, কিন্তু মৃত্যুসহচর বিধাতা যখন স্বয়ং দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন তখন আজ আর মিথ্যা দিয়া হিসাব-পূরণ হইবে না। এখন আমাদের কঠোর সত্যের দিন আসিয়াছে। আজ আমরা যে-কোনো কাজকেই গ্রহণ করি-না কেন, সকলে মিলিয়া সে কাজকে সত্য করিয়া তুলিতে হইবে। দেশের যে-কোনো যথার্থ মঙ্গল-অনুষ্ঠানকে আমরা উপবাসী করিয়া ফিরাইব সেই আমাদের পৃথিবীর মধ্যে মাথা তুলিবার ও বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার কিছু-না-কিছু কাড়িয়া লইয়া চলিয়া যাইবে। ছোটো হউক বড়ো হউক, নিজের হাতে দেশের যে-কোনো কাজকে সত্য করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব সেই কাজই

রুদ্রের দরবারে আমাদের উকিল হইয়া দাঁড়াইবে, সেই আমাদের রক্ষার উপায় হইবে।

কেবল সংকল্পের তালিকা বাড়াইয়া চলিলে কোনো লাভ নাই ; কিন্তু যেমন করিয়া হউক, দেশের যথার্থ স্বকীয় একটি-একটি কাজকে সফল করিয়া তুলিতেই হইবে। সে কেবল সেই একটি বিশেষ কার্যের ফললাভ করিবার জন্য নহে ; সকল কার্যেই ফললাভের অধিকার পাইবার জন্য। কারণ, সফলতাই সফলতার ভিত্তি। একটাতে কৃতকার্য হইলেই অন্যটাতে কৃতকার্য হইবার দাবি পাকা হইতে থাকে, এই কথা মনে রাখিয়া দেশের কাজগুলিকে সফল করিবার দায় আমাদের প্রত্যেককে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহার টাকা আছে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া টাকা ভোগ করিবেন না, যাঁহার বুদ্ধি আছে তিনি কেবল অন্যের প্রয়াসকে বিচার করিয়া দিনযাপন করিবেন না ; দেশের কাজগুলিকে সফল করিবার জন্য যেখানেই আমাদের সকলের চেষ্টা মিলিত হইতে থাকিবে সেখানেই আমাদের স্বদেশ সত্য হইয়া উঠিবে।

দেশ-জিনিসটা তো কাহাকেও নিজের শক্তিতে উপার্জন করিয়া আনিতে হয় নাই। আমরা যে পৃথিবীতে এত জায়গা থাকিতে এই বাংলাদেশেই জন্মিতেছি ও মরিতেছি সে তো আমাদের নিজগুণে নহে, এবং বাংলাদেশেরও বিশেষ পুণ্যপ্রভাবে এমনও বলিতে পারি না। দেশ পশুপক্ষী-কীটপতঙ্গেরও আছে। কিন্তু স্বদেশকে নিজে সৃষ্টি করিতে হয়। সেইজন্যই স্বদেশে কেহ হাত দিতে আসিলে স্বদেশীমাত্রেই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে ; কেননা, সেটা যে বহুকাল হইতে তাহাদের নিজের গড়া— সেখানে যে তাহাদের বহু যুগের আহরিত মধু সমস্ত সঞ্চিত হইয়া আছে। যে-সকল দেশের লোক তাহাদের নিজের শরীর-মন-বাক্যের সমস্ত চেষ্টার দ্বারা জ্ঞানে প্রেমে কর্মে স্বদেশকে আপনি গড়িয়া তুলিতেছে, দেশের অন্নবস্ত্র-স্বাস্থ্যজ্ঞানের সমস্ত অভাব আপনি পূরণ করিয়া তুলিতেছে, দেশকে

তাহারাই স্বদেশ বলিতে পারে এবং স্বদেশ-জিনিসটা যে কী তাহাদিগকে বক্তৃতা করিয়া বুঝাইতেও হয় না; মৌমাছিকে আপন চাকের মর্যাদা বুঝাইবার জন্য বড়ো বড়ো পুঁথির দোহাই পাড়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আমরা দেশের কোনো সত্যকর্মে নিজেরা হাত না লাগাইয়াও আজ পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর ইংরেজি ও বাংলায়, গদ্যে ও পদ্যে, স্বদেশের গৌরব ঘোষণা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু এই স্বদেশের স্ব'টা যে কোথায় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া গোল্‌ড্‌স্টুকর ম্যাক্স্‌মূলর মুয়রের প্রত্নতত্ত্ব খুঁজিয়া হয়রান হইতে হইয়াছে। শাণ্ডিল্যমুনির আশ্রমের জায়গাটার যদি আজ হঠাৎ আবিষ্কার হয় তবে আমি শাণ্ডিল্যগোত্রের দোহাই দিয়া সেটা দখল করিতে গেলে আইনের পেয়াদা তো মানিবে না। পাঁচ-সাত হাজার বৎসর পূর্বের উপর স্বদেশের স্বকীয়ত্বের বরাত দিয়া গৌরব করিতে বসিলে কেবল গলা ভাঙাই সার হয়। স্বকীয়ত্বকে অবিচ্ছিন্ন নিজের চেষ্টায় রক্ষা করিতে হয়। আজ আমাদের পক্ষে স্বদেশ কোথায়? সমস্ত দেশের মধ্যে যেখানেই আমরা নিজের শক্তিতে দেশবাসীদের জন্য কিছু-একটা গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছি কেবলমাত্র সেইখানেই আমাদের স্বদেশ। এমনি করিয়া যাহা-কিছু গড়িয়া তুলিতে পারিব তাহাতেই আমাদের স্বদেশের বিস্তার ঘটিতে থাকিবে, সেই স্বদেশের উপর আমাদের সমস্ত প্রাণের দাবি জন্মিতে থাকিবে; অন্যে যাহা দয়া করিয়া দিবে তাহাতেও নহে এবং বহু হাজার বৎসর পূর্বে যে দলিল পাকা হইয়াছিল তাহাতেও না।

অদ্যকার সভায় আমার নিবেদন এই, সাহিত্যপরিষদের মধ্যে আপনারা সকলে মিলিয়া স্বদেশকে সত্য করিয়া তুলুন। বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলা এবং প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক বাঙালি সাহিত্যপরিষদের মধ্যে নিজের ইচ্ছা ও চেষ্টাকে একত্রে জাগ্রত করিয়া আজ যাহা অস্ফুট আছে তাহা স্পষ্ট করুন, যাহা ক্ষুদ্র আছে তাহাকে মহৎ করুন। কোন্‌খানে এই পরিষদের কী অসম্পূর্ণতা আছে তাহা লইয়া প্রশ্ন করিবেন না, ইহাকে

সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়া প্রত্যেকে গৌরবলাভ করুন। দেবপ্রতিমা ঘরে আসিয়া পড়িলে গৃহস্থকে তাহার পূজা সারিতেই হয়; আজ বাঙালির ঘরে তিনটি দেবপ্রতিমা আসিয়াছে— সাহিত্যপরিষৎ, শিক্ষাপরিষৎ ও শিল্পবিদ্যালয় ইহাদিগকে ফিরাইয়া দিলে দেশে যে অমঙ্গল ঘটিবে তাহার ভার আমরা বহন করিতে পারিব না।

অনেকের মনে এ প্রশ্ন উঠিবে, দেশের কাজ হিসাবে সাহিত্যপরিষদের কাজটা এমনি কী একটা মস্ত ব্যাপার! এইরূপ প্রশ্ন আমাদের দেশের একটা বিষম বিপদ। য়ুরোপ-আমেরিকা তাহার প্রকাণ্ড কর্মশালা লইয়া আমাদের চোখের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই দেখিয়া আমাদের অবস্থা বড়ো হইবার পূর্বেই আমাদের নজর বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে কাজ দেখিতে ছোটো তাহাতে উৎসাহই হয় না; এইজন্য বীজ রোপণ করা হইল না, একেবারে আস্ত বনস্পতি তুলিয়া আনিয়া পুঁতিয়া অন্য দেশের অরণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এ তো প্রেমের লক্ষণ নহে, এ অহংকারের লক্ষণ। প্রেমের অসীম ধৈর্য, কিন্তু অহংকার অত্যন্ত ব্যস্ত। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, ইংরেজ নানামতে আমাদিগকে অবজ্ঞা দেখাইয়া আমাদের অহংকারকে অত্যন্ত রাঙা করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের এই কথাই কেবল বলিবার প্রবৃত্তি হইতেছে, আমরা কিছুতেই কম নই। এইজন্য আমরা যাহা-কিছু করি সেটাকে খুবই বড়ো করিয়া দেখাইতে না পারিলে আমাদের বুক ফাটিয়া যায়। একটা কাজ ফাঁদিবার প্রথমেই তো একটা খুব মস্ত নামকরণ হয়; নামের সঙ্গে 'ন্যাশনাল' শব্দটা কিংবা ওই রকমের একটা বিদেশী বিড়ম্বনা জুড়িয়া দেওয়া যায়। এই নামকরণ-অনুষ্ঠানেই গোড়ায় ভারী একটি পরিতৃপ্তি বোধ হয়। তার পরে বড়ো নামটি দিলেই বড়ো আয়তন না দিলে চলে না; নতুবা বড়ো নাম ক্ষুদ্র আকৃতিকে কেবলই বিদ্রূপ করিতে থাকে। তখন নিজের সাধ্যকে লঙ্ঘন করিতে চাই। তকমাওয়ালা

লাগামের খাতিরে ওয়েলারের জুড়ি না হইলে মুখরক্ষা হয় না— এ দিকে 'অগ্নভক্ষ্যোধনুর্গুণঃ'। যেমন করিয়া হউক, একটা প্রকাণ্ড ঠাট গড়িয়া তুলিতে হয়; ছোটোকে ক্রমে ক্রমে বড়ো করিয়া তুলিবার, কাঁচাকে দিনে দিনে পাকা করিয়া তুলিবার যে স্বাভাবিক প্রণালী তাহা বিসর্জন দিয়া যত বড়ো প্রকাণ্ড স্পর্ধা খাড়া করিয়া তুলি তত বড়োই প্রকাণ্ড ব্যর্থতার আয়োজন করা যায়। যদি বলি 'গোড়ার দিকে সুর আর-একটু নামাইয়া ধরো-না কেন' তবে উত্তর পাওয়া যায়, তাহাতে লোকের মন পাইব না। হায় রে লোকের মন! তোমাকে পাইতেই হইবে বলিয়া পণ করিয়া বসাতেই তোমাকে হারাই। তোমাকে চাই না বলিবার জোর যাহার আছে সেই তোমাকে জয় করে। এইজন্যই যে ছোটো সেই বড়ো হইতে থাকে; যে গোপনে শুরু করিতে পারে সেই প্রকাশ্যে সফল হইয়া উঠে।

সকল দেশেরই মহত্ত্বের ইতিহাসে যেটা আমাদের চক্ষুর গোচর তাহা দাঁড়াইয়া আছে কিসের উপরে? যেটা আমাদের চক্ষুর গোচর নহে তাহারই উপর। আমরা যখন নকল করিতে বসি তখন সেই দৃষ্টি-গোচরটারই নকল করিতে ইচ্ছা যায়; যাহা চোখের আড়ালে আছে তাহা তো আমাদের মনকে টানে না। এ কথা ভুলিয়া যাই, যাহাদের নামধাম কেহই জানে না দেশের সেই শতসহস্র অখ্যাত লোকেরাই নিজের জীবনের অখ্যাত কাজগুলি দিয়া যে দর বাঁধিয়া দিতেছে তাহারই উপরে নামজাদা লোকেরা বড়ো বড়ো ইমারত বানাইয়া তুলিতেছে। এখন যে আমাদিগকে ভিত কাটিয়া গোড়াপত্তন করিতে হইবে— সে ব্যাপারটা তো আকাশের উপরকার নহে, তাহা মাটির নিচেকার, তাহার সঙ্গে ওয়েস্ট্‌মিনিস্টার হলের তুলনা করিবার কিছুই নাই। গোড়ায় সেই গভীরতা, তার পরে উচ্চতা। এই গভীরতার রাজ্যে স্পর্ধা নাই, ঘোষণা নাই; সেখানে কেবল নম্রতা অথচ দৃঢ়তা, আত্মগোপন এবং আত্মত্যাগ। এই-সমস্ত ভিতের কাজে, ভিতরের কাজে, মাটির

সংগ্রহের কাজে আমাদের মন উঠিতেছে না; আমরা একদম চূড়ার উপর, জয়ডঙ্কা বাজাইয়া, ধ্বজা উড়াইয়া দিতে চাই। স্বয়ং বিশ্বকর্মাও তেমন করিয়া বিশ্বনির্মাণ করেন নাই। তিনিও যুগে যুগে অপরিস্ফুটকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছেন।

তাই বলিতেছি, সকল দেশেই গোড়ার কাজটা ঠিকমত চলিতেছে বলিয়াই ডগার কাজটা রক্ষা পাইতেছে; নেপথ্যের ব্যবস্থা পাকা বলিয়াই রঙ্গমঞ্চের কাজ দিব্য চলিয়া যাইতেছে। স্বাস্থ্যরক্ষা অন্ন-উপার্জন জ্ঞান-শিক্ষার কাজে দেশ ব্যাপিয়া হাজার-হাজার লোক মাটির নিচেকার শিকড়ের মতো প্রাণপণে লাগিয়া আছে বলিয়াই সে-সকল দেশে সভ্যতার এত শাখাপ্রশাখা, এত পল্লব, এত ফুলফলের প্রাচুর্য। এই গোড়াকার অত্যন্ত সাধারণ কাজগুলির মধ্যে যে-কোনো একটা কাজ করিয়া তোলাই যে আমাদের পক্ষে অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে। দেশের লোককে শিখাইতে হইবে, তাহার উদ্‌যোগ করিতেই প্রাণ বাহির হইয়া যায়; খাওয়াইতে হইবে, তাহার সংগতি নাই; রোগ দূর করিতে হইবে, সাহেব এবং বিধাতার উপর ভার দিয়া বসিয়া আছি। মাট্‌সীনি গারিবাল্ডি হ্যাম্প্‌ডেন ক্রমোয়েল হইয়া উঠাই যে একমাত্র বড়ো কাজ তাহা নহে; তাহার পূর্বে গ্রামের মোড়ল, পাঠশালার গুরুমশায়, পাড়ার মুরুব্বি, চাষাভুষার সর্দার হইতে না পারিলে বিদেশের ইতিবৃত্তকে ব্যঙ্গ করিবার চেষ্টা একান্তই প্রহসনে পরিণত হইবে। আগে দেশকে স্বদেশ করিতে হইবে, তার পরে রাজ্যকে স্বরাজ্য করিবার কথা মুখে আনিতে পারিব। অতএব পরিষদের কাজ কী হিসাবে বড়ো কাজ, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়ো না। এ-সমস্ত গোড়াকার কাজ। ইহার ছোটোবড়ো নাই।

দেশকে ভালোবাসিবার প্রথম লক্ষণ ও প্রথম কর্তব্য দেশকে জানা, এই কথাটা আমাদের দেশ ছাড়া আর-কোনো দেশে উল্লেখমাত্র করাই বাহুল্য। পৃথিবীর অন্যত্র সকলেই আপনার দেশকে বিশেষ করিয়া, তন্ন

তন্ন করিয়া, জানিতেছে। না জানিলে দেশের কাজ করা যায় না। শুধু তাই নয়, এই জানিবার চর্চাই ভালোবাসার চর্চা। দেশের ছোটোবড়ো সমস্ত বিষয়ের প্রতি সচেতন দৃষ্টি প্রয়োগ করিলেই তবে সে আমার আপন ও আমার পক্ষে সত্য হইয়া উঠে। নহিলে দেশহিত সম্বন্ধে পুঁথিগত শিক্ষা লইয়া আমরা যে-সকল বড়ো বড়ো কথা বার্ক্-মেকলের ভাষায় আবৃত্তি করিতে থাকি সেগুলো বড়োই বেসুরো শোনায়।

তাই দেশের ভাষা পুরাবৃত্ত সাহিত্য প্রভৃতি সকল দিক দিয়া দেশকে জানিবার জন্য সাহিত্যপরিষদ্ প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাংলাদেশের সকল জেলাই যদি তাঁহার সঙ্গে সচেষ্টভাবে যোগ দেন তবেই তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবে। সফলতা দুই দিক দিয়াই হইবে— এক, যোগের সফলতা; আর-এক, সিদ্ধির সফলতা। আজ বরিশাল ও বহরমপুর যে আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, ইহাতে মনে মনে আশা হইতেছে আমাদের বহু দিনের চেষ্টার সার্থকতা আসন্ন হইয়া আসিয়াছে।

দীপশিখা জ্বালিবার দুইটা অবস্থা আছে। তাহার প্রথম অবস্থা চক্‌মকি ঠোকা। সাহিত্যপরিষদ্ কাজ আরম্ভ করিয়া প্রথম কিছুদিন চক্‌মকি ঠুকিতেছিল, তাহাতে বিচ্ছিন্নভাবে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। দেশে বুঝি তখনো পলিতা পাকানো হয় নাই, অর্থাৎ দেশের হৃদয়গুলি এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত এক সূত্রে পাকাইয়া ওঠে নাই। তার পরে স্পষ্টই দেখিতেছি, আমাদের দেশে হঠাৎ একটা শুভদিন আসিয়াছে— যেমন করিয়াই হউক, আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে একটা যোগ হইয়াছে— তাহা হইবামাত্র দেশের যেখানে যে-কোনো আশা ও যে-কোনো কর্ম মরো-মরো হইয়াছিল তাহারা সকলেই যেন একসঙ্গে রস পাইয়া নবীন হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যপরিষদ্ও এই অমৃতের ভাগ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। এইবার তাহার বিক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ যদি শুভদৈবক্রমে পলিতার মুখে ধরিয়া উঠে তবে একটি অবিচ্ছিন্ন শিখারূপে দেশের অন্তঃপুরকে সে

আলোকিত করিয়া তুলিতে পারিবে।

অতএব বিশেষ করিয়া বহরমপুরের প্রতি এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের সমস্ত জেলার কাছে আজ আমাদের নিবেদন এই যে, সাহিত্যপরিষদের চেষ্টাকে আপনারা অবিচ্ছিন্ন করুন, দেশের হৃদয়-পলিতাটির একটা প্রান্ত ধরিয়া উঠিতে দিন, তাহা হইলে একটি ক্ষুদ্র সভার প্রয়াস সমস্ত দেশের আধারে তাহার স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অমর হইয়া উঠিবে। আমাদের অদ্যকার এই মিলনের আনন্দ স্থায়ী যোগের আনন্দে যদি পরিণত হয় তবে যে চিরন্তন মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে সেখানে ভাগীরথীর তীর হইতে ব্রহ্মপুত্রের তীর পর্যন্ত, সমুদ্রকূল হইতে হিমাচলের পাদদেশ পর্যন্ত, বাংলাদেশের সমস্ত প্রদেশ আপন উদ্‌ঘাটিত প্রাণভাণ্ডারের বিচিত্র ঐশ্বর্য-বহন-পূর্বক এক ক্ষেত্রে মিলিত হইয়া তাহাকে পুণ্যক্ষেত্র করিয়া তুলিবে। আপনারা মনে করিবেন না, আমাদের এ সভা কেবল বিশেষ একটি কার্যসাধন করিবার সভামাত্র। দেশের অদ্যকার পরম দুঃখদারিদ্র্যের দিনে যে-কোনো মঙ্গলকর্মের প্রতিষ্ঠান আমরা রচনা করিয়া তুলিতে পারিব তাহা শুদ্ধমাত্র কাজের আপিস হইবে না, তাহা তপস্যার আশ্রম হইয়া উঠিবে ; সেখানে আমাদের প্রত্যেকের নিঃস্বার্থ সাধনার দ্বারা সমস্ত দেশের বহুকালসঞ্চিত অকৃতকর্তব্যের অপরাধের প্রায়শ্চিত্তহইতে থাকিবে। এই-সমস্ত পাপের ভরা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আজ দেশের অতি ছোটো কাজটিও আমাদের পক্ষে এত একান্ত দুঃসাধ্য হইয়াছে। আজ হইতে কেবলই কর্মের দ্বারাই কর্মের এই-সমস্ত কঠিন বাধা ক্ষয় করিবার জন্য আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। হাতে হাতে ফল পাইব এমন নহে, বারংবার ব্যর্থ হইতে হইবে— কিন্তু তবু অপরাধমোচন হইবে, বাধা জীর্ণ হইবে, দেশের ভবিতব্যতার রুদ্রমুখচ্ছবি প্রতিদিন প্রসন্ন হইয়া আসিবে।

চৈত্র ১৩১৩

সাহিত্য গদ্যগ্রন্থাবলীর চতুর্থ ভাগ রূপে ১৩১৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। মূল প্রবন্ধগুলির অতিরিক্ত চৌদ্দটি প্রবন্ধ বর্তমান সংস্করণের সংযোজনে কালক্রমে সংকলিত হইল। তন্মধ্যে শেষ তিনটি প্রবন্ধ (পরবর্তী তালিকায় ২৩-২৫) পূর্ববর্তী সংস্করণেও ছিল; অন্য চারিটি প্রবন্ধ (১৬-১৯) 'সাহিত্যের পথে'র প্রথম প্রকাশকালে 'পত্রালাপ' শিরোনামে সংকলিত হয় (প্রচলিত 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে নাই), 'সাহিত্য' গ্রন্থের ১৩৪৮ মাঘ সংস্করণে গৃহীত ও পরে বর্জিত হয়, বর্তমানে সমসাময়িক অন্য রচনাচয় সংকলন করায় অভিন্ন প্রসঙ্গসূত্রে সংগত কারণেই একত্র গ্রথিত হইল— শিরোনামগুলি 'সাধনা' হইতে লওয়া হইয়াছে। সংকলিত সমুদয় প্রবন্ধের সাময়িক পত্রে প্রকাশকাল নিম্নে মুদ্রিত হইল।—

১	সাহিত্যের তাৎপর্য	বঙ্গদর্শন	অগ্রহায়ণ ১৩১০
২	সাহিত্যের সামগ্রী	বঙ্গদর্শন	কার্তিক ১৩১০
৩	সাহিত্যের বিচারক 'সাহিত্যসমালোচনা' আখ্যায়	বঙ্গদর্শন	আশ্বিন ১৩১০
৪	সৌন্দর্যবোধ	বঙ্গদর্শন	পৌষ ১৩১৩
৫	বিশ্বসাহিত্য	বঙ্গদর্শন	মাঘ ১৩১৩
৬	সৌন্দর্য ও সাহিত্য	বঙ্গদর্শন	বৈশাখ ১৩১৪
৭	সাহিত্যসৃষ্টি	বঙ্গদর্শন	আষাঢ় ১৩১৪
৮	বাংলা জাতীয় সাহিত্য	সাধনা	বৈশাখ ১৩০২
৯	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য	বঙ্গদর্শন	শ্রাবণ ১৩০৯
১০	ঐতিহাসিক উপন্যাস	ভারতী	আশ্বিন ১৩০৫
১১	কবিজীবনী	বঙ্গদর্শন	আষাঢ় ১৩০৮
	সংযোজন		
১২	কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট	ভারতী ও বালক	চৈত্র ১২৯৩
১৩	সাহিত্যের উদ্দেশ্য	ভারতী ও বালক	বৈশাখ ১২৯৪

১৪	সাহিত্য ও সভ্যতা	ভারতী ও বালক	বৈশাখ ১২৯৪
১৫	আলস্য ও সাহিত্য	ভারতী ও বালক	শ্রাবণ ১২৯৪
১৬	আলোচনা	সাধনা	ফাল্গুন ১২৯৮
১৭	সাহিত্য	সাধনা	বৈশাখ ১২৯৯
১৮	সাহিত্যের প্রাণ	সাধনা	আষাঢ় ১২৯৯
১৯	মানবপ্রকাশ	সাধনা	ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯
২০	কাব্য	সাধনা	চৈত্র ১২৯৮
২১	বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা	সাধনা	বৈশাখ ১২৯৯
২২	বাংলা-লেখক	সাধনা	মাঘ ১২৯৯
২৩	সাহিত্যের গৌরব	সাধনা	শ্রাবণ ১৩০১
২৪	সাহিত্যসম্মিলন	বঙ্গদর্শন	ফাল্গুন ১৩১৩
২৫	সাহিত্যপরিষৎ	বঙ্গদর্শন	চৈত্র ১৩১৩

২ এই প্রবন্ধের দুটি বর্জিত অংশ বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত হইল—

যেখানে রচনার সঙ্গে তাহার বিষয়ের এইরূপ একাত্মতা আছে সেইখানেই সাহিত্য সজীব মূর্তিতে প্রকাশ পায়। কুমারসম্ভবের মধ্যে যে বিষয়টুকু আছে তাহা জানা হইলেই যে কুমারসম্ভব পড়ার ফল পাওয়া যায় তাহা নহে। উহার ছন্দোবন্ধ, উহার আগাগোড়াই পড়িতে হইবে। কুমারসম্ভব ছাড়া আর কোনোখানেই কুমারসম্ভব-পাঠের উদ্দেশ্য সফল করিবার কোনো উপায় নাই। উজ্জয়িনীতে বসিয়া কত শতাব্দী পূর্বে কালিদাস যে-কয়টি কথা লিখিয়াছেন তাহার একটি অক্ষর বাদ দিলে চলিবে না। তাঁহারই ভাব তাঁহারই ভাষায় তাঁহারই রচনার ভঙ্গীতে আমাদিগকে সমগ্র আকারে গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা তাহার প্রাণহানি হইবে। ইহাই যথার্থ বাঁচিয়া থাকা।

...

স্বষ্টির মূল উপাদান অসংখ্য নহে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আধারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইয়া অসীম বৈচিত্র্য রচনা করিতেছে। সাহিত্যেরও মূল উপাদান সীমাবদ্ধ। একই ভাব সহস্র চিত্ত হইতে সহস্র ভাবে প্রতিফলিত হইয়া মানুষের আনন্দলোককে নব নব বৈচিত্র্য দান করিতেছে।

—বঙ্গদর্শন। কার্তিক ১৩১০

৪ বঙ্গদর্শনের যে সংখ্যায় মুদ্রিত তাহার স্থচীপত্রে উল্লেখ আছে, 'জাতীয় শিক্ষাপরিষদের প্রথম বক্তৃতা'। এই প্রবন্ধে, ৫০ পৃষ্ঠায় নিম্ন হইতে গণিলে সপ্তম ও ষষ্ঠ, এই উভয় ছত্রের অন্তরে অনেকটা রচনা বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত থাকিলেও গ্রন্থে প্রথমাবধি বর্জিত হইয়াছে।

৫, ৬, ৭ 'জাতীয় শিক্ষাপরিষদে পঠিত'।

৮ সাধনা'য় প্রবন্ধশেষে মুদ্রিত আছে, 'এই প্রবন্ধ ২৫শে চৈত্র রবিবার বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সাম্বৎসরিক উৎসবসভায় পঠিত হয়'। এই প্রবন্ধের বর্জিত অংশে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির এরূপ সমালোচনা ছিল—

প্রচলিত পদ্ধতিতে যেমন করিয়া ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে ছাত্রদের সমস্ত অবসর এবং সেই সঙ্গে সমস্ত উৎসাহ ও স্বাধীন চেষ্টার উদ্যম শোষণ করিয়া লয়। বৃক্ষের চারি দিকে আকাশের ন্যায় শিক্ষার চারি দিকে খানিকটা অবকাশের আবশ্যক করে। এমন খানিকটা অবসর ও শক্তি থাকা চাই যাহা অবলম্বন করিয়া নবলব্ধ শিক্ষা সম্যকরূপে আলোচিত প্রসারিত পরীক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু বাঙালির ছেলেকে যখন কেবল ইংরাজি ভাষামাত্র নহে, পরন্তু সমস্ত পাঠ্য বিষয়গুলিকেও ইংরাজিতে শিক্ষা করিতে হয়, তখন তাহার অবকাশ এবং শক্তির শেষ স্থচ্যগ্র ভূমি পর্যন্ত ছাড়িয়া দিতে হয়। অপরিচিত ভাষা এবং অপরিচিত বিষয় এই উভয় দৈত্যের দ্বারা একই সময়ে দক্ষিণে বামে আক্রান্ত হইয়া বাঙালির ছেলের চিন্তা করিবার অবসর মাত্র থাকে না, কেবল সে অন্ধভাবে প্রাণপণ করিয়া যুঝিতে থাকে। অন্তত যদি এন্‌ট্রেন্‌স্‌ ক্লাস পর্যন্তও বাংলা ভাষায়

বিষয়-শিক্ষা ও ইংরাজিকে স্বতন্ত্র শিক্ষণীয় বিষয়স্বরূপে গণ্য করা হয় তবে ছাত্রগণ প্রকৃতরূপে শিক্ষা করিবার অবকাশ পায় এবং শিক্ষা-সমাপনের পর স্বদেশের হিতসাধন ও জীবনের মহৎ কর্তব্য -পালনের উপায় তাহাদের নিকট সুগম করিয়া দেওয়া হয়।

বাঙালা-ভাষা-শিক্ষা-অভাবে ছাত্রগণ যে বাংলা সমাজের জন্য সম্পূর্ণ-রূপে প্রস্তুত হইতে পারিতেছে না কেবল তাহাই নহে, তাহাদের নূতন শিক্ষাও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে না। কখনো কখনো আমাদের ইংরাজ শিক্ষকগণ আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইংরাজি ও বাংলায় যে-সকল প্রবন্ধ রচনা করেন অনেক সময় তাহাতে চিন্তা ও ভাবের অকিঞ্চিৎকরতা লক্ষিত হয় ; স্পষ্টই বুঝা যায় আমাদের শিক্ষিত বিদ্যাকে আমরা নিজের মনের চিন্তায় পরিণত করিতে কোনো কালে অভ্যাস করি নাই, সেগুলিকে বলপূর্বক অশ্রুসিক্ত চক্ষে সমগ্র গলাধঃকরণ করিয়াছি। কিন্তু পরকীয় বিদ্যাকে স্বকীয় চিন্তায় পরিণত করিতে হইলে মাঝখানে স্বদেশীয় ভাষা আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাকশালায় ছত্রিশ অধ্যাপকে মিলিয়া ছত্রিশ বিদ্যার ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে পারেন, কিন্তু নিজের হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্তী আজন্মকালীন পাকযন্ত্রটির মধ্যে তাহাকে পুনশ্চ পাক করিয়া লইলে তবেই সে যথার্থ আপনার হয়। আমরা রসনায় ইংরাজি বিদ্যার বিচিত্র আস্বাদ পাইতেছি সন্দেহ নাই, কিন্তু যতক্ষণে তাহা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের নাড়ীতে নাড়ীতে উত্তপ্ত রক্তরূপে প্রবাহিত না হয় ততক্ষণ সে বিদ্যা যে হজম হইয়াছে তাহার কোনো প্রমাণ নাই।

—সাধনা। বৈশাখ ১৩০২

৯ বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত আছে, এই প্রবন্ধ 'গত জ্যৈষ্ঠ মাসে মজুমদার-লাইব্রেরীর অন্তর্গত আলোচনাসমিতির বিশেষ অধিবেশনে··· পঠিত'। গ্রন্থে বর্জিত শেষ অংশ সাময়িক হইতে সংকলিত হইল—

বর্তমান বঙ্গসাহিত্যও হঠাৎ একদিন অভাবনীয় উন্নতির উচ্চশিখরে উঠিবে, এরূপ আশা করি। কখন উঠিবে? যখন একমাত্র ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহার প্লাবনের দ্বারা নানাকে এক করিয়া দিবে, সকলের হৃদয়কে সকলের সম্মুখে আনিয়া দিবে, কাহারও কাহাকেও বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। যখন বিভাগের মধ্যে এককে পাইব, বিচ্ছেদের মধ্যে মিলন পাইব। যখন অনুগ্রহের দ্বারা পীড়িত হইব না, যেখানে আমাদের গৌরব আছে সেই জায়গাটা সন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিব। যখন আমরা বর্তমানের বন্ধন ছেদন করিয়া তাহার বাহিরে একটা অনন্ত আশার ক্ষেত্র বিস্তৃত দেখিব। এখন ইংরাজের সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান রাষ্ট্রতন্ত্র আমাদিগকে চারি দিকে নীরন্ধ্রভাবে বেষ্টন করিয়া আছে, আমরা তাহার বাহিরে কিছুই দেখিতে পাই না। পরের জিনিস আমাদিগকে একেবারে গ্রাস করিয়াছে। যখন কোনো প্রতিভাসম্পন্ন মনীষী আসিয়া এই বেষ্টনকে ভেদ করিয়া আমাদিগকে মুক্তি দিবেন, যখন হঠাৎ আমরা অনুভব করিব অনুকরণই আমাদের একমাত্র গৌরব নয়, আবিষ্কার করিব আমাদের নিজের মধ্যে এমন এক বিশেষ শক্তি আছে যাহা অন্য কোনো জাতির নাই, যখন চেতনা হইবে ইংরাজি গ্রন্থের অর্থপুস্তক না মুখস্থ করিয়াও আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে, যখন আমাদের নিজের গৌরবের আনন্দে আমাদিগকে এক করিয়া দিবে, পরস্পরের সহিত সম্বন্ধস্বীকারে আমাদের কোনো লজ্জা থাকিবে না, তখন সেই আনন্দের দিনে, আশার দিনে, গৌরবের দিনে, মিলনের দিনে, যে সৌভাগ্যবান কবি বাংলাদেশে গান ধরিবেন তাঁহার গান জগতের মধ্যে সার্থক হইবে। বঙ্গদেশ যখন নিজের অমরত্ব নিজের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিবে, নিজের সম্বন্ধে যখন তাহার কোনো সংশয় কোনো সংকোচ থাকিবে না, তখন নির্ভীক বঙ্গসাহিত্য সমস্ত সমালোচকের সমস্ত বাঁধি বোল, সমস্ত ইস্কুলের সমস্ত মুখস্থ গৎ অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিয়া নিজের অন্তরের মহান্ আদর্শ অবলম্বন

করিয়া অপূর্ব কারুকৌশলে আপন নবীন দেবমন্দিরকে অভ্রভেদী করিয়া তুলিবে এবং মুহূর্তের মধ্যে তাহাকে প্রাচীনের চিরন্তন মহিমা সমর্পণ করিবে। আমরা নিজের অবস্থা-গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ হইয়া যাহা পারিয়াছি তাহাই করিয়াছি, যাহা শিখিয়াছি তাহাই বকিয়াছি, যাহা সম্মুখে পাইয়াছি তাহাই বিহিত নিয়মে সাজাইয়া গেছি। আমাদের রচনা বাংলার বর্তমান ভিত্তির মধ্যে এখনও কোনো নূতন গবাক্ষ কাটিয়া কোনো নূতন আলোক আনে নাই, কোনো নূতন আশায় দেশকে প্লাবিত করে নাই, সাহিত্যকে এমন একটি প্রাণশক্তি দেয় নাই যে শক্তিবলে আমাদের সাহিত্য দেশের ও বিদেশের পক্ষে চিরকালের জন্য প্রাণের সৌন্দর্যের ও কল্যাণের অক্ষয় ভাণ্ডার হইয়া থাকে।

কিন্তু অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতেছি, সেদিন দূরে নাই। সমস্ত অনুকরণ অনুসরণকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া নিজেকে নিজে লাভ করিবার জন্য আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তীব্র বেদনা উপস্থিত হইয়াছে। মরুভূমির মধ্যে ক্ষুধাতুর তৃষার্তের স্কন্ধে টাকার থলি যেমন কেবল ভারমাত্র তেমনি বিদেশের যে-সমস্ত বহুমূল্য বোঝা আমরা মাথায় চাপাইয়াছি, বুঝিতে পারিতেছি, তাহার মূল্য যতই হোক, তাহা আমাদের বল অপহরণ করিতেছে; এখন মন কেবলই বলিতেছে: চাহি না, চাহি না, এ-সমস্ত কিছুই চাহি না। তবে কী চাই? হৃদয়ের মধ্য হইতে এই প্রার্থনা উর্ধ্বস্বরে কাঁদিয়া উঠিতেছে: আপনাকে চাই! চাই আপনার শক্তিকে! প্রচুর হইলেও উপকরণমাত্রে কোনো লাভ নাই, তাহা আবর্জনা। সভা সমিতি দরখাস্ত ও কন্‌গ্রেসে যে আমাদিগকে হীনতা হইতে মুক্তি দিতে পারে এ মোহ আমাদের মন হইতে চলিয়া যাইতেছে, গবর্মেণ্ট অনুগ্রহপূর্বক উচ্চ আসনে চড়াইয়া আমাদিগকে বড়ো করিতে পারে এই মিথ্যা আশাও শিথিল হইয়া আসিয়াছে। এখনি যথার্থ সময়। এখনি মনে হইতেছে, কোনো মহাপুরুষের আবির্ভাব আসন্ন হইয়াছে যিনি ভারতবর্ষের সম্মুখে

ভারতবর্ষের পথ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবেন ; যিনি আমাদের অন্তরের মধ্যে এই কথা ধ্বনিত করিয়া তুলিবেন যে, আমরা ভারতবাসী, আমরা ফিরিঙ্গি নই, আমরা বর্বর নই, আমাদের লজ্জার কোনো কারণ নাই ; যিনি আমাদের মনকে, আমাদের হৃদয়কে, আমাদের কল্পনাকে স্বাধীন করিয়া দিবেন ; যিনি আমাদের শিক্ষার বন্ধনমোচন করিবেন, আমাদের বিদেশী সংস্কারের সমস্ত কুহেলিকা অপসারিত করিয়া দিবেন। তখন আমাদের বর্তমান অবস্থা যেমনি থাক্‌, আমাদের চিত্ত তাহার বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়া সমস্ত বিশ্বজগৎকে প্রত্যক্ষ আপনার সম্মুখে প্রসারিত দেখিবে। এমন মুক্তি আছে যাহাকে রাজার শাসন, প্রবলের পীড়ন, অবস্থার পেষণ স্পর্শ করিতে পারে না। সেই মুক্তিই ভারতবর্ষের লক্ষ্যস্থল ছিল এবং সকল ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থচেষ্টার আক্রমণ হইতে সেই রত্নকে রক্ষা করিবার ভার লইয়াই ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষে গৌরব লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই রত্ন হারাইয়াই ব্রাহ্মণ ও ভারতবর্ষ রসাতলে গেছে। সেই মুক্তির আশা ও আনন্দ যখন অরুণালোকের ন্যায় আমাদের মাতৃভূমির উদয়াচল স্পর্শ করিবে তখন যে অপরূপ সংগীত চতুর্দিক হইতে ধ্বনিত উদ্‌গীত হইয়া উঠিবে তাহা আমার অন্তরে বাজিতেছে, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার সাধ্য আমার নাই। সেইদিনকার বঙ্গসাহিত্যের জন্য আমরা অপেক্ষা করিয়া আছি, ততদিন যাহা করিতেছি তাহা ক্রীড়াচ্ছলে সময়যাপন মাত্র।

—বঙ্গদর্শন। শ্রাবণ ১৩০৯

১৬, ১৭, ১৮, ১৯ সাধনা পত্রে প্রকাশিত এই নিবন্ধমালা কবিবন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সহিত কবির পত্রালাপচ্ছলে রচিত হইয়াছিল। কৌতূহলী পাঠক সাধনায় লোকেন্দ্রনাথের পত্রপ্রবন্ধগুলিও পাইবেন ; 'সাহিত্যের সত্য', 'সাহিত্যের উপাদান' এবং 'সাহিত্যের নিত্যলক্ষণ' শিরোনামে ১২৯৮ চৈত্র, ১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ এবং ১২৯৯ শ্রাবণ সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

২২ এই প্রবন্ধটির সহিত সাহিত্য মাসিক পত্রে প্রকাশিত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের 'কড়াক্রান্তি' প্রবন্ধের সম্পর্ক রচনার ভিতরেই জানা যায়। শেষোক্ত প্রবন্ধের সামাজিক দিক হইতে যে সমালোচনা লিখিত হয় তাহা সাধনার পূর্ববর্তী পৌষ সংখ্যায় 'কড়ায়-কড়া কাহনে-কানা' শিরোনামে প্রথম প্রকাশ পায়, পরে 'আচারের অত্যাচার' নামে 'সমাজ' গ্রন্থে সংকলিত হয়; রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডে উক্ত রচনা ও তৎসম্পর্কে বহু তথ্য মুদ্রিত হইয়াছে।

২৪ বঙ্গদর্শন পত্রে (১৩১৩ ফাল্গুন) লেখা হয়, 'ভারতীয় শিল্পপ্রদর্শনী-ক্ষেত্রে গত সাহিত্যসম্মিলন উপলক্ষে পঠিত'।

২৫ বঙ্গদর্শন পত্রে (১৩১৩ চৈত্র) প্রবন্ধশেষে পাদটীকায় জানা যায়, 'এই প্রবন্ধ বহরমপুরের প্রস্তাবিত প্রাদেশিক সাহিত্যসম্মিলনের জন্য লিখিত হইয়াছিল। এই সাহিত্যসম্মিলনের প্রধান উদ্‌যোগী ও পৃষ্ঠপোষক … মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের শোচনীয় অকাল-মৃত্যুতে এই সম্মিলন স্থগিত করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার সময়ে আমরা এই নিদারুণ সংবাদ পাই, সেজন্য প্রবন্ধ যে ভাবে রচিত হইয়াছিল ঠিক সেই ভাবেই প্রকাশিত হইল।'

এ সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য রবীন্দ্র-রচনাবলীর অষ্টম খণ্ডে গ্রন্থপরিচয়ে পাওয়া যাইবে।

'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' (প্রবন্ধসংখ্যা ৮) বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সাংবৎসরিক সভায় পঠিত ইহা পূর্বেই উল্লেখ হইয়াছে। ১৩১৫ সালের ২১ অগ্রহায়ণ তারিখে সাহিত্যপরিষদের স্বগৃহ-প্রবেশ-উৎসবে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দেন তাহা নিম্নে সংকলিত হইল—

কিছুকাল হইল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় তাঁহার কোনো-একটি প্রবন্ধে পাণিনির ব্যাকরণ প্রভৃতি হইতে প্রমাণ করিয়াছেন, ভারতবর্ষে

প্রাচীন কালে পুত্রশব্দের অর্থ ছিল, যে পূর্ণ করে সেই পুত্র। পুৎনামক কোনো-একটি নরক হইতে ত্রাণ করে, এই ব্যাখ্যাটি পরবর্তী কালে আমাদের পুরাণে স্থান পাইয়াছে।

পিতাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলে বলিয়াই পুত্রের গৌরব। পুত্র পিতার অকৃত কর্মগুলিকে সম্পন্ন করে, তাঁহার ভারকে বহন করে, তাঁহার ঋণকে পরিশোধ করিয়া দেয়। এই কারণেই, কেবলমাত্র স্নেহপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য নহে, কল্যাণপ্রাপ্তির জন্য, অকৃতার্থতা ও অসমাপ্তি হইতে মুক্তিলাভের জন্যই, পুত্রকে আমাদের দেশে দেবতার বিশেষ প্রসাদলাভের মতোই গণ্য করিত।

আমাদের দেশ বহুকাল হইতে পুত্রহীন হইয়া শোক করিতেছে। সে যাহা আরম্ভ করে তাহা কোনো-একটি ব্যক্তিকেই আশ্রয় করিয়া দেখা দেয় এবং সেই একটি ব্যক্তির সঙ্গেই বিলীন হইয়া যায়— তাহার সংকল্পকে বিচিত্র সার্থকতার পরম্পরার মধ্য দিয়া ভাবী পরিণামের দিকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার কোনো উপায় নাই। ক্ষুদ্রতা, বিচ্ছিন্নতা, অসমাপ্তি কেবলই দেশের ঋণের বোঝা বাড়াইয়াই চলিয়াছে; কোনোটাই পরিশোধ হইবার কোনো সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

এই সম্পূর্ণতাহীন খণ্ডতাশাপগ্রস্ত বন্ধ্যদশা ঘুচাইবার জন্য আমাদের অভাগা দেশ কামনা করিতেছিল। কারণ, বন্ধ্যত্বমাত্রই বন্ধন। যে ব্যক্তি নিজের ফল ফলাইতে পারিল না সে নিষ্কৃতি পাইল কৈ? আমাদের দেশের অভ্যন্তরে যে অভিপ্রায় রহিয়াছে সেই অভিপ্রায় যদি চারি দিকে সফলতার বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়া উঠিতে না থাকে, যদি তাহা কেবল গুপ্তই থাকিয়া যায়, যদি তাহা অঙ্কুরিত হইয়াই শুকাইতে থাকে, তবে এমন কোনো কৃত্রিম উপায় নাই যাহার সাহায্যে দেশ মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। যাহারা নিরন্তর কালের মধ্য দিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সংকল্পকে সিদ্ধির পথে, মুক্তির পথে লইয়া যাইবে তাহারাই দেশের পুত্র।

দুঃখিনী বঙ্গভূমি সেই পুত্র কামনা করিতেছিল।

আমাদের দেশমাতাকে বহুপুত্রবতী হইতে হইবে। এই পুত্রদের কেহ বা দেশের জ্ঞানকে, কেহ বা দেশের ভাবকে, কেহ বা দেশের কর্মকে অনুবৃত্তি দান করিয়া তাহাকে উত্তরোত্তর পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে। তাহারা নানা লোকের উদ্যমকে এক স্থানে আকর্ষণ করিয়া লইবে, তাহারা নানা কালের চেষ্টাকে একত্রে বাঁধিয়া চলিবে। তাহারা দেশের চিত্তকে নানা ব্যক্তির মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিবে এবং অনাগত কালের মধ্যে বহন করিয়া চলিবে। এমনি করিয়াই দেশের বন্ধ্যা অবস্থার সংকীর্ণতা ঘুচিয়া যাইবে, সে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে সকল দিকেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

এইরূপ পুত্রের জন্য বঙ্গভূমির কামনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎকে আমি দেশমাতার এইরূপ একটি পুত্র বলিয়া অনুভব করিয়া অনেক দিন হইতে আনন্দ পাইতেছি। ইহা একটি বিশেষ দিকে বাংলাদেশের বিচ্ছিন্নতা ঘুচাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণতা দান করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহা বাংলাদেশের আত্মপরিচয়চেষ্টাকে এক জেলা হইতে অন্য জেলায় ব্যাপ্ত করিয়া দিবে, এক কাল হইতে অন্য কালে বহন করিয়া চলিবে— তাহার এক নিত্যপ্রসারিত জিজ্ঞাসাসূত্রের দ্বারা অদ্যকার বাঙালির চিত্তের সহিত দূরকালের বাঙালিচিত্তকে মালায় গাঁথা চলিবে— দেশের সঙ্গে দেশের, কালের সঙ্গে কালের যোগসাধন করিয়া পরিপূর্ণতা বিস্তার করিতে থাকিবে। পুত্র পিতৃবংশকে, পিতৃকীর্তিকে, পিতৃসাধনাকে এইরূপে ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর করিয়া দিয়া অতীতের সহিত অনাগতকে এক করিয়া মানুষকে কৃতার্থ করে; দেশপুত্রও দেশের চিত্তকে, দেশের চেষ্টাকে, বৃহৎ দেশে, বৃহৎ কালে ঐক্য দান করিয়া তাহাকে সত্য করে— তাহাকে চরিতার্থ করে। সাহিত্যপরিষৎও বাংলাদেশের চিত্তকে এইরূপ নিত্যতা দান করিয়া তাহাকে মহৎরূপে সত্য করিয়া

তুলিবার আশা বহন করিয়া আনিয়াছে বলিয়াই আমরা তাহার অভ্যুদয়কে বাংলাদেশের পুণ্যফল বলিয়া গণনা করিতেছি।

আমাদের এই সাহিত্যপরিষৎ এতদিন গর্ভবাসে ছিল। সে অন্নে অন্নে রসে রক্তে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। তাহার সুহৃদ্‌গণ তাহাকে নানা আঘাত-অপঘাত হইতে সযত্নে বাঁচাইয়া আসিয়াছেন। তাহার দশমাস কাটিয়া গিয়াছে, আজ সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

কবি বলিয়াছেন : শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্। ধর্মসাধনের গোড়াতেই শরীরের প্রয়োজন হয়। সাহিত্যপরিষদের সেই আদ্য প্রয়োজন আজ সম্পূর্ণ হইয়াছে; এখন হইতে তাহার ধর্মসাধনা সবলে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে এইরূপ আশা করা যাইতেছে।

ইতর জন্তুর অপেক্ষা মানুষের গর্ভবাসকালও দীর্ঘ; তাহার শৈশব-অবস্থাও অচির নহে। শ্রেষ্ঠতালাভের মূল্যস্বরূপ মানুষকে এই বিলম্ব স্বীকার করিতে হয়।

সাহিত্যপরিষৎকেও তাহার বাহ্যশরীর পূর্ণ করিতে বিলম্ব সাধিত হইয়াছে। অনেক দিন ধরিয়া নিজের প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়া দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে স্থানলাভ করিয়া তবে তাহার এই স্থূলদেহটি আজ প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই স্বাভাবিক বিলম্বই আমাদের পক্ষে আশার কারণ। ইহা ভোজ-বাজির খেলার মতো অকস্মাৎ কোনো খামখেয়ালির শ্রদ্ধাহীন টাকার জোরে এক রাত্রে সৃষ্ট হয় নাই। অনেক দিন দেশের হৃৎসঞ্চারিত রক্তের দ্বারা পুষ্ট হইয়া, তাহার জীবন হইতে জীবনলাভ করিয়া, তবেই প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির নিয়মে পরিষদের শারীরিক আবির্ভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু এখনো আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইবার সময় আসে নাই। এখনো এ শিশু অনেক দিন জননীর সতর্ক স্নেহের অপেক্ষা রাখে। তাহার পরে বড়ো হইয়া বলিষ্ঠ হইয়া জননীকে নির্ভয় দান করিবে।

সাহিত্য

অদ্যকার উৎসবে এই নবদেহপ্রাপ্ত সাহিত্যপরিষদের মুখ দেখিয়া সমস্ত দেশের স্নেহ ও আশীর্বাদ ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে, এই আমরা আশা করিয়া আছি। যেপর্যন্ত ইহার শৈশবের দুর্বলতা কিছুমাত্র থাকিবে সেপর্যন্ত বাঙালি ইহাকে পোষণ করিবে, রক্ষা করিবে, ইহার অভাব দূর করিয়া নিজের অভাবমোচনের পন্থা করিবে, এই অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রত্যাশা লইয়া আজ আমরা আনন্দ করিতে আসিয়াছি।

তবু মন হইতে ভয় দূর হয় না। কারণ, যাহারা দুর্ভাগা তাহারা স্বভাব হইতেই ভ্রষ্ট হয়। যে পুত্র পূর্ণতা দান করে সকলে তাহাকে স্বভাবতই পূর্ণ করিতে চায়; কেবল ভাগ্যে যাহার দুর্গতি আছে সে আপন ভাবী আশাস্পদকেও অন্নদান করিতে বিমুখ হয়।

বাংলাদেশের ঘরেও মাঝে মাঝে দেবলোক হইতে মঙ্গল নানা আকার ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। আমরা তাহার সকলটিকে পালন করি নাই। এমনি করিয়া অনেক নবীন আগন্তুককেই আমরা অনাদরে অভুক্ত রাখিয়া ফিরাইয়া দিয়াছি। সেই-সকল অপমানিত মঙ্গলের অভিসম্পাত অনেক জমা হইয়া উঠিয়াছে; তাহারাই আমাদের উন্নতিপথের এক-একটি বড়ো বড়ো বাধা রচনা করিয়া রহিয়াছে। বাংলাদেশের ক্রোড়ে আজ যে কল্যাণের কমনীয় শৈশব সাহিত্যপরিষৎরূপে আমাদের দর্শনগোচর হইল, ইহার প্রতি আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হউক, আনন্দের আনুকূল্য প্রসারিত হউক— বিধাতাপুরুষ এই সভাতলে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অলক্ষ্য লেখনী দিয়া অদ্য এই শিশুর ললাটে যে অদৃশ্যলিপি লিখিতেছেন তাহাতে বাঙালির গৌরব, বাঙালির কীর্তি, বাঙালির চরিতার্থতা কালে কালে সপ্রমাণ হইয়া উঠুক, অন্তরের এই কামনা প্রকাশ করিয়া আমি আসন গ্রহণ করিতেছি।

—পরিষৎপরিচয় (ফাল্গুন ১৩১৬)